শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

চতুর্থ খণ্ড

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'-র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। আশাকরি প্রথম তিনটি খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও ভক্তদের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে। প্রকাশিত হইবার পর হইতেই ভক্তদের বিপুল চাহিদার জন্য গ্রন্থটির প্রথম তিনটি খণ্ড আমাদের বারবার পুনর্মুদ্রণ করিতে হইয়াছে। আমরা তাহাতে অবশ্যই খুব আনন্দিত। কারণ, দেখা যাইতেছে শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানিবার জন্য ভক্তদের আগ্রহ দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র চতুর্থ খণ্ডটি ভক্তদের উপহার দিতে পারিয়া আমরা সেজন্য খুবই আনন্দিত। কারণ, ভক্তদের মাতৃ-অনুধ্যানে এবং মাতৃপ্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পূরণে এই খণ্ডটি বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

আমাদের আনন্দের পরিমাণ আরও অধিক এই কারণে যে, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ-পূর্তি উৎসবে বর্তমান খণ্ডটি আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম।

প্রথম তিনটি খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিরও সঙ্কলন এবং সম্পাদনা করিয়াছেন 'উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং ত্রিপুরাস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

১ ডিসেম্বর ২০০৩ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সঙ্কলক ও সম্পাদকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'-র চতুর্থ ও আপাতত সর্বশেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। তৃতীয় খণ্ডের নিবেদনে আমরা জানিয়েছিলাম "তৃতীয় এবং সর্বশেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হলো।" কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আমরা আরো বেশ কিছু শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। বর্তমান খণ্ডে মোট ৪২টি স্মৃতিকথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১০টি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বাকিগুলির মধ্যে অধিকাংশই 'উদ্বোধন'-এ, দুটি 'বিশ্ববাণী' এবং একটি 'নিবোধত' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও, যেসব স্মৃতিকথাগুলি প্রকাশিত গ্রন্থ অথবা অন্য সূত্রে সংগৃহীত হয়েছে যথাস্থানে সেগুলির আকর বা সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে।

বর্তমান খণ্ডে শ্রীশ্রীমায়ের ২১টি পত্র সমন্বিত 'পত্রাবলী'ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য-শিষ্যা, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং অন্যান্য গৃহী ভক্তের স্মৃতিকথাগুলি দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া 'পরিশিষ্ট' পর্বে অন্যের দ্বারা সংগৃহীত/সংরক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য চারজন ভক্তের (তিনজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহী) স্মৃতিকথামূলক উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইভাবে 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের চারটি খণ্ডে বহু মূল্যবান উপাদানের সঙ্কলন আপাতত সম্পন্ন হলো।

আমরা জানি, মাতৃকথা এবং মাতৃপ্রসঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। আমরা একথাও জানি, পূর্বের খণ্ডগুলির মতো বর্তমান খণ্ডটিও ভক্ত ও পাঠক সাধারণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে সংযোজিত হবে।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব-মুহূর্তে বর্তমান খণ্ডটি পাঠক ও ভক্তসাধারণের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি।

১ ডিসেম্বর ২০০৩ — **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

সূচীপত্র

ত্রয়োদশ পর্ব

পরিশিষ্ট

দশম পর্ব

শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী

॥ ১ ॥

স্বামী শিবানন্দকে লিখিত*

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন তারক,

ছোট নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে ছেলে আমার অনেক কষ্ট করে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে আমার কাছে চলে এসেছে। তা বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? আমি তাকে মঠে পাঠাচ্ছি। তুমি, বাবা, তাকে কিছু বোলো না। আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি

তোমাদের

মা

* এই পত্রটির তারিখ পাওয়া যায়নি। পত্রটি বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত (পৃঃ ১০২৫) স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের স্মৃতিকথায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ সেখানে জানিয়েছেন যে, পত্রখানিতে মায়ের বক্তব্যের শ্রুতিলিখন তিনিই করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথায় যেমনভাবে পত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে সেভাবেই আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। প্রসঙ্গত, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী যা তাঁর আজীবন নিটোলভাবে অটুট ছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত এই ঘটনাটির সম্পূর্ণ উপাদান আরো অনেক উপাদানের সঙ্গে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দই স্বামী গম্ভীরানন্দকে দিয়েছিলেন। পত্রটির উত্তরে স্বামী শিবানন্দ যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটিও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের পূর্ব-উল্লিখিত স্মৃতিকথার অনুসরণে পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। —সম্পাদক

শ্রীচরণকমলেষু,

মা,

ছোট নগেন আপনার নিকট গিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরাও খোঁজাখুঁজি করিতেছিলাম—ছেলেটা কোথায় গেল? আপনি তাহাকে দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এখানে পূজার জন্য লোকের অভাব। আমি তাহাকে কিছুই বলিব না। আপনার শ্রীচরণে আমার এবং মঠস্থ সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিতেছি। ইতি

সেবক

তারক

॥২॥

হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত*

জয়রামবাটী

দীর্ঘজীবেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার বাবা তোমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহাই শুনিবে। তুমি এখন যেমন দেশের কাজ করিতেছ, থানায় দারোগার চাকুরি লইলে দেশের কাজ আরো ভালভাবে করিতে পারিবে।

তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করিবেন। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমাদের

মা

* এই পত্রটির তারিখ পাওয়া যায়নি। পত্রটি বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত (পৃঃ ১১৫৩) হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে যেমনভাবে পত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে সেভাবেই আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। তাঁর

পরিবারসূত্রে (তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীনা (শঙ্করী) সেনগুপ্তের) সৌজন্যে জানা গিয়েছে এবং হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথাতেও উল্লেখ রয়েছে যে, শ্রীশ্রীমা তাঁকে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত স্মৃতিকথায় অন্তর্ভুক্ত বর্তমান পত্রটি ভিন্ন শ্রীশ্রীমায়ের অন্য কোন পত্র সংরক্ষিত হয়নি।—**সম্পাদক**

॥৩॥

মৃণালিনী ঘোষকে* লিখিত

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
১৩২৪/৩রা চৈত্র

আশীর্বাদান্তে সমাচার—

মা, তোমার প্রেরিত দশ টাকা পাইয়া সুখী হইলাম। টাকা ও চিঠিপত্রাদি অপর কাহারও নামে না পাঠাইয়া আমার নামে পাঠাইবে। আজকাল আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

প্রেরক
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী
পোঃ—আনুড়
গ্রাম—জয়রামবাটী
জেলা—হুগলী

প্রাপক
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ
Ranchi P.O.
C/o–B. C. Basu Esq.

* মৃণালিনী ঘোষ অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী। কলকাতায় থাকলে মৃণালিনী এবং তাঁর গর্ভধারিণী শ্রীশ্রীমাকে প্রায়ই দর্শন করতে আসতেন। প্রসঙ্গত, মৃণালিনী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে মৃণালিনীর অধ্যাত্মজীবনের গভীরতা সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসা শোনা যেত।—**সম্পাদক**

॥৪॥

মৃণালিনী ঘোষকে লিখিত

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

বাগবাজার, কলিকাতা
২০।৫।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার পত্র ও প্রেরিত ফল পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এখানে আসিয়া ভালই ছিলাম। হঠাৎ গত দুইদিন পুনরায় একটু একটু জ্বর হইয়াছে। আজ ভাল আছি। বোধহয় আর জ্বর হইবে না। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভুবনেশ্বর হইতে সুধীরার খবর পাইয়াছি। অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

(পুনঃ) ফলগুলির মধ্যে পেঁপেগুলির কয়েকটা নষ্ট হয়েছিল। আর সব ভাল পৌঁছেছে।*

প্রাপক

পরমকল্যাণীয়া
শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ
C/o—Sj. Roy B. C. Bose Bahadur
Lalgarh, Ranchi

* মৃণালিনী ঘোষকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্রদুটি উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০৮, পৃঃ ৬০২-৫ প্রকাশিত —সম্পাদক

।।৫।।

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত

শ্রীহরি

মার্চ ১৯১৭
৯ই চৈত্র
জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সংসারে থাকিতে হইলে অর্থের দরকার। তুমি সেজন্য চেষ্টা করিতে পার। তবে হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। তুমি চেষ্টা করিবে। ফলাফল ভগবানের হাতে। তবে অর্থপিপাসা করিতে নাই। দিন চলিলেই হইল। আমার আশীর্বাদ জানিবে। অত্রস্থ সব কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

।।৬।।

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত

ওঁ

১৭ই আশ্বিন (১৩২৪/১৩২৫)
১নং মুখার্জী লেন

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আজকাল কলিকাতায় বউমাকে আনিতে হইলে অনেক খরচপত্র লাগিবে। ঘরে বসিয়াই ঠাকুরের নাম জপ

করিতে বলিবে। তারপর যখন সুবিধা হয় পরে নিয়া আসিও। মেয়েটিকে স্কুলে দিতে হইলে আরও ৭।৮ বছর অবিবাহিত রাখা প্রয়োজন। তোমাদের সাংসারিক এবং সমাজ হিসাবে সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই করিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানকার কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

॥৭॥

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত

শ্রীশ্রীহরি

বাবাজীবন,

পরম আশীর্বাদ পরে লিখি যে, তোমার অনেকদিন হইল পত্র পাইয়াছি। নানান কার্যে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে দেরি হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আর কার্যের জন্য লিখিয়াছ। কাজ ছাড়িয়া কি করিবে? যেমন করিতেছ তেমনি করিয়া যাও। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের কুশল। তোমাদের কুশল দিবে। ইতি

তোমাদের মাতা*

* জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্র তিনটি উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৮, পৃঃ ৯৭৮-৯৭৯-এ প্রকাশিত।

॥৮॥

বিভূতিভূষণ ঘোষের[১] প্রথম পক্ষের স্ত্রী অমিয়বালা ঘোষকে লিখিত*

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা

২৭ শে আশ্বিন

চিরজীবেষু

বিশেষ পরে বৌমা,

তোমার পত্র পাইলাম। পাইয়া সুখী হইলাম। মা, এখানে এখন বড় ম্যালেরিয়া পড়িয়াছে। সকল বাড়িতেই অসুখ। আর তোমার শরীর তো বেশ ভাল নয়। তাই আসিতে বলিতে পারিতেছি না। কারণ, এ সময়টা বড় খারাপ। সেইজন্য বলি এখন বাপের বাড়ি থেকে এসো না। বরং, শীতকালে আসিবে। তখন এখানে ভাল থাকিবে। আর অধিক কি লিখিব? তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি

তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

১ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং বাঁকুড়া হিন্দু স্কুলের শিক্ষক।

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘরের ছাপ [তারিখ ঃ 15 Oct. (19)15] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের ছাপ [তারিখ ঃ 17 Oct. (19)15] আছে।

||৯||

বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত*
(অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
২৬/১১/(১৯)১৯

কল্যাণবরেষু মা,

তোমার পত্র পাইলাম। আমি ভাল আছি। তোমাদের সকলের কুশল পাইয়া সুখী হইলাম। রাধু সেইরূপই আছে এবং দাঁড়াইবার চেষ্টাই করে নাই। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা
তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে শেওড়া ডাকঘরের [তারিখ: 27 Nov (19)19] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখ: 28 Nov (19)19 ও সময়: 7.30 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

||১০||

বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত*
(অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
১লা ফাল্গুন [১৩২৬]

কল্যাণীয়া বৌমা,

তোমার পত্রখানি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীমান বিভূতির অসুখ এখনো সারে নাই জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

পশ্চিমে স্থান পরিবর্তন করা যদি একান্ত দরকার বিবেচনা সকলে করে তাহা হইলে করিবে। দেশের জলবায়ুও তো এবার ভাল হইতেছে যাহা হউক, যাহা ভাল বিবেচনা করিবে সেই মতো করিবে। আমি একপ্রকার আছি, তবে মধ্যে মধ্যে ১০২° জ্বর হইতেছে। উপস্থিত একটু ভাল আছি। রাধুর খোকার আমাশয় এপর্যন্ত সারে নাই। মধ্যে একদিন খুব বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। উপস্থিত একটু ভাল আছে। রাধু, মাকু ও অন্যান্য সকলে একপ্রকার ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 14 Feb (19)20] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 15 Feb (19)20 ও সময়ঃ 7.30 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

।।১১।।
বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত*
(অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

কলিকাতা
৪ জ্যৈষ্ঠ [১৩২৭]

কল্যাণীয়াসু

বৌমা তোমার পত্রখানি অদ্য পাইলাম। আমার জ্বর আজ দুইদিন অমাবস্যার জন্য একটু বাড়িয়াছে। কি করিয়া যে ভাল হইব

তাহা জানি না। এখানে এখন জায়গা নাই। আমাকে লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত। অতএব তোমরা এখন এখানে আসিও না। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে বাগবাজার ডাকঘরের [তারিখঃ 19 May (19)20 ও সময়ঃ 10.30 A.M.] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 20 May (19)20 ও সময়ঃ 7 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

॥১২॥

বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
পোঃ দেশড়া
২৬ শ্রাবণ

পরম কল্যাণীয়া

বৌমা, তোমার ও বিভূতির পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার শরীর ভাল আছে। মধ্যে জ্বর হইয়াছিল, পথ্য করিয়া অবধি ভাল আছি। রাধুর ক্রমশ সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু এপর্যন্ত দাঁড়াইতে না পারায় অত্যন্ত চিন্তিত আছি। খোকা ভাল আছে। নলিনী কলিকাতা গিয়াছে। সে এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকিবে। ভূদেবের

বৌ এখন তাহার বাপের বাড়িতেই আছে ও ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি—

আশীর্বাদিকা
তোমাদের
মাতাঠাকুরানী

।।১৩।।

বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত

জয়রামবাটী
২১ শে চৈত্র, মঙ্গলবার

পরম আশীর্বাদ।

বিশেষ পরে মা বৌমা,

তোমার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আমার শরীর উপস্থিত ভাল আছে। তুমি, খোকা কেমন আছ লিখিবে। বিভূতিকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। আর কি অধিক লিখিব? তোমরা আমার আমার আশীর্বাদ জানিবে। আর এখানের সকলে ভাল আছে। তুমি এমনি মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আর বিভূতিকে বলিবে ঔষধে কিছু হয় নাই। তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। ওখানের (বাঁকুড়ার) কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি

তোমাদের
মা

একই পত্রে কমলা ঘোষকে লিখিত রাধু-দির পত্র

পরমপূজনীয়া

ভাই বৌদিদি, তোমার পত্র পাইয়া যে কি পর্যন্ত আনন্দিত হইলাম,

তাহা এই সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। আমি দিদিকে (নলিনী-দিকে) ও মাকু-দিকে পত্র দিতে বলিলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। তুমি, বিভূতি দাদা, খোকা এবং তোমার মা সকলে কেমন আছেন ও আছ লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার ভালবাসার নমস্কার জানিবে। এখানের (সব) কুশল। তোমাদের কুশল দিবে। ইতি

তোমার বন্ধু
রাধা

॥১৪॥

বিভূতিভূষণ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে লিখিত

শ্রীশ্রীহরি।

১৫ই বৈশাখ
শনিবার

পরম আশীর্বাদ।

পরে মা, তোমার পত্র পাইলাম। কাজের ঝঞ্ঝাটে পত্র দিতে পারি নাই। আমার বাত সেইরকমই আছে। আর মাকু ২ দিন থাকতে শ্বশুরবাটী যাইবে। রাধু এখন থাকবে। সকলে ভাল আছে। খোকা কেমন আছে লিখিবে। বিভূতি কেমন আছে? মা (রোহিণীবালা) কেমন আছে, সব লিখিবে। আর তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের (জয়রামবাটীর) সব কুশল। ওখানের (বাঁকুড়ার) সব কুশল দিবে। ইতি

তোমাদের মাতা

একই পত্রে কমলা ঘোষকে লিখিত রাধু-দির পত্র

পরম পূজনীয়া ভাই বৌদিদি,

তোমার পত্র পাইলাম। আমি মনে করেছিলাম বুঝি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। ভাই, খোকা কেমন আছে লিখিবে। আর আমি ভাল আছি। তোমাদের কুশল দিবে। এখানের কুশল। তুমি আমার ভালবাসার প্রণাম জানিবে। ইতি

তোমার বন্ধু
রাধা

একই পত্রে কমলা ঘোষকে লিখিত মাকু-দির পত্র

প্রিয় বন্ধু ভাই বৌদিদি,

তুমি আমার স্নেহ-সম্ভাষণ জানিবে। আমি তোমার কথা ও খোকা বাবাজীবনের কথা বিভূতি-দাদার কাছে খোঁজ পাই। সেইজন্য পত্র দিই না। সেইজন্য রাগ করিবে না। আমি এই মাসেই শ্বশুরবাড়ি যাব। তাই বিভূতি দাদা যখন আসিবে তাঁকে বলিবে যেন একখানি ছোট মাদুর খোকার জন্য কিনিয়া আনে। এখানে দাম দিদি (নলিনী-দি) দিবেন। এখানের মঙ্গল। তোমাদের কুশল দিবে। ভাই তোমার সঙ্গে আমার আবার কখন দেখা হইবে জানি না। ইতি

মাকু

॥১৫॥

বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত

কোয়ালপাড়া
১৩২৬। ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণবরেষু

তোমার পৌঁছানোর সংবাদ পাইয়াছি। শ্রীমান বরদা ভাইজীবন (বরদাপ্রসাদ, শ্রীশ্রীমায়ের ভাই) অনেক দিন হাতের ঘায়ে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছে। সেইজন্য সে বাঁকুড়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব তুমি কিছু খবর লইয়া কলিকাতায় গিয়া বরদাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বৈকুণ্ঠদের আশ্রমে (বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে) রাখিবে। আমি এখানে বৈকুণ্ঠকে বলিলাম। বরদাকে তুমি একটু সাবধানে রাখিবে। বৈকুণ্ঠ শীঘ্রই বাঁকুড়ায় যাইতেছে। তোমরা কেমন আছ? আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীমতী রাধারানী একই রকম আছে। খোকা ভাল আছে। মাকু ও তাহার ছেলে ভাল আছে। আমি একপ্রকার ভাল আছি। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার
মাতাঠাকুরানী

।।১৬।।
বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
১৩২৬/ ২৯ জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারানী একরূপই আছে। খোকা ভাল আছে। শ্রীমান বরদার এখন বাঁকুড়া যাওয়া হইল না। সে একবার দেশে আসিবে, অতএব তুমি কলিকাতা না গিয়া ঐ টাকায় ৩/৪ খানি কম্বল খরিদ করিয়া লইয়া আসিবে। অথবা যদি পাঠাইবার লোক পাও তাহা হইলে পাঠাইয়া দিবে। তোমরা কেমন আছ? আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘরের [তারিখঃ 13 Jun (19)19 ও সময়ঃ 1.30 P.M.] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 14 Jun (19)19 ও সময়ঃ 7 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

।।১৭।।
বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

কোয়ালপাড়া
১৩২৬ / ১৭ আষাঢ়

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার দুইখানি পত্র পাইলাম। শ্রীমতী রাধারানী ক্রমশ সারিতেছে। খোকার মিলমিলে (?) হইয়াছিল, এখন ভাল আছে। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছ লিখিও। শ্রীমান বরদা এখনও জয়রামবাটীতে আসে নাই। আমি একপ্রকার ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্বাদিকা তোমার
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে কোতুলপুর ডাকঘরের [তারিখ: 2 Jul (19)19 ও সময়: 1.30 P.M.] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখ: 3 Jul (19)19 ও সময়: 7 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

।।১৮।।
বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত (অপ্রকাশিত)*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
৫ই ভাদ্র [১৩২৬]

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন বিভূতি, তোমরা নিরাপদে পৌঁছিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। রাধু কল্য ২টার সময় একবার দাঁড়াইয়া ছিল, পরে বা

কোমরে কিছু হয় নাই। তবে চলিতে পারে নাই।

আমি ভাল আছি, বাকি সকলে ভাল আছে।

রামেন্দ্রর[২] অনেকটা সুবিধা হইয়া আসিতেছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। বৌমার [বিভূতিবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলাবালা ঘোষের] চিঠিখানি রাধু হাতে করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ তাহাতে রাধুকে দাঁড়াইবার বা চলিবার কথা লেখা আছে বলিয়া। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

* পোস্টকার্ডটিতে দেশড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 24 Aug (19)19] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [তারিখঃ 25 Aug (19)19 ও সময়ঃ 7 A.M.] ছাপ আছে।—**সম্পাদক**

২ শ্রীশ্রীমা রামেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার সংবাদ দিয়ে বিভূতিবাবুকে বর্তমান ও পরবর্তী পত্রটি লেখেন। ৫ ভাদ্র [১৩২৬] জয়রামবাটী থেকে পাঠানো পোস্টকার্ডটিতে স্বামী ঈশানানন্দও বিভূতিবাবুকে পত্র লেখেন। সেখানেও রামেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার কথা রয়েছে। এই পোস্টকার্ডে দেশড়া ডাকঘরের [২৪ আগস্ট (১৯)১৯] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [২৫ আগস্ট (১৯)১৯] ছাপ দেখা যায়।

দ্বিতীয় পত্রটি সম্ভবত খামের মধ্যে করে লোকমারফৎ পাঠানো হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর দুর্বলতা দূর করার জন্য একটি গাভি কেনা হয় এবং গাভিটির জন্য রামেন্দ্র নামে একটি বাগালকে রাখা হয়। ভাদ্রমাসে মাঠে ঘাস কেটে আনার সময় রামেন্দ্রর বাঁহাতের তর্জনীতে বোড়া সাপ কামড়ায়। বিভূতিবাবু ও একজন ডাক্তার তার হাতে বাঁধন দিয়ে, হাতের আঙুলে ছুরি দিয়ে চিরে রক্ত বের করে দিতে থাকেন। সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীমা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলেনঃ "ও বিভূতি, ওসব কেন করছ? ওকে সিংহবাহিনীর মাড়োতে দাও এবং ক্ষতস্থানে মায়ের স্থানের মাটির প্রলেপ দাও এবং মায়ের স্নানজল খাইয়ে দাও। ভাল হয়ে যাবে।" তাই করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই রামেন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠে।—**সম্পাদক**

||১৯||

বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
সোমবার

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ পরে

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। রাধুর মধ্যে পেটের অসুখের জন্য একটু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আর দাঁড়াইবার ও চলিবার চেষ্টা করে নাই। যাহা হউক একবার দাঁড়ানোতে দেখা গেল যে, পায়ে বা কোমরের কোনখানে কোন কিছু হয় নাই। তুমি তেল বা ঘি মালিশের কথা লিখিয়াছ, কিন্তু রাধু তাহা কোনদিনই করিতে দেয় না। রামেন্দ্রর সম্বন্ধে অন্য চিকিৎসা করিতে এখানকার সকলে নিষেধ করিতেছে। তবে ফুলো সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে ও আঙুলটি আর [খসিয়া] পড়ে নাই, কিন্তু রাত্রে খুব যন্ত্রণা হয়। যাহা হউক মা সিংহবাহিনী যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মাটি লাগানো হইতেছে। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। আশাকরি তোমরা ভাল আছ। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

।।২০।।
বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত* (অপ্রকাশিত)

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা

Udbodhan Office
12, 13 Gopal Chandra Neogi Lane
Baghbazar P.O., Calcutta

৭ই আশ্বিন [১৩২৬]
মঙ্গলবার

পরম কল্যাণীয় দীর্ঘজীবেষু
বাবাজীবন বিভূতি,

তোমার পত্র পাইয়াছি। পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। তুমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মঠের, বাগবাজারের প্রভৃতি সকলে ভাল আছে শুনিয়া আহ্লাদিত। গণেন আসিবে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আসিবে শুনিয়াও আহ্লাদিত হইলাম। এখানের সকলে ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার
মা

* পোস্টকার্ডটির বামদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের 'চিহ্ন' মুদ্রিত আছে এবং ডানদিকে উদ্বোধন অফিসের ঠিকানা মুদ্রিত আছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা চিঠিটি দিচ্ছেন জয়রামবাটী থেকে কারণ, পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘরের ছাপ অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এবং চিঠিটি ২৪/১০/১৯১৯ তারিখের বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঐ সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন।—**সম্পাদক**

॥২১॥

বিভূতিভূষণ ঘোষকে লিখিত

জয়মা

জয়রামবাটী
১৫ই [চৈত্র ?]

পরম কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন তোমাদের প্রেরিত ঔষধ খাইতেছি ও মালিশ করিতেছি। এখন একটু ভাল আছি। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও বৈকুণ্ঠকে (স্বামী মহেশ্বরানন্দ বা ডাক্তার মহারাজ) আমার আশীর্বাদ দিবে। খোকা কেমন আছে লিখিবে। তুমি আসিবার সময় দুইখানি করকেটে (করোগেটেড) টিন আনিবে। কারণ, আমাদের একটা গাই খরিদ করিয়াছি। বর্তমান সময় তাহাকে সদরের ও নলিনীর ঘরে মধ্য রাখিয়াছি। জল ঝড় হইলে রাখার অসুবিধা হইবে। সেইজন্য টিনের বিশেষ দরকার।

তোমাদের কুশল জানাইবে। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী*

* বিভূতিভূষণ ঘোষ, অনিলবরণ ঘোষ ও কমলা ঘোষকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের চৌদ্দটি পত্রের মধ্যে পাঁচটি (পত্রসংখ্যা—৮, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২১) 'নিবোধত', ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃঃ ২৬৬-২৬৮-তে প্রকাশিত। বাকি নয়টি (পত্রসংখ্যা—৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০) বিভূতিভূষণ ঘোষের পৌত্র **বিশ্বজিৎ ঘোষের** সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। —**সম্পাদক**

একাদশ পর্ব

মাতাঠাকুরানী

স্বামী শিবানন্দ

এ যুগের সমগ্র নারীজাতির আদর্শ হলেন মা-ঠাকরুন। তাঁর জীবন অতি অদ্ভুত। নরদেহ ধারণ করে সাধারণ গৃহবধূর মতো থাকতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী। শাস্ত্রে যে কালী, তারা, ষোড়শী ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে, মা-ঠাকরুন ছিলেন সেই দশমহাবিদ্যার একজন। ঠাকুরের যুগধর্মসংস্থাপনরূপ নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। নিজের ঐশ ভাব এত গোপন করে থাকতেন যে, তাঁকে কিছুই বুঝবার জো ছিল না। তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন আর স্বামীজী কতকটা বুঝেছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার পূর্বে একমাত্র মাকে বলেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্রপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। মা-ও তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেনঃ "বাবা, তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এস; তোমার মুখে সরস্বতী বসুন।" হয়েছিলও তাই। মায়ের আশীর্বাদে স্বামীজী বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। মা-ঠাকরুনের ওপর স্বামীজীর কী গভীর ভক্তিই না ছিল! তিনি বলেছিলেন যে, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্রপারে গিয়ে জগৎ জয় করে এসেছেন। তিনি কখনো এ-ও বলতেন যে, মা ঠাকুরের চাইতেও বড়। এত গভীর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের ওপর! ঠাকুরও বলেছিলেনঃ "নহবতে যে আছে সে যদি কোন কারণে কারো ওপর বিরূপ হয়, তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।"

জগতের সমগ্র নারীজাতিকে জাগাবার জন্য মহাশক্তিরূপিণী মা এসেছিলেন নরদেহে। মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কী অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে! তারা এখন নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য

বদ্ধপরিকর। এখনো হয়েছে কী! এই তো সবেমাত্র আরম্ভ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারীচরিত্রের বিকাশ হয়েছিল, এযুগে মেয়েদের ভিতর তার চাইতেও বড় বড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ এসেছে, আরও আসবে। এসব ঐশী শক্তির খেলা। সাধারণ মানুষ এসকলের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।

মা তো সকলেরই মা ছিলেন। তাঁর কত দয়া, কত ক্ষমা, আর কী অদ্ভুত সহিষ্ণুতা ছিল! মাকে আমরাই বা কতটুকু জেনেছি? তবে তিনি কৃপা করে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। তাঁর স্বরূপ যে কি, তা তিনি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝবার উপায় নেই। প্রথমটায় যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ), পরে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) মায়ের খুব সেবা করেছিলেন। আমিও একবার জয়রামবাটী গিয়ে মাকে রান্না করে খাইয়েছিলাম। সে বহুদিনের কথা—ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরে। মা তখন জয়রামবাটীতে রয়েছেন। আমি, শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও আরেকজন কে ছিল তা ঠিক মনে নেই, বোধহয় খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ)—আমরা তিনজন মাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। তখন জয়রামবাটীতে ভক্তেরা বড় একটা কেউ যেত না, আর যাতায়াতেরও খুব কষ্ট ছিল। আমরা আগে থেকেই মাকে খবর দিয়েছিলাম। আমাদের দেখে মা-র কত যে আনন্দ! কি খাওয়াবেন, কি করে আমাদের সুখী করবেন—তাই নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। জয়রামবাটী তো খুব পাড়াগাঁ—জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু তারই মধ্যে মা গয়লাকে বলে দুধের বন্দোবস্ত, মেছুনীকে বলে মাছের যোগাড়, আর নানারকমের তরিতরকারি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কলকাতার লোকদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, মা তা জানতেন। তাই আমাদের জন্য চায়ের যোগাড় করে রেখেছিলেন। সারাদিন তো বেশ আনন্দে কেটে গেল। আমরা তালপুকুরে খুব নেয়েছিলাম। মা আমাদের সামনে বড় একটা বেরুতেন না, কথাও বলতেন না।

রাত্রে খেয়েদেয়ে শোওয়ার পরে শশী মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, পরদিন মাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। পরদিন সকালে চা-টা খাওয়ার পরে মার কাছে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করাতে মা তো প্রথমটা হেসেই আমাদের কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেনঃ "সে কি হয়, বাবা? তোমরা আমার কাছে এসেছ, আমি মা, কোথায় আমি তোমাদের রান্না করে খাওয়াব, না তোমরা বলছ রান্না করে আমায় খাওয়াবে! আর তোমরা রাঁধতে পারবে কেন? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের চোখ জ্বলে যাবে।" ইত্যাদি অনেক আপত্তি দেখালেন। আমরা মা-র কথা কিছুতেই শুনলাম না, খুব জেদ করতে লাগলাম। শেষটায় আমি বললামঃ "আমাদের তো ব্রাহ্মণ-শরীর, আমাদের হাতের রান্না খেতে আপনার কেন আপত্তি হবে? ঠাকুরও তো আমার হাতের রান্না খেয়েছিলেন।" ইত্যাদি। অগত্যা মা রাজি হলেন। শশী মহারাজ ও আমি রান্না করলাম। মা খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

সেবার মায়ের কাছে আমরা কয়েকদিন মহা আনন্দে কাটিয়েছিলাম। আহা, মায়ের কী স্নেহ! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সর্বদাই মহা ব্যস্ত থাকতেন যাতে আমাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। আমার তো অল্পবয়সে গর্ভধারিণী মা মারা গিয়েছিলেন; ঠিক মায়ের স্নেহ-যত্ন যে কি জিনিস তা আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়ে সেই স্নেহ-যত্ন পেয়েছিলাম। কয়েকদিন পরে এক রাত্রে আমার খুব কেঁপে জ্বর এল। সন্ধ্যা থেকেই একটু একটু জ্বরভাব বোধ করছিলাম; তার ওপরই খেয়েছিলাম। মার কাছে তো না খাওয়ার জো ছিল না! রাত্রে যখন শুলাম তখন খুব কেঁপে জ্বর। যত রাত বাড়তে লাগল জ্বরও তত বেশি হতে লাগল। সারা রাত একরকম বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাত্রে শশী মহারাজকে ধীরে ধীরে ডেকে বললামঃ "ভাই, আর নয়। এখানে জ্বর নিয়ে থাকলে মাকে খালি কষ্ট দেওয়া হবে। কাল সকালেই মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। তারপর যা হওয়ার হবে।" শশী মহারাজও তাতে রাজি হলেন। ভোর হতেই আমরা তিনজন মাকে প্রণাম করে রওনা দিলাম। এত শীঘ্র শীঘ্র চলে আসছিলাম

বলে মা প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিলেন। শেষে আমাদের ঝোঁক দেখে আর কিছু বললেন না।

তিনি আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী; ঠাকুরে লীলাপুষ্টির জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন। মাকে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। তাঁর ভাব এত চাপা ছিল যে, তাঁকে কে বুঝবে? কে বলবে যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেনঃ "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।" মার কাছে খুব ভক্তি-বিশ্বাস প্রার্থনা করতে হয়। তিনি প্রসন্না হলেই জীবের ভক্তি মুক্তি সব হয়।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুরের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে খুব যত্ন করে কাছে রেখেছিলেন এবং অতি যত্নে তাঁকে সাধনভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, উৎসাহিত করতেন এবং সবরকমে তাঁর সাহায্য করতেন। কিন্তু ঠাকুর তা করেছিলেন নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর। সেই সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদের বলতেনঃ "কালী-মন্দিরে যে-মা আছেন, এর ভিতরে (নিজের শরীর দেখিয়ে) সেই মা-ই বিরাজ করছেন এবং সেই মা-ই (শ্রীশ্রীমা-রূপে) আমার কাছে রয়েছেন।" এখন ঠাকুর কেন ওরূপ করেছিলেন তা কখনো বুঝতে চাইনি, চেষ্টাও করিনি। ঠাকুর ওরূপ করেছিলেন, এই পর্যন্ত আমরা জানি। ভগবান স্বয়ং নরদেহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে এসেছিলেন। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। আর তা বোঝবার প্রবৃত্তিও কখনো হয়নি।

জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে? কী সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! কী চাপা! ঠিক যেন ছদ্মবেশে থাকতেন।

আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনিই কৃপা করে জ্ঞান দেন। জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানা; এই জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি হওয়া সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস। মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেওয়ার মালিক। তিনি কৃপা করে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার খুলে দিলে তবেই জীব

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারে, নচেৎ নয়। 'চণ্ডী'-তে আছে "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—সেই মহামায়াই প্রসন্ন হয়ে মানবগণকে মুক্তির জন্য বরপ্রদান করেন। মস্তিষ্কের ভিতর কত কি সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। তার একটু কিছু বিগড়ে গেলেই হয়ে গেল। মা-ঠাকরুন বলতেনঃ 'ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে যাতে মাথাটা ঠিক থাকে।" মাথাটি বিগড়ে গেলেই ব্যস—সব হয়ে গেল। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "Shoot me if my brain goes wrong." (আমার মাথা যদি বিগড়ে যায় তো আমায় গুলি করে মেরে ফেলো।)

মঠে মায়ের (মা দুর্গার) পুজো যেমন হয় তেমনটি আর কোথাও হয় না। এখানকার পুজো ঠিক ঠিক ভক্তির পুজো। আমাদের কোন কামনা নেই, আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য এই পুজো করি। আমাদের সেই বরানগর মঠ থেকেই স্বামীজী দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। তখন অবশ্য ঘটে-পটে পুজো হতো। সেখানে একবার পাঁঠাবলিও হয়েছিল; সুরেশবাবু সে-পাঁঠাটা দিয়েছিলেন। তারপর সব পাঁঠাটা দিয়ে হোম করা হলো। সে-বলির ব্যাপার মাস্টারমশায় প্রভৃতি ভক্তদের প্রাণে খুব লেগেছিল, তাঁরা সকলে মা-ঠাকরুনের কাছে গিয়ে ও-বিষয়ে বলেন। তাতে মা বলেছিলেনঃ "এদের প্রাণে যখন কষ্ট হচ্ছে, তা বলি না-ই বা দিলে।" সেই থেকে আর পাঁঠাবলি দেওয়া হয়নি। তারপর এ-মঠেও (বেলুড় মঠে) স্বামীজীই প্রথম প্রতিমায় পুজো করেন। পুজোর কদিন মা-ঠাকরুনও এসে বেলুড়ে ছিলেন—নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে। মা বলেছিলেনঃ "প্রতি বৎসরই মা দুর্গা এখানে আসবেন।"

মা-ই সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাঁর কৃপায় আমাদের মঠে নিত্য তাঁর পুজো হয়। তিনিই কৃপা করে সকলের অজ্ঞান দূর করেন, জ্ঞান-ভক্তি প্রদান করেন।

আমাদের মা সাধারণ মানবী নন—অবতারবরিষ্ঠের লীলাসঙ্গিনী। ঠাকুরের লীলাপুষ্টির জন্য তিনি নরদেহ ধারণ করেছেন; রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য সকলের সঙ্গেই এই মা-ই এসেছেন। কিন্তু তাঁকে কে চিনতে পারে? বৌটির মতো ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। তিনি কৃপা করে না

বোঝালে কে বুঝবে তাঁকে! মানুষের সৌভাগ্য যে তাঁরা আসেন, কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য যে খুব কম জনই তাঁকে চিনতে পারে।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গোরা রায়,
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

যার দৃষ্টি আছে সেই শুধু ঠাকুর ও মাকে চিনতে পেরেছে। যেই মায়ের শরীরদাহ শেষ হলো আর বৃষ্টি শুরু হলো! যেন দেবতারা মহামায়ার চিতায় শান্তিবারি বর্ষণ করে চিতার আগুন নেভাচ্ছিলেন। সেই থেকে এই স্থান মহাতীর্থ হয়ে গেল। সতীর দেহের এক-একটি অংশ পড়ে একান্নটি পীঠ হয়েছে! আর সেই সতীর সারা দেহটা বেলুড় মঠে দাহ করা হয়েছিল। সুতরাং বেলুড় মঠ শুধু পীঠ নয়, মহাপীঠ! মহাপীঠ! জয় মা! জয় মা!!

মা-ঠাকরুন সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক প্রকাশ, যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি, তেমনি। এযুগে ভগবানের ভক্ত রূপে অবতরণ। যুগধর্মসংস্থাপক শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায় হয়ে গোপনে (যেমন প্রভুও গোপনে) অতি দীনভাবে দীন পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে, বঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে অবতীর্ণ হয়ে জীবের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের জন্য সর্বদা তৎপর থাকতেন। সুতরাং তাঁর কৃপা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁর সেই অহেতুকী মাতৃস্নেহ যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরা ধন্য হয়েছেন। সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই কুণ্ডলিনী শক্তি, সেই জগজ্জননী অহেতুকী স্নেহের পরবশ হয়ে যে-ভক্তকে একবার শ্রীকরকমল দ্বারা স্পর্শ করেছেন, তাঁর চৈতন্য হয়েছেই হয়েছে বা হবেই হবে—এই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।* ❑

সঙ্কলন : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উৎস : শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ১৩শ সং, ১৩৯২, পৃঃ ১৫৯-১৬৪, ৬; ২য় ভাগ, ৫ম সং, ১৩৯৫, পৃঃ ২২-২৩, ১০০-১০১, ৩৫, ১৭৯-১৮০; **শতরূপে সারদা**, ১ম সং, ১৩৯২, পৃঃ ৮২-৮৪

* উদ্বোধন, ১০০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৫, পৃঃ ৭৯৫-৭৯৭

মাতৃস্মৃতি

স্বামী সারদানন্দ

জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার (১৮৭২) পথে প্রথম মা কালীকে মায়ের দর্শন। [তারকেশ্বরের কাছে চটিতে]

দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীমা অবস্থান করতেন তখন ঠাকুর মাঝে মাঝে মাকে অনেক বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। মা বলতেনঃ "এখন আমি উত্তর দিতে পারবনি। পরে, বুঝে বলব।" ঠাকুর বলতেনঃ "এখুনি বল না, তুমি আর কার সঙ্গে বুঝতে যাবে যে, পরে বুঝে বলবে?" শ্রীমা তবুও বলতেনঃ "পরে, বুঝে বলব।" তারপর নহবতে গিয়ে মা কালীর নিকট খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করে বলতেনঃ "মা, তুমি আমায় যা বলবার বলে দাও।" ঐরূপ করলেই তাঁর মনে ঐ বিষয়ের একটি মীমাংসা উদয় হতো ও ঠাকুরকে গিয়ে বলতেন।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের খুব যখন অসুখ বেড়েছে, শ্রীমা কাতর হয়ে পড়ে আছেন, এমন সময় দেখেন—সেই কালো মেয়ে, এত বড় চুল, এসে কাছে বসলেন। মা বললেনঃ "ওমা, তুমি এলে!" মা কালীঃ "হ্যাঁ, এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম।" আরো সব কি কথার পর শ্রীমা দেখলেন, ঐ কালো মেয়েটি ঘাড়টি বেঁকিয়ে আছেন। দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি ঘাড় মাথা অমন বেঁকিয়ে রয়েছ কেন?" মা কালী বললেনঃ "গলায় ঘায়ের জন্য।" শ্রীমাঃ "ওমা! ওঁর গলায় ঘা হয়েছে, তোমারও হয়েছে?" মা কালীঃ "হ্যাঁ।" এইরূপে ঠাকুর ও তিনি যে এক, তা মাকে বুঝিয়ে দেন।...

ঠাকুর কাশীপুরে যখন, শ্রীমা একদিন তাঁকে খাওয়াতে ওপরে গেছেন। কথায় কথায় ঠাকুর বললেনঃ " 'অষ্টা-কষ্টে' খেলেছ?" (পল্লীগ্রামের একপ্রকার কড়িখেলা) মাঃ "না।" ঠাকুরঃ "তাতে যুগ

বাঁধলে আর সে গুটিদের কাটা যায় না। সেইরূপ ইষ্টের সঙ্গে যুগ বাঁধতে হয়, তাহলে আর ভয় থাকে না। নইলে পাকা গুটি হয় আর কঁ্যাচ করে কেটে দেয়। ইষ্টের সঙ্গে যুগ বেঁধে সংসারে চললে আর কাটা যাবার ভয় থাকে না।" শ্রীমা ঐসব কথাও শুনছেন, আবার এটা ওটা ঠাকুরের কাজও করছেন। তাই দেখে ঠাকুর ঐসব কথা বলতে বলতে রহস্য করে বললেনঃ "অ মাসী! শুনচুস? না এইটি?" শ্রীমা বলেনঃ "আমি অবাক!"

হলধারীকে মা কখনো দেখেননি। কারণ, তার মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরে আসেন। হলধারীর সঙ্গে সম্পর্ক না জেনে ঠাকুরের সামনে তার (হলধারীর) নাম ধরায় ঠাকুরের হৃদয়কে বলা মাকে বলে দিতে যে, হলধারী তাঁর ভাসুর ছিলেন; সেজন্য নাম ধরতে নেই।

ষোড়শী পুজোর সময় হৃদয় বোধহয় কালীঘরের পুজোয় ব্যস্ত ছিল। অথবা, তাকে লুকিয়ে ঐ পুজো হয় তা ঠিক জানা যায় না।... মা গৌরী পণ্ডিতকে দেখেন। ষোড়শী পুজোর পর দেশে ফিরে যান।* ❑

* শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কিত এই উপাদান স্বামী সারদানন্দ যোগীন-মা মারফৎ পান। আকর: রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২২-২৩। সৌজন্য: **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (শরৎ চাটার্জী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০৩)।—**সম্পাদক**

মাঠাকরুনের কথা

শ্রীম

।।১।।

যখন ঠাকুরের দেহ গেল, মা বললেন, তাঁর মায়া দেহ চলে গেল। চিন্ময় দেহ নিত্য বিরাজমান। একবার হৃদয় মুখুজ্যে বললেনঃ "মামী, মামাকে তুমি বাবা বললে পাঁচ সের সন্দেশ খাওয়াব।" মা বললেনঃ "তোমায় সন্দেশ খাওয়াতে হবে না। আমি অমনি বলছি, তিনি আমার বাপ, মা, গুরু, সখা, পতি—সব তিনি।" সব অবস্থাতেই পেয়েছিলেন কিনা! কী বিশ্বাস মায়ের!

কখনো কখনো নবতের ওখানে দাঁড়িয়ে [ঠাকুর] মায়ের সঙ্গে কথা কইতেন দেখা যেত। মায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গৌরী-মা—এঁরা সব থাকতেন। বৃন্দে ঝি মাঝে মাঝে আসত—ঠিকা মতো ছিল। সাবির মা থাকত। এইটুকু ঘর—এতগুলি লোক। আবার এর মধ্যেই সব জিনিসপত্র রয়েছে। (শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ২য় ভাগ, ১৩৭৭, পৃঃ ৬১)

স্ত্রী সতীসাধ্বী হলে তার জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। ঠাকুর নিজে মাঠাকরুনের জন্য একটি কুটির রেখে গিয়েছিলেন আর চারশ টাকা। সখীভাবে সাধনের সময় যেসব অলঙ্কার দিয়েছিলেন মথুরবাবু, সেইগুলি বিক্রি করে এই চারশ টাকা হয়। বলরামবাবুদের জমিদারিতে জমা ছিল। সুদ হতো বছরে ত্রিশ টাকা।[১] ঠাকুর মাঝে মাঝে আমাদের জিজ্ঞেস করতেনঃ "আচ্ছা, একজন ব্রাহ্মণ বিধবার মাসে

১ বছরে ৩০ টাকা নয়, ছ-মাসে ৩০ টাকা। অর্থাৎ মাসে ৫ টাকা সুদ। এই প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শ্রীমায়ের ভরণপোষণের চিন্তাও ঠাকুরের মনে উঠিত। তিনি অত ত্যাগী হইলেও একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ক টাকা হলে হাত-খরচ চলে?' মা বলিলেন, 'এই পাঁচ-ছ টাকা

দুটাকা হলেই হয়ে যায়, কি বলো?" এদিকে তো দিনরাতের খবর নাই, গায়ে কাপড় আছে কি নাই, তার খবর নাই, ওদিকে কত ভাবনা। কেন এসব করলেন, না অপরে ইহা পালন করবে। (ঐ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ৬২)

একবার মা ধ্যান করছিলেন। কে যেন গিয়ে জোরে ডাক দিল। ধ্যান ভেঙে গেল। আর অমনি আর্তনাদ করে উঠলেন। শুনে ঠাকুর নিজের ঘর থেকে ছুটে এলেন। মা নবতে ছিলেন। তখন শান্ত হন। অন্যাদের বললেনঃ "ধ্যানের সময় কারুকে ডাক দিতে নেই। কোনো শব্দ করতে নেই।" (ঐ, ১০ম ভাগ, ১৩৭৯, পৃঃ ১৬)

॥২॥

ঠাকুর মাকে [দক্ষিণেশ্বরে] এনে এক বিছানায় আট মাস রাখলেন। কেন? ভক্তদের শিক্ষার জন্য। এক বিছানায় শয়ন অথচ দেহ-সম্পর্ক নাই—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ'। তবে তো ভক্তেরা সাহস পাবে, উৎসাহ পাবে ভাই-বোনের মতো থাকতে।... তাঁর বিয়েই হলো লোকশিক্ষার জন্য। বিয়ে করে কি করে থাকতে হয় তা নিজে করে দেখালেন। (ঐ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৫)

হলেই চলে।' তারপর প্রশ্ন করিলেন, 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?' মা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন, খাবার কথা কি করিয়া বলেন? এদিকে ঠাকুরেরও প্রশ্নের বিরতি নাই। তখন তিনি বলিলেন, 'এই পাঁচ-ছ খানা খাই।' ঠাকুর খরচের পরিমাণ হিসাব করিয়া বলিলেন, 'তাহলে পাঁচ-ছয় টাকায় তোমার খুব চলে যাবে।' পরে ঐ পরিমাণ [৬০০ টাকা] টাকা তিনি বলরামবাবুর নিকট গচ্ছিত রাখেন। বলরামবাবু ঐ টাকা জমিদারিতে খাটাইয়া ছয় মাস অন্তর ৩০ টাকা সুদ শ্রীমাকে পাঠাইয়া দিতেন। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী, ৪র্থ সং, শ্রাবণ ১৩৭৩, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১০৭-১০৮।) একই ঘটনা সরলাদেবীর স্মৃতিকথায় পাই একটু অন্যভাবেঃ "'আমি যখন নহবতে থাকতুম, ঠাকুর একদিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ক টাকায় তোমার চলে?" আমার ৫ টাকা কি ৬ টাকায় চলে জেনে আমার জন্য ৬০০ টাকা রেখে দিয়েছেন।' মায়ের ঐ টাকা বলরামবাবুর জমিদারিতে খাটানো হইত ও মাসিক ৬ টাকা হিসাবে উহার সুদ হইত। মা ঐ টাকাকে তাঁর নিজের টাকা বলিতেন।" (দ্রঃ মাতৃদর্শন, স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত, ৪র্থ সং, পৌষ ১৪০১, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৬৮)—**সম্পাদক**

তিনি (ঠাকুর) কী কষ্টেই কাটিয়েছেন। মথুরবাবুর শরীর গেল। আর কেউ নেই দেখবার। বারোটা-একটাতে খাওয়া ঐ কড়কড়ে ভাত। মাদুর-বিছানা ময়লা, ছেঁড়া। কত কষ্ট, কিন্তু সেদিকে কোনো দৃষ্টি নাই। এতেই তো শরীর আরও খারাপ হলো। একথা বুঝি মাকে লিখেছিলেনঃ "আমাকে দেখবার কেউ নাই, তুমি যদি আসো ভাল হয়।" মা দেশ থেকে এলেন। তখন সকাল সকাল দুটি রেঁধে খাওয়াতেন। (ঐ, ১৬শ ভাগ, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৩)

ঠাকুর বলতেনঃ "এই যে শক্তি (শ্রীশ্রীমাকে) আমি সামনে রেখেছি, এর দ্বারাই সংসারবন্ধন মোচন করব।" (ঐ, ১ম ভাগ, ১৩৬৭, পৃঃ ১০৫)

মাঠাকরুন বুড়ো হয়ে গেলেন। তবুও এই সেদিন মুখের ঘোমটা একটু ওপরে তুলেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আমরা পাঁচ বৎসর তাঁকে দেখতে পাইনি। খালি শুনতুম ঠাকুর বলতেন—'রামলালের খুড়ী'। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুমঃ "রামলালের 'খুড়ী' কে?" ঠাকুর বললেনঃ "ঐ যে নবতে থাকে।" যাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছি, পঁয়ত্রিশ বৎসর যাঁর সঙ্গ পেয়েছি, যিনি জীবনের guide (পথপ্রদর্শক) ছিলেন—তাঁকেই দেখতে পাইনি! ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তাঁর মুখদর্শন হয়—অনেকদিন পর। ঠাকুরকে তো মাত্র পাঁচ বৎসর পেয়েছিলাম—মাকে পঁয়ত্রিশ বৎসর। (ঐ, পৃঃ ২৮৯-২৯০)

ঠাকুর মাকে বলেছিলেনঃ "এই রইল তোমার মেটে ঘরটি। শাকভাত রেঁধে খাবে আর সারাদিন হরিনাম করবে।" ঘরটি কিন্তু নিজের হওয়া চাই। শাকভাতের জায়গায় না হয় ডালভাত হলো। তাহলেই যথেষ্ট। শুধু ভাতই কটা লোক খেতে পাচ্ছে! তাই মাঠাকরুন কামারপুকুরে ঐ ঘরটি বরাবর রেখে দিছলেন। (ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১৩৭৩, পৃঃ ৩০৯-৩১০)

একবার মাঠাকরুন একটি স্ত্রীভক্তকে বললেনঃ "হ্যাঁ মা, কত সাধু দেখলাম, কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা হয় না।" স্ত্রীভক্তটি বললেনঃ "মা যে কি বলো! অন্য সাধুরা আসেন উদ্ধার হতে, আর তিনি এসেছেন উদ্ধার করতে।" মা সহাস্যে বললেনঃ "তাই তো মা!" ভক্তটিকে পরীক্ষার জন্য [মা] বলেছিলেন। (ঐ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩১)

যারা খালি খাঁটি সাধু খুঁজে বেড়ায় সেসব লোক ঠকে যাবে। নিজে কি তার দিকে নজর নেই, ফিরেও দেখছে না একবার।... ঠাকুর বলতেন, দোষেগুণে মানুষ। নির্দোষ এক ঈশ্বর—অবতার, ঠাকুর। আহা, মা বলেছেনঃ "চন্দ্রে বরং কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-শশীতে কলঙ্ক নাই।" (ঐ, ৩য় ভাগ, ১৩৭২, পৃঃ ৫৫)

আমরা কখনো কখনো চাকর দিয়ে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতাম। মা চাকরকে আসনে বসিয়ে ঠাকুরের উৎকৃষ্ট সব প্রসাদ দিয়ে পরিতৃপ্ত করতেন। কাছে বসে খাওয়াতেন। অন্য লোকদের মতো নয়—চাকরদের জন্য একরকম খাবার, নিজেদের জন্য অন্যরকম। মা-র কাছে ওসব ছিল না—সব একরকম।

একবার মঠ থেকে একটি গোরু এনে উদ্বোধন-এ রাখার কথা হয়েছিল। মা ঐকথা শুনেই বললেনঃ "না না, ওরা ওখানে গঙ্গাদর্শন করছে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। আর সাধুসঙ্গ হচ্ছে। এখানে এনে কিনা একটা ঘরে পুরে গলায় দড়ি দিয়ে রাখবে! তা হবে না। অমন দুধ খেতে পারব না।" আনতে আর দিলেন না। এতেই বোঝা যাচ্ছে, মা পিঁপড়েরও মা। (ঐ, পৃঃ ১৫৬)

মাঠাকরুন একজনকে বলেছিলেনঃ "বিয়ে করিস না বাবা, বিয়ে করিস না। রাত্রিতে তাহলে ঘুমুতে পারবি না শান্তিতে। এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিস না বাছা।" একজন ব্রহ্মচর্য নিয়েছে দেখে বলেছিলেনঃ "নে বাবা, এখন রাতে ঘুমুতে পারবি।" (ঐ, পৃঃ ১৭০)

একবার মা খারাপ দিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তাই দুদিন পরে [ঠাকুর তাঁকে] আবার দেশে পাঠিয়ে দেন যাত্রা বদলিয়ে আসতে। মা ভারি অভিমানিনী, দুবছর আর এদিকে আসেননি। তারপর হঠাৎ ঠাকুর লিখলেনঃ "হৃদয় চলে গেছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখবার কেউ নেই। তুমি শীঘ্র চলে এস।" খবর পেয়েই এলেন। আহা, কী স্নেহবন্ধনে যে মা বেঁধেছিলেন ভক্তদের, বলবার কথা নয়![২] (ঐ, পৃঃ ২০২)

২ মায়ের 'যাত্রাবদল' এবং 'হৃদয়ের চলে যাওয়া' এ-দুটো দুবারের ঘটনা। মা চতুর্থবার (ফেব্রুয়ারি/মার্চ ১৮৮১) যখন এসেছিলেন, তখন হৃদয়ের দুর্ব্যবহারে দেশে

একবার পাঁচটি ছেলে গেল দীক্ষার জন্য। একটি ছেলে একটু অন্যরকম। তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে দিল। ঠাকুরঘর অপবিত্র হবে সে গেলে! সে-ছেলেটি বাইরে বসে কাঁদছে। মা ঘরে ঢুকে চারজনকে দেখতে পেলেন। আরেকজন কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। ওরা বললেঃ "সে ধোপা, বাইরে রয়েছে।" শুনে মা ছুটে বাইরে এলেন, "এস বাবা, ঘরে এস" বলে ডেকে ভিতরে নিলেন। সে যেতে রাজি নয়। জোড়হাত করে কেঁদে বলছেঃ "না মা, না।" মা শুনলেন না। সকলের সঙ্গে তাকেও দীক্ষা দিলেন। (ঐ, পৃঃ ২৮৭)

মা-র কাছে যেতেন একটি ভক্ত ডাক্তার। বাড়িতে দুই-তিন বছরের একটি মেয়ে আছে, আর স্ত্রী আর মা। জমির ধান আছে। ভাতের অভাব নেই। একদিন মা-র কাছে গিয়ে বললেনঃ "আমার সংসার ভাল লাগে না।" মা বললেনঃ "আচ্ছা, দুদিন সবুর কর।" এরই মধ্যে মাঠাকরুনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ডাক্তার স্থির করে ফেলেছেন, সংসারে থাকবেন না। দু-তিনদিন পর স্নান করে এলে মা তাঁকে ডেকে এনে সন্ন্যাস দিলেন। দীক্ষা আগেই [মায়ের কাছে] হয়েছিল। [তিনি মায়ের কাছে] দিনকতক আছেন। খবর পেয়ে ডাক্তারের মা ও স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে হাজির। স্ত্রী বললেঃ "আমাদের কি হবে?" মা উত্তর দিলেনঃ "কেন, তোমাদের খাওয়া-পরার তো কোনো কষ্ট নেই। ওর কাজ ও করছে, তোমাদের কাজ তোমরা কর।" স্ত্রী তার সব অলঙ্কার দিতে চাইলেন মাঠাকরুনের কাছে। মা বাধা দিয়ে বললেনঃ "তা কেন হবে! তোমাদের

চলে যান। হৃদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতাড়িত হন মে-জুন মাসে (১৮৮১ / জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮)। এরপর ঠাকুরের আহ্বানে পঞ্চমবার (ফেব্রুয়ারি/মার্চ ১৮৮২) এসেছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠবার (১৮৮৪; মাঘ ১২৯০) যখন এসেছিলেন, তখন সেইসময়েই ঠাকুরের বাঁহাতের হাড় সরে যায় এবং ঠাকুর সেবারই বলেছিলেনঃ "কবে রওনা হয়েছ?" যাত্রার দিন জেনে তিনি মাকে যাত্রা বদলে আসতে বলেছিলেন। [দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, 'সাধকভাব', ১২শ সং, ২৩ তম পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৫, পৃঃ ২৩৫; শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৮৯-৯০; শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, ৯ম মুদ্রণ, পৃঃ ৮০১-৮০২]—সম্পাদক

ভাবে তোমরা থাক, তার ভাবে সে থাকুক।"

আহা, এমন কথা স্ত্রী হয়ে বলা! ঠাকুরের সঙ্গিনী ছাড়া আর কে বলতে পারে?...

ডাক্তারের বাড়ির কাছে একটি আশ্রম ছিল, ঠাকুরের নামে। সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। মা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। মা জানেন কিনা—উনি বীরভক্ত। তাঁকে [তাই] পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। ডাক্তারের মা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসেন, কখনো স্ত্রীও সঙ্গে আসেন। আশ্রমটি খাড়া হয়ে গেল। ঐ ভক্তটি ডাক্তারি আরম্ভ করে দিলেন। আট টাকা ফি তাঁর! গরিব হলে অমনি। ধনী হলে বলেনঃ "এত টাকা না দিলে যাব না।" সাত-আটটি ছেলে ওখানে থেকে পড়াশুনা করছে। বেলুড় মঠের সাধুরাও চার-পাঁচজন থাকেন। মাসে খরচা তিনশ টাকা।... সন্ন্যাসী হয়ে টাকা রোজগার করা আশ্রমের জন্য।[৩] অনেক কাজ করেছেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যুদ্ধ করতে, আবার উদ্ধবকে বললেন, বদরিকাশ্রমে যেতে। (ঐ, পৃঃ ২৯১-২৯৩)

মা চারটে কথা বলেছিলেন। প্রথম—"পূর্ণকাম যারা তাদের ভক্তি অহৈতুকী। তাদেরই বলে ঈশ্বরকোটি।" দ্বিতীয়—"যার আছে সে মাপো, যার নাই সে জপো।" অর্থাৎ যার দান করবার শক্তি আছে সে দান করবে। 'মাপো' মানে দাও, দান করো। দান করা মানে পূজা করা, সেবা করা—ভগবদ্‌বুদ্ধিতে। সে-শক্তি না থাকলে জপ করো বসে বসে। তৃতীয়—"জিনিস এতো যে উপচে পড়ছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় কই।" এর মানে ঈশ্বরীয় কথা এত শুনছে, তবুও কিচ্ছু হচ্ছে না। কেন? প্রকৃতি যে টানছে!... চতুর্থ—বাহ্য চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এরূপ অজ্ঞানাবস্থায়

---

৩ সন্ন্যাসীর নাম স্বামী মহেশ্বরানন্দ। 'ডাক্তার মহারাজ' বা 'বৈকুণ্ঠ ডাক্তার' নামে সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে কিংবদন্তী খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ১৯১৩ সালে মা তাঁকে দীক্ষা দেন। সেই বছরই পূজোর সময় মা তাঁকে গেরুয়া দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে ১৯১৮ সালে। বাঁকুড়া ছিল তাঁর পূর্বাশ্রম। সেখানকার আশ্রমটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। পরবর্তী কালে বাঁকুড়া জেলায় রামহরিপুর আশ্রমটিরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা।—সম্পাদক

মৃত্যু হলে তার কী ফল হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেনঃ "মৃত্যুর সময় অজ্ঞান হলে দোষ নেই। যদি অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে থাকে তাহলেই হলো। উত্তম ফল হবে।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২১-২২)

সাধুর আশ্রমে গিয়ে সেবা করতে হয়। তাঁরা দৌড়াদৌড়ি করছেন, আর তখন একজন গিয়ে ধ্যানজপ করবে, তা হয় না। একবার মাঠাকরুনের কাছে কয়েকজন স্ত্রীভক্ত গিছলেন। সকলে বসে ধ্যান করছেন চোখ বুঁজে। মা তখন গোবর দিয়ে লেপ দিচ্ছিলেন একটা জায়গা। একটি ভক্ত উঠে গিয়ে মায়ের সঙ্গে লেপ দিচ্ছেন। মা বললেনঃ "তুমি এলে, এরা সব ধ্যান করছে।" স্ত্রীভক্ত বললেনঃ "ছি! অমন ধ্যানের মুখে আগুন। তুমি গোবর দিয়ে নিকোচ্ছ, আর আমি বসে বসে ধ্যান করব? আমি তা পারব না।" ঐ ভক্তটি ঠিক বুঝেছেন—কোনটি করতে হয়, কোনটি নয়। (ঐ, পৃঃ ১০০)[৪]

(শ্রীশ্রীমা) প্রথম ছিলেন রাজু গোমস্তার বাড়ি। দ্বিতীয়বারে মড়াপোড়ার ঘাটে। তৃতীয়বারে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতে। এ তিনটে স্থানই বেলুড়ে। চতুর্থ, বাগবাজারে একটা বড় গুদামবাড়ির ওপরের ঘরে, মন্দিরের কাছে। নিচে গুদাম—পাটের গাঁটে পূর্ণ। এরই ভিতর দিয়ে ওপরে যাওয়ার রাস্তা ছিল। পঞ্চম, গিরিশবাবুর বাড়ির সামনে। আর ষষ্ঠ, নিবেদিতা যেখানে থাকতেন তার কাছে। তারপর 'মায়ের বাড়ী' (উদ্বোধন) হলো।[৫] (ঐ, পৃঃ ২৬২)

[কলকাতায়] মা থাকতেন ভাড়াটে বাড়িতে। 'নড়েভোলা' যত ভক্ত—টাকা নেই ভক্তদের। ঠাকুরের দেহ যাওয়ার পর মা চলে গেলেন

---

৪ স্ত্রীভক্তটি শ্রীম-র সহধর্মিণী—নিকুঞ্জ দেবী।—**সম্পাদক**

৫ শ্রীম-র স্মৃতিচারণে একটু অসঙ্গতি রয়েছে। শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ সালের মে-জুন মাস নাগাদ নীলাম্বরবাবুর বেলুড়ের বাড়িতে মাস ছয়েকের জন্য অবস্থান করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বেলুড়ে রাজু গোমস্তার গৃহে (সম্ভবত ১৮৯০-এর প্রারম্ভে), ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে 'মড়াপোড়ার ঘাট'-এ (মে-জুন ১৮৯০), পরে আবার নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে (জুন-জুলাই ১৮৯৩) শ্রীশ্রীমা অবস্থান করেন।

বৃন্দাবনে। একবছর ছিলেন বৃন্দাবনে। ফিরে এসে বলরামবাবুর বাড়ি উঠলেন, দেশে যাবেন। কয়দিন পর রওনা হলেন হেঁটেই। এমন পয়সা নেই যে, গাড়ি কি পালকি করে যেতে পারেন। বর্ধমানে একজায়গায় গিয়ে ক্লান্ত হওয়ায় পুকুরের ধারে বসলেন। একজন ভক্ত পাখা দিয়ে হওয়া করছে। তারপর ফিরতি গোরুর গাড়িতে পাঁচ সিকে কি দেড় টাকা দিয়ে যাওয়া হলো।[৬] (ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৮৪; ঐ, ৫ম ভাগ, ১৩৭৫, পৃঃ ১৭৫-১৭৬)

মাঠাকরুনের সমাধি ভক্তেরা কেউ কেউ দেখেছেন, যাঁরা খুব fortunate (সৌভাগ্যবান)। স্থির, চক্ষুর নিমেষ নাই। খুব লজ্জা ছিল কিনা। তাই যাঁরা কাছে থাকতেন, তাঁরা ডাকতেন ভক্তদের—যাদের তিনি ভালবাসতেন। আহা, কি দুর্লভ সে দৃশ্য! (ঐ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩২৯)

।।৩।।

মায়ের কাছে একটি ভক্ত আসত দেশে। মুসলমান—আমজাদ তার নাম। মায়ের কাজ করত, ঘর মেরামত এসব। মা মেটে ঘরে থাকতেন কিনা। আমজাদ ওসব কাজ জানত। মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত। অন্য

বাগবাজারে যে তিনটি স্থানের কথা শ্রীম উল্লেখ করেছেন, তার প্রথমটি সরকারবাড়ি লেনে গুদামবাড়ি (১৮৯৬-এর মে মাসের শেষার্ধ), দ্বিতীয়টি ১০/২ বোসপাড়া লেন (মার্চ ১৮৯৮) এবং তৃতীয়টি ১৬এ বোসপাড়া লেন (অক্টোবর ১৯০০)। এছাড়াও মা ১৯০৪ জানুয়ারি থেকে একবছর ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের 'নীলমণি শান্তিধাম'-এ অবস্থান করেন। ভাড়া বাড়িতে থাকা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বলরাম বসুর বাড়িতে, শ্রীম-র বাড়িতে এবং বাগবাজারে আরো কয়েকটি বাড়িতে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করেছিলেন।—সম্পাদক

৬ ঘটনাটি ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতা হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা প্রমুখ সহ কামারপুকুর ফেরার সময়কার। সেবার পাথেয়র অভাবে মা বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যান। বর্ধমান থেকে উচালন পর্যন্ত আট ক্রোশ রাস্তা হেঁটে যান। এই পরিশ্রমে মা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সম্ভবত উচালন থেকে কামারপুকুর পর্যন্ত শ্রীম-র বিবরণ মতো গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, শ্রীম বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনান্তে অল্পকাল আগে ৩১ আগস্ট কলকাতা ফিরেছিলেন।—সম্পাদক

মুসলমান হিন্দুর বাড়িতে খায় না। কিন্তু আমজাদ মায়ের বাড়িতে ঠাকুরের প্রসাদ খেত। ভক্তরা যে থালা-গ্লাসে আহার করে আমজাদকেও মা তাতেই খেতে দিতেন। খাওয়া হয়ে গেলে বলতেনঃ "উঠে পড় বাবা, উঠে পড়।" সে হাতমুখ ধুতে উঠে গেল। আর মা অমনি তার এঁটো থালা গ্লাস নিয়ে নিজে মেজে ধুয়ে আনলেন। আবার ঐ কাপড়েই ঠাকুরঘরে যাচ্ছেন—স্নানটান কিছু নেই। কী আচরণ মায়ের! কার আছে এ-দৃষ্টি? আমজাদ প্রথম জীবনে ডাকাত ছিল। তাই সকলে ঘৃণা করত তাকে। কিন্তু মা দেখেছিলেন, ভেতরে 'মাল' আছে। মা বলতেনঃ "আমার কত ছেলে কত স্থানে রয়েছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান। সকলকেই আমায় দেখতে হবে। খাওয়াতে হবে, আদর করতে হবে—ছেলে যে!" আহা, কী উদার দৃষ্টি! পাড়াগেঁয়ে লোক। আবার গোঁড়া বামুনের মেয়ে। লেখাপড়া নেই। কিন্তু কী বিশাল হৃদয়, কী জগৎ-জোড়া দৃষ্টি! মানুষে এসব হয় না, ভগবান ছাড়া। জগদম্বা, তাই সকলের মা।

আমজাদের দেহ গেছে।[৭] একটুকু বাকি ছিল। মাকে দর্শন করে মুক্ত হয়ে গেল। (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৮৬-২৮৭)

ঠাকুরকে [লোকে] কত কথা বলত। একবার মাঠাকরুনকে প্রণাম করে একজন কয়েকটা টাকা দেয়। Authorities (কালীবাড়ির কর্তৃপক্ষ) ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বললেঃ "ছোট ভটচায্যি মশায় পরিবার এনে রেখেছেন টাকা রোজগার করবেন বলে।" ঠাকুর এই কথা বলে মা-র [মা কালীর] কাছে কাঁদতেনঃ "মা, ওরা একথা বলে।" (ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৩৭৬, পৃঃ ৭৪)

মাঠাকরুন একজন সাধুকে বলেছিলেনঃ "শেষসময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন—ঘরের ছেলে ঘরে যাবে। কিন্তু যদি জীবিত অবস্থায় শান্তি চাও তবে সর্বদা তপস্যা কর, তাঁর চিন্তা কর।" কারণ, তপস্যা করলে তাঁর কৃপা হয়। তাঁর কৃপা অবশ্য কোন condition-এর (নিয়মের) অধীন নয়। (ঐ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ১৩৬)

---

৭ শ্রীম-র এদিনের আলোচনার তারিখ ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩।—**সম্পাদক**

(১৮ জানুয়ারি ১৯২৫ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর পরিদর্শনকালে)

বড় খাটেই ঠাকুর মাঠাকরুনের সঙ্গে দীর্ঘ আট মাস শয়ন করে এক সুকঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ'—অবতারাদির দৈব চরিত্রের এইটি একটি নিদর্শন ও পরীক্ষা। ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্য এই পরীক্ষায়ও অনায়াসে উত্তীর্ণ। তবেই তো ঠাকুর "আমি তোমার কে?"—মায়ের এই প্রশ্নের সগর্বে উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছেন: "যে মা মন্দিরে, যে মা-র গর্ভ থেকে এই শরীর এসেছে, সেই মা-ই এখন আমার পায়ে হাত বুলোচ্ছে।"... শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহলীলা, স্ত্রীর সঙ্গে শয়নলীলা—এসবই লোকসমাজের ঊর্ধ্বগতি লাভের জন্য। সমাজের দৃষ্টি দেহ ছাড়িয়ে ঈশ্বরে সংযুক্ত করার জন্য। (ঐ, ১২শ ভাগ, ১৩৭৯, পৃঃ ১৭৭, ১৭৯)

[স্বামী অরূপানন্দ 'মায়ের কথা'-র পাণ্ডুলিপি শ্রীমকে পড়ে শোনালে শ্রীম-র আদেশে উপস্থিত ভক্তগণ 'মায়ের কথা'-র অনুকীর্তন করছেন। শ্রীম নিজে মায়ের কয়েকটি উপদেশ আবৃত্তি করলেন। এই অনুকীর্তন প্রথা স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি প্রয়োগ করতেন। এই অনুকীর্তন প্রথা শ্রীম-র আদর্শ শিক্ষকতার অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি এটি স্বীয় গুরুদেব পরমহংসদেবের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। পরমহংসদেব প্রায় নিজের উপদেশগুলি 'মাস্টারের' দ্বারা অনুকীর্তন করাতেন।]

মা বলছেন—promise (প্রতিজ্ঞা) করছেন—(১) ঠাকুরের শরণাপন্ন যারা, অন্তত মৃত্যুর সময় হলেও ঠাকুরকে তাদের কাছে দেখা দিতেই হবে। মা আরো বললেন, (২) দেহধারণ করলে দুঃখকষ্ট আছেই। বিধাতারও ক্ষমতা নেই এ রোধ করবার। তবে শান্তি চাইলে সাধন-ভজন করো। (৩) মৃত্যু কখন আসে তার যখন নিশ্চয় নেই, তখন কালাকাল বিচার করে বসে না থেকে তীর্থ করা ভাল যত শীঘ্র হয়। (৪) "কর্ম ফুরোচ্ছে না কেন?"—এ-প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন: "লাটাইয়ে অনেক সুতো আছে। সেইসব বের হলে তবে তো খালি হবে।" (৫) ঠাকুর একদিনের জন্যও তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) কষ্ট দেননি।

[শ্রীম শ্রীশ্রীমার এই 'পঞ্চরত্ন' উপহার দিয়ে ভক্তদের আহ্বান করলেন—"আপনারা বলুন যার যা মনে আছে 'মায়ের কথা'।" একের পর এক ভক্তগণ বলতে লাগলেন।] কত উপকার হয় পরস্পর তাঁর কথা বললে! (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৩৬-১৩৯)

[আর একদিন শ্রীম-র আদেশে 'মায়ের কথা'-র স্মৃতিকীর্তনে মায়ের অন্যান্য কথার সঙ্গে এল এই কথাটিঃ "যে মন্ত্র পেয়েছে, যে ঠাকুরের শরণাপন্ন তাকে ব্রহ্মশাপেও কিছু করতে পারে না। শেষ সময় ঠাকুরকে দেখা দিতেই হবে যে তাঁর শরণাগত।"]

আহা, কি promise (শপথ)! ঠাকুরও বলছেনঃ "মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।" এত করে বলেছেন, তবুও কি বিশ্বাস হয় লোকের? ভক্তদের জন্য কত স্নেহ মায়ের! একটি ভক্ত জয়রামবাটী থেকে চলে আসছে দীক্ষা লয়ে। মা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তাকে বিদায় দিতে, আর যতদূর দৃষ্টি যায় তার পথের পানে চেয়ে রইলেন। দু-একদিনের পরিচয়, কিন্তু গর্ভধারিণী মায়ের অধিক। লৌকিক বুদ্ধিই বা কী প্রখর! একবার বলছেন, জপতপ কিছুই করতে হবে না। আবার বলছেন, জীবনে শান্তি চাইলে করতে হবে। কী সুন্দরভাবে two extremes meet (দুটি বিরুদ্ধভাবের সমন্বয়) করলেন! (ঐ, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

॥৪॥

মাঠাকরুনের জীবন কিরূপ ছিল? কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে ঠাকুর, যখন কামারপুকুরে ছিলেন? কামারপুকুরে নিয়ে গিয়ে যেন গৃহস্থ আশ্রমের অভিনয় করলেন। লোকে মনে করতে লাগল, গদাই এবার সংসারী হলো। কিন্তু তিনি মায়ের সঙ্গে সদাসর্বদা ঈশ্বরীয় কথা কইতেন। কি করে মা ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করতে পারেন সর্বদা সেই উপদেশ, সেই শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরদর্শন মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিভাবে জীবনযাপন করলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কি করে ঈশ্বরভক্ত সংসারে

সকলের সঙ্গে বাস করেও মনে সর্বদা ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ভক্তি জাগরূক রাখতে পারে—এইসব আলোচনা দিনরাত্রি করতেন। আবার লৌকিক শিক্ষাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ ভক্ত হবে সর্ববিষয়ে সুদক্ষ। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন—স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে চলার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মা-র জীবন থেকে এদুটি শিক্ষা আমরা পাই—ব্রহ্মচর্য আর ঈশ্বরে তন্ময়তা। সংযম আর সেবা। ভগবান বৈ তিনি কিছুই জানতেন না। সর্বজীবে ভগবানদর্শন করে 'তাঁর' সেবা করতেন দিনরাত। মা যা বলে গেছেন—সবই তো মন্ত্র। বড় বড় ইংরেজী জানা বিদুষী মেয়েরা—নিবেদিতা প্রভৃতি জোড়হাত করে বসে থাকতেন তাঁর পায়ের নিচে। এর অর্থ এই—মডার্ন ভাব, মডার্ন শিক্ষা তাঁর কাছে মাথা নিচু করে আছে। (ঐ, ৭ম ভাগ, পৃঃ ৪-৫)

মাঠাকরুন তখন বৃন্দাবনে আছেন। মঠ তখন বরানগরে। সেখানে একদিন স্বামীজীর সঙ্গে কথা হচ্ছে। স্বামীজী বললেন, মাঠাকরুনের কথা। কাশীপুরের বাগানে একদিন ভক্তরা ঠাকুরের কাছে তাঁদের প্রতি শ্রীশ্রীমার স্নেহের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মা তখন ঠাকুরের সেবার্থ ঐ বাগানে ছিলেন। ভক্তেরা ঠাকুরকে বলেছিলেন, এমন মহৎ হৃদয় তাঁরা কখনো দেখেননি। আমি তখন স্বামীজীকে বললামঃ "তাতে ঠাকুর কি বললেন?" স্বামীজী বললেনঃ "তিনি হাসতে লাগলেন, আর বললেন—'আমার শক্তি কিনা, তাই এমন!' " (দ্রঃ উদ্বোধন, ১০২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৭, পৃঃ ৬৯২) • ❑

• স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থটি থেকে শ্রীমা সম্পর্কে শ্রীম-র উক্তিগুলি প্রকাশকের (জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩) অনুমোদনক্রমে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রকাশকের কাছে সেজন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। শ্রীম-র উক্তিগুলি সঙ্কলন করেছেন ডঃ জলধিকুমার সরকার। গ্রন্থনা ও সম্পাদনা আমাদের।—সম্পাদক

মাতৃস্মৃতিসুধা

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস (যোগীন-মা)

মা সেসময় দক্ষিণেশ্বরে নবতে সীতে ঠাকরুণের মতো থাকতেন। পরণে কস্তা পেড়ে চওড়া লাল শাড়ি। সিঁথেয় সিঁদুর। কালো ভরাট মাথায় চুল প্রায় পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠিহার। নাকে মস্ত বড় নথ। কানে মাকড়ী। হাতে চুড়ি (যে চুড়ি মথুরবাবু ঠাকুরের মধুরভাব সাধনের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন)। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর কাছে থেকে বড় আনন্দ হতো। আমার চুল বাঁধা তাঁর বড় পছন্দ ছিল। গেলেই বাঁধিয়ে নিতেন। আমিও তাতে ভারি খুশি হতুম। আমায় একদিন বললেনঃ "দেখ যোগীন, উনি এত লোকের এতশত (সমাধি, ভাব ইত্যাদি) করিয়ে দেন, আমার তো কিছু হলোনি। তুমি একবার গিয়ে বলো।" আমি হতভাগী কিছু বুঝিনি। গিয়ে তাঁকে বললুম। তিনি কোন কথার জবাব দিলেন না। নবতে ফিরে এসে দেখি, মা পুজো করতে করতে কেবল হাসছেন, কখনো বা কাঁদছেন। বাহ্যজ্ঞান নেই। বুঝলুম কি ব্যাপার!

একজনের কথার পিঠে (ঠাকুর) মা-র সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ "আমার কি খেটেশাকখাকী (পাটশাক গোঁছের) পরিবার? সরস্বতীর অংশ মহাবুদ্ধিমতী। সাজতে গুজতে তাই বড় ভালবাসে। ও কি যে সে—আমার শক্তি!!" লাটু মহারাজকে বলেছিলেনঃ "দেখ, যে যা জিনিসপাতি আনে সব ওকে দেখাবি, জানাবি। নইলে তাদের উদ্ধার কেমন করে হবে?"

১৮৮৫ জ্যৈষ্ঠ, শেষ পেনেটির উৎসব। যারা ঠাকুরের সঙ্গে যাবে তাদের (১০/১২ জন) জন্য রাঁধতে ঠাকুর যোগীন-মাকে বললেন। গোলাপ-মা রাঁধলেন। ভক্তেরা অনেক দেরিতে এল। তিনি খেতে

বসেছেন, এমন সময় দশ-বারোজনের বেশি এল। কাজেই সব ফুরিয়ে গেল। যোগীন-মা প্রভৃতিদের খাবার রইল না। শ্রীশ্রীমা এঁদের জন্য ভাত ও এক-আধটা পাকা বেগুন, কাঁচকলা ও কচু-ফচু দিয়ে একটা তরকারি রেঁধে দিলেন। রান্না যেন এখনো মুখে লেগে রয়েছে—এমন মিষ্টি হয়েছিল। * ❑

* দ্রঃ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৭-১৮, ২৭।

মায়ের স্মৃতি

গোলাপসুন্দরী দেবী (গোলাপ-মা)

একদিন গোপালদাদা আট আনার বাজার করে গেরো দিয়ে আনলেন। গেরো বড় শক্ত। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললামঃ "ভক্তের গেরো এত শক্ত—আমি খুলতে পারলুম না।" ঠাকুর বাজার দেখে বেজার হয়ে এসে শ্রীমাকে বললেনঃ "এতো বাজার?" শ্রীমা বললেনঃ 'সবাই খাবে বলে।" ঠাকুরঃ "এখানে (কালীবাড়িতে) একটা বন্দোবস্ত রয়েছে, তবুও এ্যা—তো খরচ করা কেন? আর দুবেলা আগুন তাতে অত রেঁধে তোমার অসুখ করবে। তোমার অত রাঁধতে হবেনি। আমি আর ওসব খাবনি।" সেসব তরকারি কিছু খেলেন না। কালীবাড়িতে দেওয়া হলো। শ্রীমার দুঃখ হলো, কাঁদলেন। ঠাকুর আবার তাঁকে বুঝিয়ে বলেনঃ "তোমার কষ্ট হবে বলেই বলেছি, দু-বেলা আগুন তাতে অত রান্না! আর মনে করেছি, এখন থেকে আর এটা-ওটা রাঁধ—আর বলবনি। আকাশবৃত্তি করে থাকব—যা হলো তাই খেলুম। তবে তোমার যেদিন যেমন রাঁধতে ইচ্ছা হয়, তা রেঁধো। আমায় জিজ্ঞাসা করোনি।"

শ্রীমার গহনা পরা সম্বন্ধে কথা উঠলে ঠাকুর বলেনঃ "সে কি? ও তো সাজেনি, আমিই তো ওকে ওসব গড়িয়ে দিয়েছি। ও হচ্ছে সারদা, সরস্বতী, সাজতে ভালবাসে, তাই দিয়েছি।" * ❑

* দ্রঃ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২৮-২৯। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (উদ্বোধন অখণ্ড সং, ২০০১, পৃঃ ৫৪, পাদটীকা) রয়েছেঃ "ঠাকুর গোলাপ-মাকে বলেছিলেন, 'ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।' " আবার ভাগনে হৃদয়কেও ঠাকুর বলেছিলেনঃ "ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৪শ সং, ১৯৯৫, পৃঃ ৯২)—সম্পাদক

মাতৃসান্নিধ্যে

লক্ষ্মীমণি দেবী

দক্ষিণেশ্বরে আমরা তখন নবতে থাকতাম। ঠাকুরের শোবার বসবার ঘরখানিতে লোকজন থাকলে তিনি ইসারায় নাকের কাছে একটি গোল চিহ্ন দেখিয়ে মাকে বোঝাতেন। মা-র নাকে নথ ছিল। আবার নবতকে বলতেন খাঁচা। আমাদের দুজনাকে, শুক-সারি। এধারে মা-র নামও সারদা। মা কালীর প্রসাদ—ফলমূল মিষ্টি তাঁর ঘরে নামলে, রামলালদাকে বলতেন (নিজের নাকের কাছে ঐরূপ চিহ্ন দেখিয়ে): "ওরে, খাঁচায় শুক-সারি আছে। ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।" বাইরের লোকে বুঝত, বুঝি সত্যি সত্যি পাখি আছে। মাস্টার মশায়েরও প্রথম প্রথম ঐ ধারণা ছিল।

নানান জায়গার মেয়েরা সব এসে মাকে মত কি বলত। ঠাকুরের কানে মাঝে মাঝে সে সব কথাও যেত। তিনি মাকে বলতেন: "দেখ। ওরা সব এসে হাঁসপুকুরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়... আর আমায় দেখে শুনে গিয়ে সব আপনাদের ভিতর কত কি কথাবার্তা কয়। আমি সব টের পাই। বলে, 'এঁর সবই ভাল। তবে ঐ যে রাত্তিরে স্ত্রীর সঙ্গে একত্তরে থাকেন না—এই যা।' ওদের কথাবার্তা, পরামর্শ তুমি শুনো নি বাপু। ওরা সব বলবে, আমার মন ফেরাতে ওষুধ-পালা কর। দেখো বাপু, তাদের কথায় আমায় ওষুধ-পালা কোরো নি। আমার সব আছে। তবে ভগবানের জন্যে সব শক্তি তাঁতে দিয়ে রেখেছি।" মা আলতো আলতো ভাষায় জবাব দিতেন: "না, না, সে কি কথা!"

নবতে তখন ঐটুকু ঘরে কি করে যে কুলিয়ে যেত, তাই এখন ভাবি। ঠাকুরেরই খেলা! মা, আমি, আর একটি মেয়ে।[১] আবার কলকাতা থেকে কখনো কখনো স্ত্রী-ভক্তেরা গিয়ে থাকতেন।

কামারহাটির গোপালের মা মাঝে মাঝে থাকতেন। তাঁর মস্ত মোটা শরীর ছিল। ঐ তো একটুখানি ঘর। কিন্তু তার মধ্যেই কত কাণ্ড। এক বৃহৎ সংসার। আমাদের সব জিনিসপত্তর। রাঁধবার সাজ সরঞ্জাম—তেল, নুন, লঙ্কা, তেজপাতা, ফোড়ন, মসলা, চালুনি, কুরুণি, বাসন-কোসন, হাঁড়ি-কুঁড়ি, ভাঁড়ার—সবই থাকত। আবার খাবার জলের জালা। আর ঠাকুরের পেট খারাপ। তাঁর জন্যে অনেক রকম পথ্যের জোগাড় থাকত। কই, সিঙ্গি, মাগুর—জাওয়ালো মাছ—যখন যেমন পাওয়া যেত।...

আমি যখন বিয়ের পর বাপের বাড়িতে বিধবাবেশে ফিরে আসি, তখন তিনি আমায় একদিন বলেছিলেনঃ "ধর্ম-কর্ম যা, সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবি না। কার পাল্লায় পড়বি, কে জানে? ঐ খুড়িমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।" আমি তখন পরমা রূপবতী যুবতী। মেয়েরা নির্লজ্জা, বেহায়া হবে, তা তিনি সহ্য করতে মোটেই পারতেন না।...

তিনি বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকতে মোটেই চাইতেন না। বলতেনঃ "লোকে যে ঐ বলবে, রানী রাসমণির কালীবাড়িতে একটা 'বুড়ো' সাধু থাকে, সে কথা আমি সইতে পারবনি বাপু।" মা বললেনঃ "ও কথা কি বলতে আছে? তোমার কি এর মধ্যেই যাবার সময় হয়েছে? আর বুড়ো হয়ে এখানে থাকলেও লোকে বলবে, রাসমণির কালীবাড়িতে কেমন একজন 'পিরবীণ' সাধু থাকেন!"

তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ! লোকে তোমার পিরবীণ মিরবীণ অত শত বলতে যাচ্ছে আর কি? চণ্ডীদাসের গল্প জান তো? চণ্ডীদাস অনেকদিন বেঁচেছিলেন। বুড়ো হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় চণ্ডী বড় বোকা মুখ্যু ছিল। লেখাপড়া কিছু করত না। বাপ একদিন রেগে তাঁর মাকে বললেন, বড়ই বিরক্ত হয়ে—'চণ্ডেটাকে আর ভাত খেতে দিও না। কিছু করো না, চাট্টি চাট্টি ছাই দেবে।' একদিন চণ্ডী খেতে বসেছে। পাতের একধারে দুটিখানি ছাই। চণ্ডী খেয়েদেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ

মা, এ কি?' মা বললেন, 'তোমার বাবা তোমাকে ছাই খেতে দিতে বলেছেন। তুমি কিছু পড়টড় না। তা আমি মা হয়ে শুধু তাই তোমাকে কেমন করে দিই?' এই বলে মা ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

"তারপর একদিন চণ্ডী অভিমানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মনের দুঃখে মা বাসুলীকে ডাকতে লাগল। মা দেখা দিলেন। বললেন, 'তোমার মূর্খতা ঘুচে যাবে। তোমার সুমিষ্ট গান শুনে সকলে চমৎকৃত হবে।' ক্রমে ক্রমে সত্যি সত্যি চণ্ডীর ভিতর সঙ্গীতে অধিকার এল। দেবদুর্লভ কণ্ঠ। মেয়েরা যে পুকুরে চান করতে যেত, চণ্ডী আপনার মনে বসে সেখানে গান গাইত। খুব মিষ্টি। দোষদর্শী লোক বললে, চণ্ডীর চরিত্রে দোষ এসেছে। কালে সেই দেশের রাজা-জমিদারও চণ্ডীর গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তাকে খুব সমাদর করে রাজবাটীতে নিয়ে গেলেন। চণ্ডীর আর কোন দুঃখ-কষ্ট রইল না। খাবার-দাবার কোন ভাবনা নেই। চণ্ডীর খুব নাম-যশ হলো। অপবাদ ঘুচে গেল। অনেক দিন বাঁচলেন। যখন বুড়ো হয়ে রয়েছেন, পাড়ার যুবতী মেয়েরা সব তাঁর কাছে আসত। এধারে তাঁর মধুর ভাব। তারা কিন্তু এসে বুড়োকে সহজেই 'বাপ' বলত। তাতে কিন্তু বুড়ো চণ্ডীদাসের বড় দুঃখই হতো। মনঃপূত হতো না। তিনি অতি খেদে বলতেন—

"বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে,
এ বড় বিষম তাপ
যুবতী আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে,
আমারে কহিবে বাপ!

"—তা আমিও 'বুড়ো' নাম সহ্য করতে পারবনি বাপু।"

গল্প শুনে সকলেই হেসে কুটিকুটি।...

[দক্ষিণেশ্বরে] ঠাকুর মাঝে মাঝে ঠাকুমাকে [শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি দেবী] বলতেনঃ "তুমি মা, সেই দেশের মতন করে, বেশ ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি কর না। খেতে বড় মন যায়।" ঠাকুমাও সেইমতো রেঁধে দিতেন। ঠাকুর খেয়ে খুব খুশি। ঠাকুমা

অন্তর্ধান হলে ঠাকুরের খাবার রোজ মা নিয়ে গিয়ে ঘরে দিয়ে আসতেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে রহস্য করে বলতেনঃ "ভাগ্যি গাছতলাটি ছিল, নইলে এমন করে কে খেতে দিত? রেঁধে দিত? নইলে পরণে কাপড় থাকে না, তার আবার বিয়ে!"

ঠাকুর বলতেনঃ "মেয়েছেলে কি নিয়ে থাকবে? রান্নাবাড়া ভাল। মন ভাল থাকে। সীতা রাঁধতেন। স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধে সকলকে খাওয়াতেন। দ্রৌপদী রাঁধতেন। পার্বতী রাঁধতেন।" * ❑

---

১ এই 'মেয়ে'টিই পরবর্তী কালের 'বসুমতী মা' নামে সুপ্রসিদ্ধ ভবতারিণী দেবী—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও সত্ত্বাধিকারী, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহী পার্ষদ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। বর্তমান খণ্ডে পরবর্তী স্মৃতিকথাটিই ভবতারিণী দেবীর।—**সম্পাদক**

* দ্রঃ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩-১০। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লক্ষ্মীমণি দেবীর স্মৃতিকথা প্রথমেই রয়েছে। যে-অংশ সেখানে নেই, এখানে শুধু সেই অংশগুলিই সঙ্কলন করে দেওয়া হয়েছে।—**সম্পাদক**

দক্ষিণেশ্বরে মাকে যেমন দেখেছি

ভবতারিণী দেবী

ভবতারিণী দেবী (১৮৭৭-১৯৭৩) সুবিখ্যাত 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৮-১৯১৯) সহধর্মিণী। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী শিষ্য। প্রথম বয়সে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে তিনি পরবর্তী কালে প্রভূত ধনশালী হন। কিন্তু তাঁর অতুল ধনসম্পদ ও 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' ছিল "রামকৃষ্ণের সদাব্রত"-এ নিবেদিত, তিনি ছিলেন সেই "সদাব্রতের ভাণ্ডারী"। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ত্যাগী পার্ষদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের সম্পর্ক। তাঁর সহধর্মিণী ভবতারিণী দেবী রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের 'কন্যা' রূপে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তাঁর তপস্বিনীর জীবন সকল মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে তিনি 'বসুমতী-মা' রূপে সুপরিচিতা ছিলেন। স্বামী জীবিত থাকতেই তিনি প্রায়ই তীর্থভ্রমণে চলে যেতেন। ঐভাবেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে তীর্থবাসের সময় স্বামীজী তাঁর কাছে এসেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি একমাত্র পৌত্র রামচন্দ্র-এর অকালপ্রয়াণ এবং দুমাস পর ২৬ এপ্রিল পুত্র সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে ভবতারিণী দেবী ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন এবং সবার অলক্ষ্যে একদিন একবস্ত্রে কলকাতার বাড়ি থেকে চলে যান। দিনকয়েক হরিদ্বারে কুপড়িতে শ্মশানের পাশে ছিলেন। মঠ-মিশনের সাধুদের সহায়তায় পুত্রবধূ ও পৌত্রীদের মিনতিতে সেখান থেকে বারাণসীর ওরঙ্গাবাদে নিজেদের বাড়িতে আসেন। তখন থেকে বারাণসীর বাড়ি 'রামবাস'-এই তিনি ('রামবাস' বাড়িটি ২৩ বছর বয়সে অকালপ্রয়াত তাঁর পৌত্র রাম বা রামচন্দ্রের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত) থাকতেন, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে যেতেন। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কেদার-বদ্রী দর্শন একাধিকবার করেছেন। এমনকি কৈলাস-মানস দর্শনেও গিয়েছেন। বারাণসীতে নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানেই তাঁর দিন কাটত। শেষের দিকে শরীর অপটু ও অসুস্থ হওয়ায় বাড়ি থেকে আর বেরোতে পারতেন না, কিন্তু একাদশীতে নির্জলা উপবাস ও নিরন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান ছিল তাঁর আজীবনের সঙ্গী। বারাণসীর অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুরাই ছিলেন তাঁর অভিভাবক। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের হাসপাতালে ৫ মার্চ ১৯৭৩ সালে ৯৬ বছর

বয়সে তিনি লোকান্তরিতা হন। তিনি বলতেন, আত্মীয়তাসূত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পক প্রসঙ্গে তিনি বলতেনঃ "ঠাকুরের বাবা আর আমার বাবা—এঁরা হলেন খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। আমার মা শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরকে ডাকত 'বড়ছেলে' বলে।" [দ্রঃ তাপসী বসুমতী-মা—প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ২য় মুদ্রণ, ১৩৮৫, পৃঃ ২৭; ভবতারিণী দেবীর বাবা (নাম জানা যায়নি) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামহ মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের দাদার পুত্র।] শ্রীমায়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে ভবতারিণী দেবী বলেছেনঃ "শ্যামাসুন্দরী আর এলোকেশী [দীনময়ী?] দু-বোন। শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে শ্রীশ্রীমা, আর এলোকেশীর মেয়ে আমি।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭) সুতরাং সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভবতারিণী দেবীর জ্ঞাতি দাদা, আর শ্রীমা ছিলেন তাঁর আপন মাসতুতো দিদি। তাঁর মা ছিলেন সম্পর্কে শ্রীমায়ের আপন মাসি। তিনি ছোটবেলায় শ্রীমাকে 'সারু-দিদি' ও 'গাঁদাফুল-দিদি' বলতেন, পরবর্তী কালে অবশ্য 'মা' বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথমজীবনে 'দাদা' বললেও পরে 'দাদা' বলতেন না, 'ঠাকুর' বলতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরই ছিলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর আরাধ্য দেবতা, তাঁর জীবনসর্বস্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা তাঁর বিবাহের পাত্র নির্বাচন করেছিলেন, বিবাহও দিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁর 'ভবতারিণী' নামও দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং।—**সম্পাদক**

ঝামাপুকুর থেকে ঠাকুর যেদিন আমাকে তুলে নিয়ে এলেন আমি তখন নেহাতই শিশু। কথাও ভাল করে ফোটেনি—হাবা। তাই নাম ছিল 'হাবি'। শিশুদের তো মা প্রাণ—আমি কিন্তু মা বদল হওয়াতে মনে কোন হেরফের বুঝলাম না। বরং যা পেতুম না ঝামাপুকুরের মার কাছে, এখানে মার [শ্রীশ্রীমার] কাছে অনেক বেশি পেলাম। ঠাকুর সোহাগ করে তাঁর মন্দিরের দেবী-মার নামে আমার নামকরণ করেছিলেন—'ভবতারিণী'। মা ছোট করে 'ভবি', কখনো বা 'ভবসুন্দরী' ডাকতেন। ঝামাপুকুরে একটা মা ফেলে এসেছি—মনেই পড়ত না।

**

আমি দক্ষিণেশ্বরে কত কাজ করতুম। না, মা-ই এটা ওটা করতে বলতেন, হাতে হাতে—"যা তো ভবি, ফুলটা তুলে আন, ঠাকুরের বাসনটা হাঁসপুকুর থেকে ধুয়ে আন, কাপড়টা বকুলতলা ঘাট থেকে কেচে

নিয়ে বেড়ায় শুকোতে দে।'' দিতুম। ''যা তো, ঠাকুর কি করছেন দেখে আয়।'' এমন দিনে কতবার পাঠাতেন। আমিও করতুম। মা বড় বসে থাকতে দিতেন না, ফাই-ফরমাস করতেন।

মা কাজের মধ্যে রাখতেন, এর মানে এ নয় যে, আমাকে খাটাতেন। মোটেই না। খুবই হালকা কাজ দিতেন আর কত সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। সকাল আটটা নয়টার মধ্যে মা পুজোয় বসতেন। তার আগে আমার কাজ ছিল ফুল তোলা, চন্দন বাটা, দুব্বো তুলে এনে পুজোর পাত্রে সাজিয়ে রাখা। বেলপাতা, তুলসীপাতা তো ছিলই। বেলপাতা সবগুলি এক মাপের হতে হবে, ছেঁড়াফাটা চলবে না। মার গোছানো ছিল দেখার মতো। যেন সব মিলিয়ে একটি কারুকার্য করা পঞ্চপাত্র। চন্দন বাটা, ফুল এক-একটি করে গুছিয়ে রাখার মধ্যে যে কী অপূর্ব কারুকার্য ছিল, বলে বোঝাতে পারব না। কত দ্রুত কাজ করতেন ভাবা যায় না। ফল কাটা, পান সাজা ছিল তাঁর এক শিল্প। যে দেখত অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। আমি তো তখন কিছু বুঝতুম না। মা আমাকে সব কিছু হাতে ধরে শিখিয়েছেন। ছোট ঘর, নহবতখানা, তার মধ্যে গোটা সংসার। কিন্তু যেন এক অপূর্ব নিটোল পারিপাট্যে ভরা দিব্যধাম। মন্দিরকে হার মানিয়ে দেয়।

মা যখন পুজোয় বসতেন মাকে চেনা যেত না। খুব বেশিক্ষণ বসতেন না, কিন্তু পরিবেশ কেমন পালটে যেত। ধারে কাছে থাকতে গা ছমছম করত। পুজো শেষে ডাকতেন: ''ভবি, কই গেলি? আয়, নে মাথাটা এখানে নোয়া, বল—'ঠাকুর, আমাকে তোমার করে নাও। হাত ধরে থাকো।'—বুঝলি? [পুজোর আসনে ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে] ঐ দেখ ঠাকুরকে ভাল করে।'' দেখতাম আমাদের ঠাকুর। আমি তো প্রথম প্রথম বলতাম: ''উনি তো আমাদের ঠাকুর! উনি আবার দেবতা-ঠাকুর হলেন কবে?'' মা হাসতেন, বলতেন: ''ও তোর এখন বুঝে কাজ নেই। বড় হবি, তখন বুঝবি। এখন যা দেখছিস ঐ দেখ, কেবল আমি যা বলি তাই কর। দুবেলা দুটো প্রণাম করবি, বুঝলি? ভোরে উঠে ওঁর ঘরে গিয়ে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করবি।''

আমি বললামঃ "আমি তো করি গো, তুমি তো শিখিয়েছ। ঠাকুর পা ছুঁতে গেলেই অমনি কোলে তুলে নেন, বলেন, 'ওরে ভবতারিণী, তোর অত না করলেও চলবে। বেশ আছিস—ঘুরঘুর করছিস আশেপাশে, তাই করবি আর যার কাছে [অর্থাৎ মার কাছে] আছিস তাকেই দৃষ্টিতে রাখবি। বুঝলি, তোর আর কিছু চাই না।' " মা খুব খুশি হয়ে মাথায় মুখ রেখে চুমু খান আর হাত ভরে ফল মিষ্টি প্রসাদ দেন।

**

ঠাকুর তো রাতে কতটা ঘুমোতেন তা তিনিই জানেন। অন্যে একটু ঘুমোবে তাও সহ্য করতে পারতেন না। চটি জুতো পায়ে দিয়ে চটচট করে এসে নহবতখানার দরমার বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে বলতেনঃ "ওরে লক্ষ্মী, ওরে ভবতারিণী, ওঠ নারে, কত ঘুমোবি?" বলতেন আমাদের নাম করে, কিন্তু কথাটা মার জন্যে। মা কিন্তু তার আগেই উঠে বসেছেন—গলা খাঁকারি দিয়ে শোনাতেনঃ "উঠেছি গো, তুমি ভেবোনি।"

ঠাকুর চলে যেতেন পঞ্চবটীর দিকে। মা বলতেনঃ "তোদের এখন উঠে কাজ নেই। নে শুয়ে থাক।" আমি পাশ ফিরে শুতাম। কোন কোন দিন ঘুম না এলে দেখতাম, মা ঐ অন্ধকার রাতে একলা বকুলতলা ঘাটে যেতেন আবার কিছুক্ষণ পরে এসে কাপড় শুকোতে দিয়ে পাশেই ঠাকুরের আসন ছিল তাতে ঠাকুর তুলে, মুখ মুছিয়ে বসাতেন। চুপচাপ পটের কাছে বসে কেমন হয়ে যেতেন। মনে হতো অন্য কেউ বসে আছেন। অন্যান্য দু-একজন মেয়ে ভক্ত বা লক্ষ্মী-দিদি থাকলে তাড়াতাড়ি মা উঠে আমায় তুলতেন—"এবার ওঠ, হাঁসপুকুর থেকে মুখ হাত ধুয়ে আয়।" মা তখন একবার ঠাকুরের ঘরে গিয়ে বিছানাপত্র গোছগাছ করে আসতেন। কোন কোন দিন আমায় নিয়ে যেতেন, হাতে হাতে কাজ করাতেন। অনেকদিনই ঠাকুর তখন ভবতারিণী মন্দিরে থাকতেন।

মা প্রতিটি কাজ করতেন খুব দ্রুত কিন্তু নিখুঁত। অগোছালো কাজ পছন্দ করতেন না। আমি প্রথম প্রথম বড্ড অগোছালো ছিলাম। হাত ধরে শেখাতেন, দাঁড়িয়ে থেকে করতে বলতেন। নিজেই বলতেনঃ "দেখ ভবি, পুজো আর কি করবি—সব কাজই পুজো, এখন থেকে এইটি মনে

রাখবি। মেয়েদের এইসব কাজই পুজো, বুঝলি?"

মা যেকোন কাজ করার আগে গঙ্গাজল একটু হাতে নিতে বলতেন। নিজেও নিতেন, আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিতেন। গঙ্গাজলকে বলতেন 'ব্রহ্মবারি'। আমার ওটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে এখনো কিছু করার কথা মনে হলেই চাই 'ব্রহ্মবারি'। মায়ের আচার বিচারের বড় একটা বাই ছিল না। কাপড়-জামাও বেশি ছাড়তে বলতেন না। আমরা তো ছোট বয়স থেকে শাড়ি পরতাম। মা আমাকে নিজেই মাথা আঁচড়ে দিতেন। দুবেলা ঠাকুরের ঘরের কিছু না কিছু করতে পাঠাতেন।

**

পীতাম্বর ভাণ্ডারীর মেয়ে, দক্ষিণেশ্বর গাঁয়ের দু-তিনজন খেলুড়ে সমবয়সী রোজ আসত। তারাও মার ও ঠাকুরের খুব আদরের ছিল। তাদের সাথে কত কি খেলতাম—ছুটোছুটি, গাছের ডালে উঁকিঝুঁকি খাওয়া, হাঁসপুকুরে সাঁতার, কত কি! তবে ওরই মধ্যে ছুটে এসে মাকে দেখে যেতাম। একদিন বেশ মজা হলো। ঝামাপুকুরের বাড়ি থেকে এলেন একদল কুটুম। জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় গঙ্গা নাইতে এসেছেন। এই ফাঁকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁদের সারু ও পাগলা জামাইকে দেখতে এসেছেন। দেখতে এসেছেন সারু ঘর সংসার কেমন করছে। জনা ছয়েক হবে। তাঁরা এসেই ঠাকুরের ঘরে সাক্ষাৎ করে নহবতে এলেন। কত কথা হচ্ছে, গ্রামের পুরনো কথা। আমি তো একপাশে রয়েছি, সব গিলছি। ওরই মধ্যে একজন, মায়ের মতোই হবেন বয়সে, বলে উঠলেনঃ "কিরে গাঁদাফুল—মনে আছে, না ভোলানাথ স্বামী পেয়ে জবাকে দিবি ভুলে গেছিস?" বলেই মায়ের গালে এক ঠোনা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। অমনি পাশের আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি রে? ভেঙে বল আমরাও শুনি।" মা লাজুক ছিলেন, হাসলেন শুধু। অপর মহিলা বললেনঃ "আমরা একদিন বর্ষাকালে বাঁড়ুজ্জে পুকুরে নাইতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাই, কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়িনি। জড়িয়ে ছিলাম। পাশে একজন বুড়ি গোছের মহিলা আমাদের টেনে তোলেন। তখনো আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে আছি। তা দেখে তিনি বললেন, 'তোমরা দুজনে সই

বুঝি? আমি তোমাদের নাম দিলাম গাঁদা আর জবা—বুঝলে?' খুব মজা হলো। সেই থেকে সারুর নাম 'গাঁদা', আমার নাম 'জবা'।"

আমায় সন্ধ্যার কিছু কিছু কাজ প্রতিদিন করতে হতো—ঠাকুর শিখিয়েছিলেন নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে। গাজিপীরের তলায় সন্ধ্যাবাতি দেওয়া, তারপর নহবতে মায়ের পুজোর জায়গায় ধূপ-ধুনো জ্বালা—মা বসতেন নিয়ম করে। সন্ধ্যায় যারা নহবতে থাকত তারাও বসত মাকে ঘিরে। আমি তো মার গা ঘেঁষে বসে থাকতাম। ঠাকুরের দিকে যতটা না চোখ দিতাম বেশি দেখতাম মাকে। তাঁর এক অদ্ভুত মূর্তি তখন। ঐদিকে মন্দিরে মন্দিরে চলছে আরতি, ঠাকুরের ঘরে হরিনাম, গঙ্গার বুকে জ্বলে উঠেছে চারপাশের দীপাবলীর প্রতিচ্ছবি, এক দিব্য পরিবেশ। মানুষ তখন যেন মানুষই থাকে না—সব ভুল হয়ে যায়। এ ছিল নিত্যকার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভোলা যায় না। শিশুমনের অনেক কথা বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে গেছে, কিন্তু সেই ছন্দোবদ্ধ সান্ধ্য আবেশের ছোঁয়া, রেশ মুছে যায়নি আজও।

ঠাকুর বলতেনঃ "সকাল সন্ধ্যা সবকিছু ফেলে ঈশ্বরের নাম করবি।" নাম করাতেন নিজে হাততালি দিয়ে। বলতেনঃ "গলা খুলে কর, ভেতরের সব বদ জিনিস বেরিয়ে যাবে, দেহ-মন পবিত্র হবে।" আজ তিনি তেমন করে পাশে নেই, কিন্তু সন্ধ্যে হলেই কে যেন আজও কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'হরিনাম', 'রামনাম' করেন—বেশ শুনতে পাই। এ তাঁরই কণ্ঠ—বাঁশির মতো সুর ধরে আছে।

সন্ধ্যার পর সব চুকে গেলে ঠাকুরের ঘরে যেতাম। ঠাকুর তখন প্রায় একা বসে আনমনা হয়ে থাকতেন; বড় কথা বলতেন না। কেবল বলতেনঃ "ওরে ঐখানে জলচৌকিটার ওপর প্রসাদ রাখা আছে, নহবতে দিয়ে আয়। আর তোরটাও রাখা আছে, খাবি আয়।" আমি নহবতে মাকে প্রসাদের থালা দিয়ে নিজেরটা খেয়ে ঠাকুরের ছোট খাটে শুয়ে পড়তাম আর ঘুমোতাম। অনেক রাতে মা নিয়ে যেতেন নহবতে। তখন ঘুম ভেঙে যেত। মা, আমি আর অন্য কেউ থাকলে রাতের খাওয়া খেতাম, পরে মার কোলের কাছে শুয়ে গল্প শোনার বাই ধরতাম। মা জিজ্ঞাসা

করতেন: "আজ তিনি"—মানে ঠাকুর—"কি বলেছেন মনে আছে? বল তো শুনি!" শুনতেন, আবার নিজেও অনেক কথা বলতেন।

একদিন গল্প চলছে, মাকে বললাম: "তোমার নাম তো গাঁদা, তোমার সইয়ের নাম জবা, তাই না? ঐ সেদিন যারা জয়রামবাটী থেকে এসেছিল, বললে। আমিও তোমাকে 'গাঁদাফুল-দিদি' বলে ডাকব, কেমন?" মা বলেন: "কেন রে, 'মা' ডাকতে ভাল লাগে না?" "তা না, তবু গাঁদাফুল-দিদি ডাকব।" মা 'না' বললেন না। মনে হলো অসম্মতি নেই। আমি তারপর থেকে মাকে 'গাঁদাফুল-দিদি' ডাকতাম। মা-ও সাড়া দিতেন।

মা গল্প বড় একটা করতেন না। একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করেছি, মা যখন যে-কাজই করুন না কেন, ঠোঁট নড়ছে। একদিন খুব মজা হয়েছে। মা আমাকে বললেন: "ভবি দেখ, আমি একটু ঠাকুরের ঘর থেকে আসছি, খাবার জলটা রেখে।" বললাম: "আমাকে দাও রেখে আসি।" মা দিলেন না। বললেন: "তুই বরং উনুনের কাছে বসে দ্যাখ ডালটা উথলে না পড়ে, ফুলে উঠলে জল ঢেলে দিস সামান্য, বুঝলি?" মা চলে গেলেন, বলে গেলেন: "এখন ঘরে অন্য কেউ নেই চট করে দিয়ে আসি।" মা-ও গেছেন, জলও ফুটছে। আমি তো একদৃষ্টে চেয়ে আছি, ফুটলেই জল দেব। মুখে মার মতো বিড়বিড় করছি—মাকে রাঁধার সময় করতে দেখেছি কিনা! ঠোঁট নাড়ছি মাত্র: জল ফুলে উঠেছে, বাঁ-হাতে জলের পাত্র নিয়ে জল ঢালতে গেছি, মা এলেন। বললেন: "সর ভবি। মুখে কি বিড়বিড় করছিস?" "কিছু না, তুমি রাঁধার সময় তো ঐরকম করো দেখেছি, তাই।" মা হেসে বললেন: "ওরে পাগলী, আমি কি করি ঐটুকু মেয়ে লক্ষ্য করেছিস? আমি বিড়বিড় করি না, ঠাকুরের নাম করি। ওকে জপ বলে। কাজের মাঝে মাঝে ভগবানের নাম করতে হয় তবে কাজ ভাল হয়। এখন যা, ঠাকুরের ঘরটা একটু মুছে দিয়ে আয়। আগে ঝাঁট দিয়ে নিস।" ছুটে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। ঝাঁট দেওয়া মাথায় উঠল। দেখি নরেন-দা এসেছেন, সঙ্গে আরও দুজন। নরেন-দা আমাকে দেখেই বললে: "দ্যাখ শাঁকচুন্নী, ঐ কলসি থেকে জল গড়িয়ে খাওয়া, তেষ্টা

পেয়েছে।" আমি তো বেঁকে বসলাম। বলে ফেললামঃ "পারবনি। তুমি আমাকে বিশ্রী নামে ডাক কেন?" নরেন-দা হেসে হাত ধরে টেনে কোলের কাছে নিয়ে বললেনঃ "ওরে শাঁকচুন্নী, তুই তোর ঐ হাত দিয়ে জল, তামাক খাওয়ালে আমার মতো সুন্দর হয়ে যাবি। তবে তো সুন্দর বর আসবে! এখন ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল দে, আর তামাক সেজে আন এক ছিলিম।" ঠাকুর ঘরে নেই—আমার ঝাঁট দেওয়া হলো না। জল দিলাম। তামাক সাজতে তেমন জানি না, তবু বারান্দায় হুঁকো ছিল, কল্‌কে একটা নিয়ে নহবতে গেলাম। মা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ঝাঁট-পাট করেছিস তো?" "না, নরেন-দা এসেছেন, ঠাকুর ঘরে নেই—তামাক সাজতে বললেন। আমি কি তামাক সাজতে জানি?" "নে, জানতে হবে না তোকে। দে আমাকে কল্‌কেটা।" মা উনুন থেকে একটা চিমটে দিয়ে আগুন দিলেন, একটা নারকোলের মালায় কল্‌কে বসিয়ে দিয়ে বললেনঃ "নিয়ে যা।" এমন পরিপাটি দেখে নরেন-দা বললেনঃ "করেছিস কি! কে এমন করে সাজিয়ে দিলে?" আমি বললামঃ "কেন? মা।" অমনি নরেন-দা মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠলেনঃ "ওরে শাঁকচুন্নী করেছিস কি? সর্বনাশ, আমি এখন ঐ কল্‌কেতে তামাক খাই কি করে?" দাদা কল্‌কে নিয়ে একবার মাথায় ছোঁয়ালেন, তারপর নিজেই উঠে তামাক সেজে খেলেন।

**

মার সাথে সারাদিনে তেমন কথা হতো না। পীতাম্বর ভাণ্ডারীর মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে আমরা দুজন ও আরও দু-একটি ছেলে ও মেয়ে ছিল, সকলে মিলে খাজাঞ্চিখানার পাশে যে ছোট ঘর ছিল সেখানে মাদুরে বসে পড়তাম, লিখতাম 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' আর ধারাপাত। ফিরে এলে ওরই মধ্যে সময় করে মা শুধোতেনঃ "আজ কি পড়েছিস বল, আমি শুনি।" বলতেনঃ "যে-কটাদিন পারিস করে নে, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যায়! আমাদের লেখাপড়ার ভাগ্য কি বিধাতা করেছেন? ছাইভস্ম শিখে রেখেছে এক—বিয়ে! বিয়ে ছাড়া মেয়েদের জীবনে আর যেন কিছুই করার নেই!" দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে

বলেনঃ "ঠাকুর কত করে আমাকে একটু সুযোগ বার করে দিয়েছিলেন—বইপত্তরও হয়েছিল, কিন্তু হলো না। লেখাপড়া না থাকলে বাঁচা মরা এক। মেয়ের জাত সব মরে আছে।"

এমন একদিন যায়নি যেদিন মা পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। তাঁর ছিল এক অদ্ভুত পদ্ধতি। সন্ধ্যারতির পর প্রায়ই আমার ঘুম পেত। আর মার নির্দেশ ছিল সন্ধ্যাবেলা ঘুমোলে 'অল্পী'তে পায় [অর্থাৎ অল্পায়ু হয়]। মা নিজে ঠাকুরের আসনের সামনে বসতেন। জপ-ধ্যানে সামান্য সময় দিতে পারতেন। তারপর বাইরের কেউ না থাকলে, আর যদি আমি ঠাকুরের ঘরে না যেতুম, বলতেনঃ "ভবি বোস।" গুণ গুণ করে গান গাইতেন, আমাকেও গাইতে বলতেন তাঁর সাথে। প্রথমে বুঝতাম না, পরে দেখেছি কী মিষ্টি গলা ছিল মায়ের! মা বলতেনঃ "ওরে, গলা বার কর, চেপে গান করিসনি। ঠাকুর আমায় বলতেন, 'গলা বার করে ঈশ্বরের গান শোনাও, দেখবে ঈশ্বর কেমন মধুর কণ্ঠস্বর দেন।' " আমি নকল করতাম মার কণ্ঠস্বর। তারপর বলতেনঃ "এবার বল তো কি পড়েছিস আজ। তোর পড়া শুনে আমি নিজে একটু শিখি। এবারে আমাকে একটু পড়া।" আমার আবার বাহাদুরিটা ছিল। নিজে পড়ি আর না পড়ি, মাস্টারি করার খুব সখ। তখন যা পড়েছি সব বলতাম। মা ভুল হলে শুধরে দিতেন। সন্ধ্যেবেলা যেদিন না হতো, রাত্রিতে পাশে শুয়ে পড়া বলতে হতো। তখন নানা গল্প বলতেন। রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে, কৃষ্ণকথা, ধ্রুব, প্রহ্লাদের কথা। মধুসূদন-দাদার গল্প—সেই দইয়ের ছোট ভাণ্ড, কিন্তু ফুরোয় আর না, যত ঢালে তত পড়ে।

**

মায়ের শিক্ষা দেওয়ার ধারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, বোঝাই যেত না তিনি শেখাচ্ছেন। উপদেশ নয়, বড় বড় কথা নয়, কিন্তু মস্ত জিনিসকে সহজ, সরল, সাবলীলভাবে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন—সে যে কোন বয়সের, যে কোন স্তরের, যে কোন অবস্থার মানুষ হোক। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, ডাকাত, চোর, জোচ্চোর যাই হোক না কেন। মা বলতেনঃ "দোষটাকে শুধরে দাও, মানুষটাকে দোষী করে দিও না। অপরের দোষ

দেখতে গেলে আগে নিজের দোষ হয়।"

একদিনের একটি ঘটনা মনে এল। আমি তখন সবে সাত বছর পেরিয়ে আটে পড়েছি। একটা বিড়াল মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরত, কিন্তু ঘরের কোন জিনিসে মুখ দিত না। সেও মায়ের সংসারের সদস্য হয়ে গিয়েছিল। একদিন কি কারণে মনে নেই, বিড়ালছানাটা আমার খাবারে মুখ দিয়েছে। অমনি আমার রাগ হয়ে গেল। আমি সামলাতে না পেরে হাতপাখার ডাঁট দিয়ে দিলাম দু-ঘা বসিয়ে। বিড়ালটা 'ম্যাও ম্যাও' করে চিৎকার করে উঠে মায়ের পায়ের আড়ালে গিয়ে মুখ ঘষতে লাগল। এদিকে দেখি কি, মা হঠাৎ 'ইস্' বলে উঠে কেমন হয়ে গেলেন। বলে উঠলেনঃ "করলি কি! করলি কি!" আমি তো হতভম্ব। ছুটে মার কোলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম—"কি হলো মা?" মা ততক্ষণে সামলে নিয়ে বললেনঃ "ওরে ভবি, তুই ওটাকে এমন করে মারলি?" চেয়ে রইলাম তাঁর করুণামাখা মুখের দিকে। একটা কটু বাক্য বললেন না, বিড়াল ছানাটাকে কোলে তুলে আদর করলেন। আমার শাস্তি এমনিতেই হলো। আর কোনদিন বিড়াল-কুকুরের গায়ে হাত তুলিনি।

ঠাকুর আর ঠাকুরানীর কথা অমৃতসমান। বলে শেষ করা যায় না। ছোট থেকে বড় কোন কিছুই মার নজরের বাইরে ছিল না। মা নিজে সঙ্গে করে ঠাকুরের শোওয়ার ঘরে নিয়ে যেতেন দু-বেলা। শেখাতেন—ঝাঁটা দিয়ে কেমন করে ঝাঁট দিতে হয়, ঝাঁট দিয়ে কেমন করে ঝাঁটাটা রাখতে হয়। যে জিনিস যেখানে থাকে তাকে তার জায়গা মতো রাখতে হয়—এমনকি অন্ধকারে হাত দিলেও যাতে সেটি পাওয়া যায়। কলসিতে জল কতটা থাকবে, ঢাকনা যেন ট্যারাবাঁকা হয়ে না থাকে। আসন পাতা, মাদুর পাতা—এতটুকু নড়চড় হতে পারবে না। নিত্যপূজার বাসন মেজে গুছিয়ে রাখা, পান সাজা, ঠাকুরের চটিজুতো পরিষ্কার করে রাখা, কোনটি বাদ যেত না। নিজে হাতে করে দেখাতেন। বলতেনঃ "ভবি, এইগুলিই মেয়েদের প্রথম পূজা বুঝলি?" বলতেনঃ "মেয়েদের শব্দ করে চলতে নেই, হা-হা করে হাসতে নেই, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলতে নেই। উঁচু গলায় কথা বলতে নেই, আবার মিনমিনেও হতে নেই। কোথাও যেতে

গেলে দুর্গা নাম করে যেতে হয়। পিছন থেকে ডাকতে নেই। গাড়িতে, নৌকায় আগে উঠতে হয়, পরে নামতে হয়। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়, কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে নেই।"

মা উঠতে বসতে কেমন সব কথা বলতেন—যেন মিষ্টি ছড়া! সব কি মনে রাখতে পারতাম? না পারি, তবে মার আঁচলের আড়ালে থেকে গায়ে কথাগুলি বসে গিয়েছিল। ঠাকুর প্রণাম না করে কোন কাজই করতে শিখিনি।

এক-একদিন ঠাকুর নিজে হাতে পাটের দড়ি, বাখারি এনে দিতেন। মা কেমন সুন্দর আসন ও কতরকম সব ব্যবহারের জিনিস তৈরি করতেন। আমাকে দিয়ে ফুল তুলে মা ভবতারিণীর জন্য মালা গাঁথাতেন। বিকেলে আমি গিয়ে মন্দিরে বা ঠাকুরের কাছে দিয়ে আসতাম। আমায় সব শিখিয়েছেন। একটু আধটু রাঁধতে শেখাতেন, তবে আগুনের কাছে যেতে বড় দিতেন না। বাইরের কাজই করাতেন। মার গোটা দিনটা ছিল একটা প্রার্থনার মতো মিষ্টি ও শান্ত। ঈশ্বরের সকল কাজ যেমন নিঃশব্দে হয়ে চলেছে, মার নিত্যদিনের কাজও ঠিক যেন প্রকৃতির ছন্দে বাঁধা সঙ্গীত—সুর ছন্দে ছিল গাঁথা। এসব বাদ দিয়ে মাকে বোঝা যায় না, চেনা তো নয়ই। দেবী না মানবী? না, দুটোর একটাও নয়, শুধুই মা। এবারে ভগবানের এই এক নতুন রচনা, নতুন লহরী, নতুন গান—সব নতুনত্বে ভরা। নতুন মাতৃত্বের আস্বাদনে মুখরিত জগৎ এবার। সাধনার শেষে ঠাকুরকে জগতের মা বলেছিলেনঃ "তুই ভাবমুখে থাক।" মাকে সকল সাধনার শেষে ঠাকুর বলেছিলেনঃ "তুমি মাতৃত্বের ভাব বিকাশের জন্য জগতের আধার জগদ্ধাত্রী হয়ে থাক।"[১]

**

এখনো মাকে দেখি। কেমন দেখি একটু বলি। তেরশো বাষট্টি সালে পুরী গেলাম। সেখান থেকে এলাম জয়রামবাটী মায়ের বাড়িতে।

১ অনুলিখন: অহিভূষণ বসু। কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বসুমতীমা শ্রীভবতারিণী দেবীর আত্মকথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—অহিভূষণ বসু, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ১২, ১৪-১৬, ১৪-১৫, ১৬-২১, ২৪-২৫, ৩০-৩২

আশ্রমের মোহন্ত খুব খুশি। থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ভার সব দায়িত্ব আশ্রমের। স্নান সেরে হাজির হলাম সিংহবাহিনীর মন্দিরে। "কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী?" —একে-ওকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলতে পারে না। পুজো করছে গণপতি। আমাকেদেখে তটস্থ হয়ে উঠল। "আসুন পিসিমা, ভিতরে আসুন। ওঃ, কী ভাগ্য আমাদের! কতদিন পরে দেখতে পেলাম পিসিমাকে।" গণপতি হলো মার ভাইপো। আর আমরাও তো আপনার লোক। শ্যামাসুন্দরী আর এলোকেশী দু-বোন। শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে মা আর এলোকেশীর মেয়ে আমি। সেই সুবাদে ওরা আমায় ডাকে 'পিসিমা'।

গণপতিকে বললামঃ "হ্যাঁরে গণপতি, সিংহবাহিনী কি ঠাকুর রে?" গণপতি বলেঃ "সে পিসিমা বড় জাগ্রত ঠাকুর। কত লোক আসে দূর দেশান্তর থেকে। কারুর আঙুল খসে যাচ্ছে। কারুর পেটে শূল বেদনা। কেউ ছেলের অসুখের জন্য মানত করে। কারুর বা দুঃখের সংসার। মার কাছে হত্যা দেয়—ফুল পায়। মনের কামনা মিটিয়ে বাড়ি ফেরে।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী, তাই বল না।"

গণপতি মাথা চুলকায়। আর গণপতিই বা কেন, মার ভাজেদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাদেরও ঐ একই কথা। মোহন্তকে শুধালাম, সেখানেও ভাসা ভাসা উত্তর। কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী, মনের মধ্যে ঐ একই প্রশ্ন।... পুজো শেষ হলো। মার সামনে বসে আছি একা। কথা বলছি মায়ের সঙ্গে—"মা সিংহবাহিনী, তুমি কে মা? ওমা, তুমি তো সিংহবাহিনী, তুমি কে মা? মাগো সিংহবাহিনী, বলো না মা তুমি!" হঠাৎ এক মধুর গন্ধে ভরে উঠল মার মন্দির। বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে সারা ঘর আলোয় আলো হয়ে গেল। যেখানে বসানো ছিল মায়ের ছোট ঘটখানি তা আর দেখতে পেলাম না। দেখি, এক জ্যান্ত সিংহ! দুটো কান নড়ছে। লেজটাও নড়ছে। আর সিংহের পিঠে বসে আছেন জগদ্ধাত্রী! লাল টকটক করছে গায়ের রঙ। "ওমা, তুমিই সিংহবাহিনী? হ্যাঁ মা সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী! মাগো জগদ্ধাত্রী, তুমিই সিংহবাহিনী!" একি! চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেখি জগদ্ধাত্রী নেই। বসে আছেন

মা দুর্গা, দশভুজা, সিংহের পিঠে। "ওমা সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী আবার তুমিই দুর্গা! তুমি কত রূপ ধর মা!" বেশিক্ষণ নয়। বোধহয় দু-এক মিনিট। তারপর! দুর্গাও নেই, জগদ্ধাত্রীও নেই। সিংহাসন আলো করে বসে আছেন আমার সারদা-মা। চুলগুলি সেই একই ভাবে ছড়িয়ে আছে বুকের ওপর।

"মা, মাগো! তুমি সারদা, তুমি সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী আবার তুমিই দুর্গা! ও আমার সারু-দিদি, ও আমার গাঁদাফুল-দিদি, তুমি তো মা সারদা! আবার তুমি জগদ্ধাত্রী! তুমিই আবার দুর্গা! ওঃ! এ আমার কী আনন্দ!" গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলাম মাকে। মাথা তুলে দেখি মা নেই। নেই সিংহের পিঠে জগদ্ধাত্রী। নেই আমার দশভুজা দুর্গা। যেমন ঘট ছিল তেমনি বসানো আছে বেদীর ওপর। মন আমার ভরে উঠল কানায় কানায়। সিংহবাহিনী কে, মা আমায় জানিয়ে দিলেন নিজে দেখা দিয়ে। বলতে হবে সকলকে। জানিয়ে দেব তাদের, যারা না জেনে মার মন্দিরে হত্যা দিয়েছে। মার আশীর্বাদী নির্মাল্য ধারণ করে সফল হয়েছে যাদের মনোবাসনা।[২]* ❑

---

২ অনুলিখন : প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : তাপসী বসুমতী-মা—প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃঃ ৬-৭, ৮-৯

* উদ্বোধন, ১০০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৫, পৃঃ ৭৯৫-৭৯৭

দ্বাদশ পর্ব

শ্রীশ্রীমাকে যেমন দেখিয়াছি

স্বামী ভূমানন্দ

মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে ছিল আমার পূর্বাশ্রম। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) এবং নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) সেই ক্ষুদ্র শহরে শুভাগমন করেন। আমার পূর্বাশ্রমেই পূজ্যপাদ মহারাজগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবের আনন্দে সাতদিন গত হইল। মঠে ফিরিবার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়িতে শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি দাড়ি গোঁফ রাখিতেন। সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া প্রীত হইলেও স্বস্তি অনুভব করিতে পারি নাই। আমি এমন গম্ভীর মূর্তি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। চৈত্রমাসে শরৎ মহারাজকে প্রথম দেখিলাম। তারপর দেখি বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে রাত্রি প্রায় এগারটার সময়। আহিরীটোলা হইতে নৌকায় পার হইয়া সালকিয়া পথে শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন মাত্র দুইমাস মঠে আসিয়াছি। গৃহে থাকিতে যেসকল সন্ন্যাসী দেখিয়াছি তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দুস্থানী। প্রজ্জ্বলিত ধুনীর পার্শ্বে বৃক্ষতলশায়ী, গঞ্জিকাসেবী, কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল, রোগে ঔষধ প্রদান, অর্থের বিনিময়ে (হাত দেখিয়া) ভাগ্যগণনা, ভাড়ার অর্থের জন্য গৃহীর দ্বারে শুভাগমন, ইহাই সাধুর লক্ষণ বলিয়া জানিতাম। ইহা ছাড়া স্থানীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা ধার্মিক বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ক্বচিৎ কেহ মৌন থাকিতেন। ধার্মিকদের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভাবের আতিশয্যে কখনো হাসিতেন,

কখনো কাঁদিতেন, কখনো নৃত্য করিতেন আবার কখনো বা কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করিতেন। এইসকল ধার্মিকেরা কথা বলিতে যাইয়া 'ভুলিয়া গেছি' এই কথা প্রয়োগ করিয়া জানাইতেন—এ-জগতে তাঁহাদের মন বেশিক্ষণ থাকিতেছে না। তখন বুঝিয়াছিলাম 'ভুল হওয়া' ধার্মিকের একটা বড় লক্ষণ।

বেলুড় মঠে আসিয়া পূর্বধারণা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতীত হইল। সংসারে থাকিতে দর্শক ছিলাম। এখানে শিষ্য, সুতরাং শিখিতে হইল—'ভাব' খুবই ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'প্রবণতা' যুক্ত হওয়া ভাল নহে, যেমন 'শুচি' ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'বাই' যুক্ত হওয়া সমীচীন নহে। জানিলাম 'ভুল হওয়া' ধার্মিকের লক্ষণ নহে, উহা নিছক ব্রহ্মচর্য অভাবের ফলমাত্র। শুনিলাম, সাধুর মাংসপেশী হইবে লোহার, স্নায়ু হইবে ইস্পাতের এবং এমন ইচ্ছাশক্তি হইবে যাহার গতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব নহে।

তখন শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গরমের সময়ে পুরীধামে থাকিতেন, বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) মঠের কাজ দেখিতেন। গোপাল-দা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), স্বামী নিত্যানন্দ, গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) মঠে থাকিতেন। সেই সময় শরৎ মহারাজ কলকাতা হইতে মঠে আসিতেন। কখনো দু-এক দিন থাকিতেন। প্রায়ই যেদিন আসিতেন সেদিনই কলকাতায় ফিরিতেন।

যে বৎসর (১৯০৮ খ্রীঃ) মঠে স্থানলাভ করিলাম, সে-বৎসর পুরী জেলায় মিশনের দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য চলিতেছিল। চিল্কা হ্রদের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে, সেই সকল দ্বীপে অজন্মা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই সেবাকার্য দশ মাস চলিয়াছিল এবং ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেবাকার্য বন্ধ করা হইল। সুধীর মহারাজের (স্বামী শুদ্ধানন্দ) প্রস্তাবে এবং শরৎ মহারাজের অনুমোদনক্রমে শেষ অংশের পাঁচ মাস আমিও সেই সেবাকার্যে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। চিল্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড় মঠে রহিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় ভাঁড়ারে বাবুরাম মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করিলেন। আমার নিত্যকার কাজ হইল পূজায় যোগাড় দেওয়া।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজার তিন-চার দিন পূর্বে শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে হোমের ঘরে বসিয়া শরৎ মহারাজকে চার প্রহর একাসনে বসিয়া পূজা করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার রাত্রিতে শরৎ মহারাজকে প্রতি বৎসর 'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে' গানটি ঠাকুরঘরে বসিয়া গাহিতে শুনিয়াছি, আর শুনিয়াছি স্বামীজীর তিথিপূজায় গাহিতে—'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামিকালহীন দেশহীন সর্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।' ইহা ছাড়া অন্য সময়েও তাঁহাকে অনেক গানই গাহিতে শুনিয়াছি। কী চমৎকার কণ্ঠ, আর কী সুন্দর ছিল গাহিবার ভঙ্গি!

এই বৎসর উদ্বোধনের নিজবাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। উৎসবের পর শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আসিল—মামারা পৃথক হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, শরৎ মহারাজকে উপস্থিত থাকিয়া ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিতে যাইতে হইবে। মঠে আসিয়া সে-সংবাদ শরৎ মহারাজ জানাইলেন। আমি বাবুরাম মহারাজকে ধরিয়া বসিলাম, 'মাকে কখনো দেখি নাই, আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে যাব।' বাবুরাম মহারাজ আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিলেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ। শরৎ মহারাজ সকালে গুমো প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রওনা হইলেন। যোগীন-মা ও গোলাপ-মা সঙ্গে চলিয়াছেন। গাড়ি বাঁশি বাজাইয়া হাওড়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

খড়্গপুরে গাড়ি আসিল। তখন খাবার কিনিয়া মহারাজ ও আমি খাইলাম। যোগীন-মা ও গোলাপ-মা গাড়িতে কিছু গ্রহণ করিলেন না। বৈকালে গাড়ি বিষ্ণুপুরে আসিল। আমরা এইখানে সকলে নামিয়া পড়িলাম। একটা চটিতে যাইয়া রান্নার ব্যবস্থা হইল। আহারান্তে যাত্রা করিবার জন্য শরৎ মহারাজ প্রস্তুত হইলেন।

যথাসময়ে দুইখানা গোরুর গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম খানিতে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা উঠিলেন। অপর খানিতে শরৎ মহারাজ উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ "উঠে পড়।" সর্বনাশ! এক গাড়িতে উভয়কে শয়ন করিতে হইবে নাকি! একে তিনি স্থূলদেহী, আর এ-দেহ

স্থূল না হইলেও কাঠামোখানা নেহাৎ কম নহে। কিন্তু সেকথা তখন বলে কে? সমস্ত রাত শরৎ মহারাজের পার্শ্বে একপাশ হইয়া কাটাইয়া রাত যখন তিনটা, তখন গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম।

পরদিন সকাল নয়টার সময় গাড়ি কোয়ালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনো কোয়ালপাড়া মঠ হয় নাই, তবে বয়ন-বিদ্যালয় ছিল। কেদারবাবু (পরে স্বামী কেশবানন্দ) বাক্স ও বিছানা বহন করিবার লোক ঠিক করিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ পদব্রজে জয়রামবাটী চলিলেন। বেলা এগারটার সময় আমোদর নদ পার হইয়া মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধাও আসিতেছিলেন। মহারাজকে ঘর্মাক্ত দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধা সস্নেহে বলিলেন: "আহা, ভোঁদা (মোটা) মানুষ, বড্ড কষ্ট হয়েছে, বাবা?" পরবর্তী সময়ে মহারাজ কিন্তু এই কথা বলিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন। মহারাজ স্নান করিতে আমোদর নদে নামিলেন। স্নান করিয়া ক্ষুদ্র মাঠখানা অতিক্রম করিয়া জয়রামবাটী গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং একেবারে ধূলাপায়ে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তিনি প্রণাম করিলেন—মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। পরে আমি প্রণাম করিলাম। মা আমার মাথায়ও হাত দিয়া আশীর্বাদ এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। আমি একদৃষ্টে মাকে দেখিতে লাগিলাম।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জয়রামবাটীতে আসিয়াছেন। কালীমামা (শ্রীমা-র মধ্যম ভ্রাতা) তাঁহার নূতন বাটীতে যত্ন সহকারে মহারাজের থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমা দুই বেলা শরৎ মহারাজের জন্য কিছু কিছু রান্না করিতেন। ভক্তদের রান্না করিয়া খাওয়াইতে মা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যখনই কোন ভক্ত জয়রামবাটীতে মাকে দেখিতে আসিতেন মা সেই সময় কিছু কিছু রান্না করিতেন। সকালে বাহিরের উনুন নিজেই মুক্ত করিয়া আমাদের জন্য মাছ রান্না করিতেন। পাড়াগাঁয়ে বৃষ্টি হইলে কি রকম কাদা হয়! মা অন্দরের সেই কাদা সকালে একখানা কাঠ দিয়া সমান (level) করিয়া

দিতেন। একদিন মহারাজকে একথা বলিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "এখানে (জয়রামবাটীতে) মায়ের হাত থেকে কাজ টেনে নিয়ে করবে না, তাতে মামীদের অখ্যাতি হবে।" তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও না দেখি না দেখি করিয়া চলিয়া আসিতাম। মা স্বেচ্ছায় কাজ করিতেন। কাজ করিয়া চিরদিন আনন্দ পাইতেন। কাজ করিতে না পাইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন।

প্রথমদিন হইতেই মা আমার সাথে কথা বলিতেন। কিন্তু আমি একটু বোকা জানিয়াই বোধহয় শরৎ মহারাজ মায়ের কাছে বোকার মতো কোন কথা না বলিয়া ফেলি এজন্য মাঝে মাঝে উপদেশচ্ছলে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। একদিন কিন্তু দেখিলাম আমারও 'দাদা' আছেন। একজন ভক্ত আসিয়াছে মাকে দর্শন করিতে। আমি তাহাকে লইয়া গেলাম। সে প্রণাম করিয়া মায়ের শ্রীপাদ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য কিছু না বলিয়াই পা-খানা ধরিয়া এক টান দিল। ভাগ্যে বারান্দায় একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নতুবা কি যে হইত! আমি যাইয়া ভক্তের হাত ধরিলাম। মা শান্তভাবে বলিলেনঃ "ছেলেটি বড় সরল।" ভক্তটিকে লইয়া বাহিরে আসিলাম এবং যথাসময়ে শরৎ মহারাজকে সে-ঘটনা নিবেদন করিলাম। তিনি কোন মন্তব্য না করিয়া যোগানন্দ স্বামীজীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেনঃ "যোগীন স্বামীজী কখনো মাকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতেন না। মা চলে গেলে সে-স্থান হতে ধূলি নিয়ে মাথায় নিতেন।" যে-ভক্ত মার শ্রীপাদ ধরিয়াছিল সে একথা শুনিতে পাইল না। শুনিলাম আমি। তাই মনে হইয়াছিল, বোধহয় শরৎ মহারাজ আমার জন্য সর্বদা ভয়ে ভয়ে আছেন পাছে আমি ঐরকম একটা কিছু করিয়া বসি।

একদিন ভিখারী আসিয়া গান ধরিল ঃ

কী আনন্দের কথা উমে—
লোকমুখে শুনি সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে।।
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।

এখন নাকি তাঁর দ্বারে আছে দ্বারী
দেখা পায় না তাঁর ইন্দ্র, চন্দ্র, যমে।।
'ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা' আমার বলত দিগম্বরে
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে।
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে
ভিক্ষায় দিনরক্ষা এমন দিন গেছে।
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে
ফিরেছে কি কপাল তোর কপাল ক্রমে।।
বিষয় বৃদ্ধি বটে বুঝিলাম মনে
তা না হলে গৌরীর এত গৈরব কেনে।
আপন সন্তানে না দেখে নয়নে
মুখ বাঁকায়ে থাকে শ্রীরাধিকার নামে।।

শ্রীশ্রীমা বড়মামার বাড়িতে থাকিতেন। সে-বাড়ির বাহিরে আসিবার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মা গান শুনিতেছিলেন। গানটি মাকে অবলম্বন করিয়া সুন্দর প্রযুক্ত হইতে পারে। ঠাকুরকে ওদেশের প্রায় সকলে 'ক্ষ্যাপা' বলিয়া জানিত। গান শুনিয়া শরৎ মহারাজ বেশ আনন্দবোধ করিলেন। 'এত গৈরব' কথাটি হাসিমুখে উচ্চারণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেনঃ "এই গান আগেও জয়রামবাটীতে শুনেছিলাম।" গানটি কিন্তু দাশরথি রায়ের। কে একজন রাধিকা উহা বেমালুম নিজ নামে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি ছাপার হরফে গানের ভনিতায় আছে—"মুখ বাঁকাইয়া থাকে দাশরথির নামে।"

এতদিন ধরিয়া জমিজমা মাপ হইতেছিল, এইবার দলিলের সহিত জমির পরিচয় হইবে। দলিল সকলই কালীমামা হস্তগত করিয়া বসিয়া আছেন। বড়মামার মনোগত ভাব যে, দলিল তাঁহার জিম্বায় থাকে। কালীমামা তাহাতে নারাজ। দলিল বিভাগ উপলক্ষে সেইদিন মহারাজ কালীমামার বাড়ির ভিতরে যাইয়া বসিলেন। হঠাৎ দেখি মহারাজ ফিরিয়া

আসিয়াছেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেনঃ "আমার সঙ্গে এস। খুব সতর্ক থাকবে, যেমন বলব তেমনি কাজ করবে কিন্তু।" "চলুন" বলিয়া আমি শরৎ মহারাজের অনুসরণ করিলাম। তিনি উত্তরের ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুরের ওপরে যাইয়া বসিলেন। আমি বড়মামার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মহারাজ আমায় বসিতেও বলিলেন না। একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। দেখিলাম, লোহার সিন্দুক খুলিয়া দলিলসহ কালীমামা বারান্দায় আসিলেন এবং সমস্ত দলিলগুলি মহারাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মহারাজ দলিলগুলি কালীমামার সাহায্যে দেখিতে লাগিলেন। স্থির ছিল, যতদূর সম্ভব জমির সহিত দলিলও ভাগ হইবে। ইতিমধ্যে যোগীন-মা আসিয়া বলিলেনঃ "শরৎ, এসো, মা তোমায় ডাকছেন।" মায়ের নাম শুনিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বড়মামাকে বলিলেনঃ "দলিলে হাত দিবেন না বড়মামা, যেমন আছে থাক, আমি এসে দেখব।" কিন্তু চোখ ছিল আমার উপরে। বুঝিলাম একথার অর্থ কি। কিন্তু বড়মামা দলিলে হাত দিলে তখন কি যে হইবে ভাবিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহারাজও যেমন চলিয়া গেলেন বড়মামাও কথায় কথায় অমনি কালীমামার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। শেষ "দিবুনি দলিল" বলিয়া চক্ষুর নিমিষে সমস্ত কাগজ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন পথ রুদ্ধ। বড়মামা কাতর কণ্ঠে বলিলেনঃ "বাবু পথ ছাড়, যেতে দাও।" তারপর দুই ভাইয়ে দলিল লইয়া টানাটানি। গোলমাল শুনিয়া শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া আমাকে এক ভীষণ ধমক—"দাঁড়িয়ে কি দেখছ?" সে ধমকে বড়মামা বসিয়া পড়িলেন। কালীমামা যাইয়া যথাস্থানে বসিলেন, বড়মামা দলিলগুলি মহারাজের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

এমনই ব্যাপার প্রায় ঘটে ঘটে করিয়া ঘটিতে পারিত না। লোকজন আসিয়া পড়িত। কিন্তু মামাদের এসমস্ত বিরোধের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীমা ধীর স্থির আছেন—আর আছেন শরৎ মহারাজ।

এইসময় একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিলেনঃ "আমাদের তো দেখছ কেউ ত্রিশ বছরের সাধু, কেউ পঁচিশ বছরের সাধু, পান থেকে

চুণ খসলে চটে আগুন হই। কিন্তু মা কি কচ্ছেন দেখতে পাচ্ছ? তাঁরই ভায়েরা কী কাণ্ডখানাই না কচ্ছেন! মা কিন্তু যেমন তেমনটিই—ধীর স্থির আছেন।" অতি সত্য কথা। নিত্য দেখিতাম ছল-ছুতা ধরিয়া একটা কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। আর মা, তিনি যেন সে বাড়িতেই ছিলেন না, এমন ছিল তাঁহার ভাব।

মানুষের মন আদর্শ পাইলেই অলক্ষ্যে অপরকে সে-আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের আদর্শ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু কর্মের মধ্যে মাকে দেখিবার সৌভাগ্য যতটা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে মনে হইত সঙ্ঘ পরিচালনে যে ধৈর্য, সহানুভূতি ও আন্তরিক অনুকম্পা আমরা শরৎ মহারাজের দেখিয়াছি, ইহা তিনি মায়ের আশীর্বাদেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মামাদের ভাগ-বাটোয়ারার সালিশ ছিলেন—স্বামী সারদানন্দ, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (তাজপুর) এবং শম্ভুনাথ রায় (জিবটা)। যথাসময়ে সালিশী রোয়দাদ লেখাপড়া আরম্ভ হইল। তাজপুরের সারদাপ্রসাদবাবু মামাদের দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—তিনি কোন্ ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেনঃ "ঠাকুর বলতেন, 'ইঁদুর গর্ত করে—সাপ সেই গর্তে থাকে।' " সারদাপ্রসাদবাবু সেকথা শুনিয়া পুনরায় মামাদের দিয়া মাকে বলিয়া পাঠাইলেন—প্রসন্ন, কালী প্রভৃতির ঘর, বাড়ি, জমিজমা যখন ভাগ হইতেছে তখন তাঁহার (মায়ের) জন্য কোন ঘর নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তিনি কেমন করিয়া জয়রামবাটী থাকিবেন? মা বলিয়া পাঠাইলেনঃ "দুদিন প্রসন্নের ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।" সারদাপ্রসাদবাবু আর প্রশ্ন করিলেন না। মা যে ঘরে থাকিতেন তাহা প্রসন্নমামার ভাগে ফেলিয়া দিলেন।

সালিশদের লেখাপড়া হইয়া গেল। ভাল এক দিন দেখিয়া কোতুলপুরে যাইয়া দলিল রেজেস্টারী হইল। তারপর মামারা দলিল অনুসারে জমি ভূমির দখল লইলেন।

শ্রীশ্রীমা কলকাতা আসিবার ইচ্ছা যোগীন-মা ও গোলাপ-মার কাছে ব্যক্ত করিলেন। শরৎ মহারাজ যাত্রার দিন স্থির করিলেন—মা সেদিন যাইবেন সম্মতি দিলেন।

২১শে মে শুক্রবার চারিখানা গাড়ি আসিল। সন্ধ্যার পূর্বে মা যাত্রা করিলেন। রাস্তায় পথভুল হওয়ায় রাত্রি দশটার সময় কোয়ালপাড়ায় এক মন্দিরের সম্মুখে গাড়ি আসিতেই শরৎ মহারাজ গাড়ি থামাইতে বলিলেন। গাড়ি থামিল। রাত্রের আহারাদি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া সমাধা হইল—তারপর গাড়ি চলিতে লাগিল। সকাল প্রায় আটটার সময় গাড়ি আসিয়া জয়পুরে দাঁড়াইল। এখানে স্নানাহার করিয়া গাড়িতে ওঠা গেল। এইখান হইতে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল আরম্ভ। যে চারিখানা গাড়ির কথা বলিয়াছি উহার একখানাতে মা, রাধু ও মাকু, দ্বিতীয় খানাতে যোগেন-মা ও গোলাপ-মা, তৃতীয় খানাতে শরৎ মহারাজ একা আছেন, চতুর্থ খানাতে আছি আশুতোষ নামক জয়রামবাটীর একজন ভক্ত ও আমি। গাড়িগুলি বিষ্ণুপুর স্টেশনে পৌঁছাইলে কুলির মাথায় মাল দিয়া আমরা স্টেশনে আসিলাম। টিকিট লইয়া ফিরিতেই ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেন মাত্র দুই মিনিট বিষ্ণুপুরে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি মাকে এমন এক কামরাতে (Inter class) তুলিতে হইল যে-কামরায় একজন অতি বৃদ্ধ পশ্চিমদেশীয় মুসলমান ও তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী ছিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

পরের দিন সকালে ২৩শে মে রবিবার, ১৯০৯ শ্রীশ্রীমা উদ্বোধন বাটীতে প্রথম শুভাগমন করিলেন। সেইদিন উদ্বোধনে থাকিয়া পরদিন মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলে বন্যা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশন ভগবানপুরে আটমাস সেবাকার্য করিয়াছিল। সেই সেবাকার্যে আমাকেও যাইতে হইয়াছিল। সেবাকার্য শেষ করিয়া ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে মঠে ফিরিয়াছি। সহসা একদিন মঠে সংবাদ আসিল মূত্রাশয়ের (kidney) ভীষণ যন্ত্রণায় শরৎ মহারাজ শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। তিন-চার দিন পরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাকে শরৎ মহারাজের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তখন শ্রীশ্রীমা

উদ্বোধনে আছেন। উদ্বোধনে আসিয়া প্রথমে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম মায়ের সেই ধীর স্থির ভাব নাই। আমাকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে মা বলিলেনঃ "কী হবে গো—আমার সৃষ্টিধর যে অসুখে পড়েছে।" ইতিপূর্বে এমন অস্থির হইতে আমি কখনো মাকে দেখি নাই।

শরৎ মহারাজ শুইয়া আছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তখন শ্রীমান নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ) বুঝাইয়া বলিল। দশ-বারো দিনে শরৎ মহারাজ আরোগ্য হইলেন। আমি মঠে চলিয়া আসিলাম।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শরৎ মহারাজ ও যোগীন-মার সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিলাম। ২৫শে মে আমরা কলকাতা ফিরি। শরৎ মহারাজ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন সেই সময় জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার (নতুন) বাড়ি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা উৎসবের সংবাদ শরৎ মহারাজকে স্বামী অরূপানন্দ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নানা সংবাদের পর ইহাও লেখা ছিল— "বাড়ি প্রতিষ্ঠার সময় আপনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া মার ইচ্ছা আপনি কলকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর একবার জয়রামবাটী আসিয়া বাড়ি-ঘর কেমন হইল দেখিয়া যান।"

কলকাতায় ফিরিয়া আসিবার দিনকতক পরে শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী রওনা হইলেন। এ-যাত্রায়ও আমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলাম।

একদিন শরৎ মহারাজ ডাকিলেন এবং কতগুলি কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেনঃ "পড়ে দেখ গে, যদি কিছু বদলাবার থাকে আমায় জানাবে।" এ-যাত্রায় শরৎ মহারাজ থাকিতেন মার নতুন বাড়ির বৈঠকখানার ঘরে। আমি থাকিতাম শ্রীযুত কালীমামার বৈঠকখানাতে। শরৎ মহারাজের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাগজখানা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িলাম। দেখিলাম শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণনামার মুসাবিদা।

কথা স্থির হইল—শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে আসিবেন। রাস্তায় কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে মা দু-দিন থাকিবেন, সেই সময় অর্পণনামা রেজিস্ট্রি হইবে। তাহার পর মা যাত্রা করিবেন।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীমা পালকীতে কোয়ালপাড়া আসিলেন। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ), বাঁকুড়া হইতে আগত বিভূতিভূষণ ঘোষ প্রভৃতিও পদব্রজে চলিলেন। মালপত্র কুলির মাথায় দিয়া আমি সেই সঙ্গে চলিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যায় মা কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আসিলেন। পরদিন সন্ধ্যার পরে কোতুলপুর হইতে সাব-রেজিস্ট্রার আসিলেন। দলিল রেজিস্ট্রী হইল। পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে গোরুর গাড়িতে সকলে কলকাতা আসিবার জন্য বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হইলেন। বিষ্ণুপুরে একদিন থাকিয়া পরের দিন রওনা হইয়া সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিলেন। আষাঢ় মাসে মা উদ্বোধনে আসিলেন—শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রীমহারাজ কন্যাকুমারী দর্শনে তুলসী মহারাজের (স্বামী নির্মলানন্দ) সঙ্গে রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। এ-যাত্রায় প্রায় সতের মাস শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে ও পুরীতে ছিলাম।

সেদিন ইং ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের (কপিল মহারাজ) নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে তার পাইয়া শরৎ মহারাজ জানিতে পারিলেন, শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন। হাতে শত কাজ, হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ), বাবুরাম মহারাজ অসুস্থ। শ্রীশ্রীমহারাজ উদ্বোধনে আছেন। এইসকল বিষয়ের মীমাংসা যেন এক মুহূর্তে স্থির করিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন এমনভাবে বলিলেনঃ "কাল জয়রামবাটী যাব।" পরদিন ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (শরৎ মহারাজের অনুজ), শ্রীমান বিমল (স্বামী দয়ানন্দ), যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া রাত্রির গাড়িতে শরৎ মহারাজ রওনা হইলেন এবং ২১শে জানুয়ারি বেলা দশটার সময় জয়রামবাটী আসিয়া পৌঁছাইলেন।

শ্রীশ্রীমা বলিলেনঃ "কাঞ্জিলালের ওষুধ খাব।" সুতরাং ডাক্তার কাঞ্জিলালই হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। চারদিন ঔষধ সেবন করিয়া মা ভাল হইলেন, ২৮শে জানুয়ারি অন্নপথ্য করিলেন।

শরৎ মহারাজ মাকে লইয়া উদ্বোধনে আসিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মা এযাত্রায় আসিবার কোন ইচ্ছা দেখাইলেন না। তবুও শরৎ মহারাজ

আমাকে জয়রামবাটীতে রাখিয়া শ্রীমান বিমলকে সঙ্গে করিয়া কামারপুকুর, বদনগঞ্জ হইয়া কোয়ালপাড়া পথে উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। আমি চোদ্দ-পনের দিন জয়রামবাটী রহিলাম। মা স্থির করিলেন—এখন উদ্বোধনে যাইবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন সকালে আমি উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলাম।

হরি মহারাজ চিকিৎসার জন্য উদ্বোধনে রহিয়াছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে অসুস্থ হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ চিকিৎসার জন্য সেখানে আছেন। এমন সময় কোয়ালপাড়া মঠ হইতে (১০ই এপ্রিল, ১৯১৮) 'তার' আসিল—"শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন, জ্বর বিরাম হয় না।" মায়ের অসুখ-সংবাদে শরৎ মহারাজকে চিরদিন চঞ্চল হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং এবারেও তখনই ঠিক করিলেন, রাত্রের গাড়িতে ডাক্তার কাঞ্জিলালকে লইয়া স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী) ও আমাকে কোয়ালপাড়া যাইতে হইবে।

যথাসময়ে ডাক্তার কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু জ্বরের বিরাম হইল না। এসময় জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিলেই জ্বরের ঘোরে মা বলিতেন: "কৈ শরৎ এল না।" মাকে যদি জিজ্ঞাসা করিতাম: "মা, শরৎ মহারাজকে আসতে লিখব?" মা কিন্তু বলিতেন: "না, না, লিখো না, গরমে বাছার আসতে কষ্ট হবে।" তারপরেই কিন্তু আবার বলিতেন: "কৈ শরৎ এল না।"

এদিকে মা জ্বরের মধ্যে বলিতেছেন: "কৈ শরৎ এল না।" জিজ্ঞাসা করিলে বলেন: "না, না লিখো না" ইত্যাদি। আমি সকল কথা শরৎ মহারাজকে নিবেদন করিলাম। ডাক্তার কাঞ্জিলালও জ্বরের রকম দেখিয়া পত্র দিলেন। শরৎ মহারাজ ১৭ই এপ্রিল বেলা প্রায় দেড়টার সময় ঘোড়ার গাড়িতে বিষ্ণুপুর হইতে কোয়ালপাড়া মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে ডাক্তার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও যোগীন-মা আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের এই অপ্রত্যাশিত শুভাগমনে সকলে বিলক্ষণ ভরসা পাইলেন।

শরৎ মহারাজ গাড়ি হইতে সোজা আসিয়া মায়ের বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া মায়ের শিয়রের দিকে তক্তপোশের উপর বসিলেন। এইসময় মায়ের জ্বর

বাড়িতেছিল। তিনি দুইখানা হাতে কিছু ধরিবার জন্য যেন হাতড়াইতে ছিলেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "মা এমন করছেন কেন?" ডাক্তার বলিলেনঃ "জ্বর এসে মার হাতে জ্বালা আরম্ভ হয়, সেসময় কোন ঠাণ্ডা জিনিসের উপরে হাত রাখবার জন্য এমন করেন।" শরৎ মহারাজ জানিতেন, তাঁহার শরীর খুব ঠাণ্ডা। সেজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন এবং মায়ের হাত দুইখানা দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া বাঁ-হাতের সাহায্যে জামা-গেঞ্জি অতিকষ্টে খুলিয়া ফেলিয়া মার হাত দুইখানি আনিয়া নিজের পেটের উপর রাখিলেন। মা "আঃ" শব্দ করিয়া চোখ চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঘোমটা টানিলেন না দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, শরৎ মহারাজ যে আসিয়াছেন তাহা মা বুঝিতে পারেন নাই। ১৮ই এপ্রিল মার জ্বর ত্যাগ হইল, ২১শে এপ্রিল মা অন্নপথ্য করিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মা অন্নপথ্য করিয়াছেন, সকলেই বেশ আনন্দেই আছেন। এমন সময় একদিন পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। শরৎ মহারাজ একখানা চিঠি পড়িয়া রাসবিহারী মহারাজের হাতে চিঠিটি দিয়া বলিলেনঃ "পড়ে দেখ।" রাসবিহারী মহারাজ পড়িয়া সকলকে জানাইলেন—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন।

কয়েকদিন গত হইল। মা দিন দিন দেহে বল পাইতেছেন।

২৯শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে শরৎ মহারাজও আসিলেন। ডাক্তার সতীশবাবু এইদিন কলকাতায় ফিরিলেন।

৫ই মে শ্রীশ্রীমা কলকাতা যাত্রা করিলেন। ঐ রাত্রিতে কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন সকালে পালকিতে যাত্রা করিয়া (৬ই এপ্রিল) বেলা এগারটার মধ্যে বিষ্ণুপুরে ভক্ত সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে পৌঁছিলেন। ৭ই এপ্রিল বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে মা কলকাতায় রওনা হইলেন। সঙ্গে শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, শ্রীমতী সরলা (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) প্রভৃতি আমরা অনেকেই আছি।

গাড়ি বিষ্ণুপুর ছাড়িল। আমরা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর 'দরবার গাড়িতে' উঠিয়াছি। শ্রীশ্রীমা রহিলেন একধারে, পাশে রহিলেন শরৎ মহারাজ,

তার পাশে আমরা। রাত্রি আটটার সময়ে শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিলেন।

মা ঠাকুরঘরে আছেন। পাশের ঘরে রাধু প্রভৃতি। শরৎ মহারাজের ঘরে হরি মহারাজ অসুস্থ। নিচের ঘরে শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) পরপারে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। কেদার-বদ্রী দর্শনে যাইয়া সেই যে 'হিল ডাইরিয়া' আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ১৯শে জুলাই শেষ হইয়াছিল। প্রজ্ঞানন্দ ও শচীন উভয়ে শরৎ মহারাজকে দেখিয়া একসঙ্গে মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে উভয়েই মহাপ্রস্থান করিলেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দ। শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত দশদিন ভূবনেশ্বরে বাস করিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা শরৎ মহারাজ উদ্বোধনে ফিরিয়া আসিলেন। জয়রামবাটীর পত্রে জানিলেন শ্রীশ্রীমা জ্বরে ভুগিতেছেন। সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন মাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে এবং মাকে আনিবার জন্য শ্রীমান প্রিয়নাথ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) শ্রীমান বর্শীশ্বর সেন ও আমাকে জয়রামবাটী যাইতে হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনের গাড়িতে আমরা তিনজনে রওনা হইলাম। পরদিন জয়রামবাটী পৌঁছিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যথাসময়ে মাকে শরৎ মহারাজের প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। মা কলকাতা যাইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে শুভাগমন করিয়াছেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল মায়ের চিকিৎসা করিতেছেন। সেদিন শরৎ মহারাজ বসিবার ঘরে বসিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হইতে বলিলেনঃ "২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। তোমরা সকলকে বলে দিও, কেউ যেন মাকে এ সংবাদ না শোনায়।"

শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর বিরাম না হওয়াতে শরৎ মহারাজ ডাক্তার প্রাণধন বসুকে মায়ের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহার তিন-চার দিন পূর্বে ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত মায়ের রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কালাজ্বরের কোন সন্ধান পাইলেন না। ডাক্তার বসু তিন-চার

বার মাকে দেখিতে আসিয়াছেন, কিন্তু কখনো তিনি কাহাকে চিকিৎসা করিতেছেন জানিতে চাহেন নাই। মা উদ্বোধনে ঠাকুরঘরেই আছেন। একদিন ডাঃ বসু বেদীর উপর সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি দেখিয়া শরৎ মহারাজকে প্রশ্ন করিলেনঃ "আমি কার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছি?" শরৎ মহারাজ বলিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মা-র চিকিৎসার ভার আপনার উপর অর্পিত।" ডাঃ বসু ঠাকুরঘরে বসিয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু নিচে নামিয়া আসিয়া অনুযোগের ভাষায় শরৎ মহারাজকে বলিলেনঃ "একথা দয়া করে আপনার পূর্বেই জানানো উচিত ছিল।" সেই দিন হইতে ডাঃ বসু দর্শনী টাকা (visit) নেওয়া বন্ধ করিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ যত্নের সহিত মায়ের চিকিৎসায় ব্রতী হইলেন।

৬ই মে সকালবেলা পূজনীয় ধীরানন্দ স্বামীজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) শরৎ মহারাজের নিকট বলিয়া গেলেনঃ "কাল বিকেল থেকে রামের (বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু) পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত রাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে একটুও ঘুমোতে পারে নাই।" রামকৃষ্ণ বসু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। রামবাবুর পিতা বলরামবাবু ঠাকুরের ভক্ত। ডাক্তার, বৈদ্য যথাসাধ্য দেখানো হইল। ঔষধ, পথ্য, সেবা কোনটারই ত্রুটি রহিল না। রোগ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে ১৪ই মে অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ রামবাবু নাম-গানের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হইলেন। শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মঠের অনেক সাধুসন্ত সেই সময় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখ বাড়িয়া যাইতেছে, এই সময় রামকৃষ্ণ বসুর দেহরক্ষার সংবাদ মাকে জানানো হইবে না স্থির হইল। কিন্তু গোলাপ-মার পেটে কোন কথা থাকিত না। তিনি লাটু মহারাজের ও রামবাবুর দেহরক্ষার সংবাদ মাকে জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ রোজনামচায় লিখিয়াছেন—"H. M's (Holy Mother's) fever rose to 100°. She had a bad night... all due to hearing the sad news about Ram".—অর্থাৎ শ্রীশ্রীমার জ্বর ১০০ ডিগ্রী উঠিয়াছে, রাত্রিতে ঘুম হয় নাই... এই জ্বর বৃদ্ধি প্রভৃতি সকলই

রামের দেহরক্ষার সংবাদ তাঁহার কানে যাওয়ার ফল।

শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর যখন কিছুতেই দূর হইতেছে না তখন শরৎ মহারাজ ১লা জুন হইতে কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। মায়ের শিষ্য ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রত্যহ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মোটর যোগে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। একদিন মা মুড়ি ও ছোলাভাজা একটি বাটিতে লইয়া খাইবেন বলিয়া বসিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া শরৎ মহারাজ আসিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মা ইতিমধ্যে মুড়ির বাটি পিছনে রাখিয়া দিলেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া করজোড়ে মাকে বলিলেন ঃ "মা আপনার নিকট ঐ বাটিটি ভিক্ষা চাই।" মা অম্লান বদনে সেই বাটিটি শরৎ মহারাজের হাতে তুলিয়া দিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে ঐ প্রকার জিনিস মাকে খাইতে না দিলেও মায়ের মুখের গ্রাস ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শরৎ মহারাজ যে কতদূর মনোকষ্টে ছিলেন তাহা একদিন প্রকাশ পাইয়াছিল। সেকথা যথাসময়ে বলিব।

কবিরাজী চিকিৎসার সঙ্গে যত রকম ব্যবস্থা ছিল তন্মধ্যে জল সিদ্ধ করিয়া যখন এক সের জল আধসের হইবে সেই জল ঠাণ্ডা করিয়া মাকে পান করাইতে হইবে এই ব্যবস্থাও ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি একদিন শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম ঃ "পাড়াগাঁয়ে এই রকম জল সিদ্ধ করলে মাটির ভাগ বেশি পাওয়া যাবে, কলকাতার জলে ফিটকিরির ভাগ বেশি পাওয়া যাবে (তখন আষাঢ় মাস)। কবিরাজ কি তাই চান?" শরৎ মহারাজ শান্তভাবে বলিলেন ঃ "এখন কি আমাদের বিচার করবার সময়? কবিরাজ মশায় যেমনটি বলেন ঠিক তেমনটি করা আমাদের কর্তব্য।" আমি লজ্জিত হইয়া আপন কাজে চলিয়া গেলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখ বৃদ্ধির সঙ্গে মাকে দর্শন করিবার ব্যবস্থারও (ভক্তদের ভক্তির দৌরাত্ম্যে) অদল বদল করিতে হইত। একদিন এক ভক্ত মাকে দর্শন করিতে যাইয়া মায়ের একখানি পা টানিয়া বুকের উপর স্থাপন করিলেন। পায়ে হাত দিতেই মা—"ওকি গো" বলিয়া উঠিলেন। পাশে যিনি সেবক ছিলেন তিনি যাইয়া ভক্তটির হাত ধরিয়া নিচে লইয়া

গেলেন। সংবাদ শুনিয়া শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহাকে জানাইয়া যেন ভক্তদের দর্শনের জন্য ঠাকুরঘরে পাঠানো হয়। এইসময় ব্যবস্থা হইল বাহির হইতে দর্শন করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিলেন। ইতিপূর্বে কেহ তাঁহাকে মায়ের কাছে আসিতে দেখেন নাই। স্ত্রীলোকটি মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলভাবে শরৎ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজ জনৈক সাধুর নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেনঃ "ওকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে দাও।" সেই সাধু তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য একজন সদ্য-আগত ব্রহ্মচারীর উপর দর্শন করাইবার ভার দিলেন। সহসা ঠাকুরঘর হইতে যোগীন-মা চীৎকার করে বলিয়া উঠিলেনঃ "শরৎ তুমি কাকে ওপরে পাঠালে?" যিনি এই কথা শুনিলেন তিনিই ঠাকুরঘরের দিকে ছুটিলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সেই স্ত্রীলোকটি মায়ের শ্রীপাদ বুকে ধারণ করিয়া আর্তনাদ করিতেছে। তখন একজন সাধু যাইয়া স্ত্রীলোকটির হাত হইতে মায়ের শ্রীপাদ ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া নিচে লইয়া আসিলেন। এই ঘটনায় গোলাপ-মা বলিয়াছিলেনঃ "পাথরের ঠাকুর পূজা করা সহজ, সে ঠাকুর কোনদিন কিছু বলেন না, কিন্তু মানুষ ঠাকুর পূজা করা বড়ই কঠিন, এ দেবতা যে কথা বলেন।" স্ত্রীলোকটিকে বুঝাইয়া বিদায় করা হইল।

স্ত্রীলোকটি বিদায় লইবার পরে শরৎ মহারাজ পূর্বোক্ত সাধুকে বলিলেনঃ "বাপু, তোমরা যদি কথামত কাজ করতে না পারবে তবে মঠে গিয়ে থাক।" যাহাকে শরৎ মহারাজ একথা বলিলেন তিনিও শরৎ মহারাজকে অন্য কাহারও অপেক্ষা কম মান্য, কম শ্রদ্ধা করেন না, অথবা পরিশ্রমের কাজে তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং এই কথা শুনিয়া সেই সাধু শরৎ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ "মার জন্য এখানে থাকা, মা যদি ভাল না হন সেই দণ্ডে এখান থেকে চলে যাব জানবেন।" এইরকম কথা প্রাচীনগণের পক্ষে হজম করা বড় সহজ নহে। কথাটা শুনিয়া আমাদেরও রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শরৎ মহারাজ শান্তভাবে বলিলেনঃ "আমরা সকলেই মার সেবার জন্য এখানে আছি, যাতে মার কোন অসুবিধা না হয় তারই জন্য বলা-বলি,

নতুবা তোমরা যে দেখে শুনে সব করতে পার তা কি আর আমি জানি না।"

শরৎ মহারাজ বিলক্ষণ জানিতেন যাহারা তাঁহার কথায় উঠে বসে সেই সাধু তাহাদেরই একজন। শরৎ মহারাজের দেহরক্ষার পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সেই সাধু অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে উদ্বোধনে বসিয়া একদিন বলিয়াছিলেনঃ "আমার ঐ কথা তিনি ভিন্ন অপর কেউ সহ্য করতেন কিনা বলা বড়ই কঠিন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন শ্রীশ্রীমা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ঃ "ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটিকে কে নেয়?" শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত কৃপা দেখিয়া আমাদিগকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিত—তিনি মন্দটিকে গ্রহণ করিবার জনাই যেন আসিয়াছেন, আর মায়েরই সঙ্গে আসিয়াছেন স্বামী সারদানন্দ। যে-সাধুটিকে কেহ আশ্রমে রাখিতে চাহেন না, যাহাকে লইয়া সকলে অতিষ্ঠ, শরৎ মহারাজ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন বাহির হইতে সকলেই পাইবেন এই ব্যবস্থা হইল।

মহাপ্রস্থানের পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে, রাত্রি দশটার সময় যখন শ্রীমতী সরলা মাকে খাওয়াইতে আসিলেন তখন মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ "আমি তোমাদের হাতে খাব না, আমার বাবার হাতে খাব।" 'বাবার হাতে খাব' এই কথার অর্থ কেহই ভাল বুঝিতে না পারায় কথাটি সরলা যাইয়া শরৎ মহারাজকে বলিলেন। শরৎ মহারাজ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া ডাকিলেনঃ "মা!" মা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, শরৎ মহারাজ বিছানার পাশে (বিছানা তখন মেঝেয় পাতা ছিল) আসিয়া বসিয়া আছেন। মা কাঁদিয়া বলিলেনঃ "বাবা, ওরা আমায় খেতে দেয় না, আমি তোমার হাতে খাব।" শরৎ মহারাজ মায়ের মুখে ধীরে ধীরে দুধ দিতে লাগিলেন, মাও শান্ত হইয়া তাহা পান করিতে লাগিলেন। দুধপান শেষ হইলে মা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করিলেন। শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে মায়ের হাতে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

আজ মনে হইতেছে ঐ যে কর্তব্যের অনুরোধে শরৎ মহারাজ মায়ের

মুখের গ্রাস মুড়ি ও ছোলা ভিক্ষা করিয়া লইয়া মনে মনে ভীষণ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন, মা তাঁহার মনের সেই ক্ষত এইভাবে দূর করিয়া গেলেন। নতুবা 'বাবার হাতে খাব' এমন কথা তো কেহ তাঁহাকে কখনো বলিতে শোনেন নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের কবিরাজি চিকিৎসাও বিফল হইল। অবস্থা দিন দিন সঙ্কটজনক হইতেছে দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না যে, মা ঠাকুরের সহিত অচিরে মিলিত হইবেন। সুতরাং এই আশঙ্কার সংবাদ ভক্তগণের নিকট প্রেরিত হইল। দলে দলে সাধু, গৃহী, ভক্তগণ মাকে দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে আসিতে লাগিলেন। মায়ের মহাপ্রস্থানের তিনদিন পূর্বে কবিরাজি চিকিৎসা বন্ধ করা হইল। ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চলিতে লাগিল। ১৯শে জুলাই শরৎ মহারাজের প্রথম দাঁত পড়িল। সেই দাঁতের কথায় তিনি বলিয়াছিলেনঃ "দেখ আমাদেরও ডাক পড়েছে।" ঐ কথা শুনিয়া লাটু মহারাজের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেনঃ "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), শরৎ সকলেই ঘরমুখো হয়েছেন।"

আজ ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ সাল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঠ ও নানাস্থান হইতে সাধু ও ভক্তগণ দলে দলে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—সকলেই মুহ্যমান। এত লোকের সমাগম, তবু উদ্বোধনে কোন শব্দ নাই, নীরবে যে যাহার কাজ যন্ত্রের ন্যায় করিয়া যাইতেছেন। আজিকার রাত্রি যে কাটিবে সে-আশা আমাদের অনেকেরই ছিল না। ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল মা ততই যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিলেন। রাত্রি একটার সময় নাম শোনানো আরম্ভ হইল। দেড়টার সময় মা কৈলাসে গমন করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া 'মা' ডাকা চিরদিনের মতো শেষ হইল।

পরদিন বেলা দশটার সময় উদ্বোধন হইতে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া শরৎ মহারাজ মঠে যাত্রা করিলেন। বেলা যখন তিনটা, সকল কাজ শেষ হইয়া গেল, তখন এক পশলা মাঠ ভাসানো বৃষ্টি আসিয়া ধরিত্রীকে শীতল করিয়া দিল। সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ মহারাজ উদ্বোধনের সকলকে সঙ্গে

করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মায়ের মহাপ্রস্থানের পরে শ্রীশ্রীমহারাজ একদিন বলরামবাবুর বাড়ি হইতে উদ্বোধনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন তারপর বলিলেনঃ "মহারাজ! মায়ের অসুখের সময় একদিন মা মুড়ি ও ছোলা ভাজা খেতে বসেছিলেন সে সংবাদ পেয়ে আমি এসে মার কাছ থেকে তা ভিক্ষা করেছিলাম। মাকে মুড়ি ও ছোলা ভাজা খেতে দিই নাই। আজ তোমাকে খাইয়ে, মাকে মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে হয়েছে।" কথা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে হাসিয়া মহারাজ বলিলেনঃ "নিয়ে এসো, আজ মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাব।"

মহারাজ আনন্দ করিয়া মুড়ি ও ছোলা ভাজা খাইতেছেন। শরৎ মহারাজ বুকের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া সজল নয়নে খাওয়া দেখিতেছেন। যখন মহারাজের মুড়ি খাওয়া শেষ হইল, শরৎ মহারাজের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎ মহারাজ মহারাজের প্রসঙ্গে আমাদের বহুবার বলিয়াছেনঃ "মহারাজের মধ্যেই ঠাকুর, মা রয়েছেন। মহারাজের সেবা, ঠাকুর ও মার সেবা বলে বিশ্বাস করবে।"

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে শরৎ মহারাজ কাশীধামে আসিয়াছিলেন। আমরা সেসময় ঢাকা শহরে ছিলাম। সেই সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সেবকগণের নিকট পরে যেমন শুনিয়াছিলাম তাহা যথাযথ বিধিবদ্ধ করিলামঃ

একদিন উভয় আশ্রমের সাধুগণ শরৎ মহারাজের নিকটে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন এমন সময় একজন সাধু শরৎ মহারাজকে বলিলেনঃ "মহারাজ! অমুক মার নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধু হয়েছিলেন, কিন্তু শেষটায় তাকে বিয়ে করতে হলো কেন?" কথা বলিবার দোষে কণামাত্র অগ্নিস্পর্শে বারুদের স্তূপ যেমন জ্বলিয়া উঠে তেমনি শরৎ মহারাজ এত সহনশীল এত গম্ভীর, এত চাপা প্রকৃতির হইয়াও জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেনঃ "কি বললে তুমি?" আক্ষেপকারী সেই রুদ্ররোষের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া রহিলেন। তখন শরৎ মহারাজ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেনঃ

"মা কখন কাকে কোন্ পথ দিয়ে টেনে নেবেন তা যখন আমরা কেউ জানি নে, কার কোন্ বাসনা কিভাবে পূরণ করিয়ে মা কেমন করে তাঁর ছেলেদের গতি মুক্তি দেবেন তা যখন কেউ বুঝতে পারি নে, তখন কে কি করলে না করলে সেদিকে দৃষ্টি না রেখে, লোকের দোষ দর্শন না করে যাতে আমাদের ঠাকুর ও মায়ের পাদপদ্মে মতি থাকে তার জন্য দিন রাত প্রার্থনা করা কর্তব্য। আমি তো বাপু তাকে মন্দ বলতে পারলাম না কিংবা সে অন্যায় করেছে সেকথাও মনে আনতে পারিনি। তুমি আমি সকলেই মায়ের হাতে খেলে যাচ্ছি। তিনি যাকে যেমন ইচ্ছা তাকে দিয়ে তেমন খেলিয়ে নিচ্ছেন। বেশি আর কি বলব—খুঁটি ধরে যার যেমন ইচ্ছা ঘুরতে থাকো, কিন্তু খুব সাবধান! খুঁটি ছেড়ে দিয়ে ঘুরতে যেও না, মুহূর্তে তলিয়ে যাবে।" কিছুক্ষণ স্তব্ধের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিয়া গদগদভাবে বলিতে লাগিলেনঃ "তাঁর লীলা, তাঁর খেলার সামান্য মাত্রও বুঝতে পারলেম না। জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে মাত্র এই বলতে পারি—" পর্যন্ত বলিয়া তাঁহার কথা ফুরাইল। তিনি সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেনঃ

"রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি,
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুইবেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা—বুঝতে পেরেছি।"

উদ্বোধন, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। সন্ধ্যার পর শরৎ মহারাজ নিচে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শরৎ মহারাজ ভক্তটির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভক্তটি সকল কথার উত্তর দিয়া শেষে বলিলেনঃ "মহারাজ, ঠাকুর যে অবতার তা না হয় তাঁর দিব্যভাব দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী সে কথা মনে আনতে পারি না কেন?" শরৎ মহারাজ বলিলেনঃ "ঠাকুরকে যদি ভগবান বলে বিশ্বাস করতেই পেরে থাক, তবে এ-সন্দেহ তোমার আসে কেন?"

ভক্তটি শান্তভাবে বলিলেনঃ "মহারাজ, আমার এ-সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ বলিলেনঃ "তাহলে বল, ঠাকুরকে অবতার বলে তোমার ঠিক ধারণা হয়নি?" ভক্ত বিনীতভাবে বলিলেনঃ "না মহারাজ, ঠাকুরে সে-বিশ্বাস আমার আছে।" শরৎ মহারাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেনঃ "তোমার তাহলে বিশ্বাস, ভগবান একটি ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন?" ভক্তটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে বলিলেনঃ "আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমার সংশয় দূর হয়েছে।"

শরৎ মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অনেকেই শুনিয়াছিলেন। কিন্তু 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘর' ঠাকুর যেমন বলিতেন, "একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে আলো হয়ে থাকে"—তেমন ভক্তটির সংশয় এই এক কথাতেই দূর হইল অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন কিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য ভক্ত আনন্দে বলিয়াছিলেনঃ "মহারাজ, আমার সংশয় দূর হয়েছে"—বুঝিতে পারিলাম না। আমরা দেখিলাম, শরৎ মহারাজ উজ্জ্বল মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। ভক্তের চোখ দুইটি আনন্দে মুদিতপ্রায় হইয়াছে। সেদিন কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। যেন সকলেই ধ্যানমগ্ন, যেন বাহ্য-জগতের সহিত সকলেই সম্পর্ক হারাইয়া কেহই কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ❑

সংগ্রহ ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সৌজন্য ঃ ব্রহ্মগোপাল দত্ত

মাতৃসান্নিধ্যে

স্বামী মহাদেবানন্দ

স্বামী মহাদেবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম মতিলাল চৌধুরী। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) ছিলেন তাঁর অগ্রজ। তাঁর জন্ম বাঁকুড়া জেলার কোয়ালপাড়া গ্রামে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে স্বামী শিবানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কয়েক বছর তিনি ঢাকা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়াতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন করেন। সেখানেই ৫/৩/১৯৪৭ তারিখে ৫৬ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়।—**সম্পাদক**

কোয়ালপাড়ায় তখন স্বদেশী ভাবের জোয়ার। আমরা তরুণেরা সেই পথেই চলেছি। কোতুলপুরে স্বদেশীদের আখড়া ছিল। বিষ্ণুপুর, ইন্দাস-আরামবাগ থানা থেকে পুলিশের টহল কোয়ালপাড়াতেও লেগে থাকত। শ্রীশ্রীমা যখন কোয়ালপাড়া দিয়ে কলকাতা যাতায়াত শুরু করলেন এবং কেদারবাবুর বাড়িতে (পরে 'জগদম্বা আশ্রম') থাকতে শুরু করলেন তখন থেকেই আমাদের ভাবের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। আমি আশ্রমের কাজে যুক্ত হয়েছি। আমাদের মাস্টার মশায় কেদারবাবু আমাকে ডেকে একদিন বললেনঃ "মতি, একবার মায়ের কাছে ঘুরে আয় তো; ওঁর যদি কিছু প্রয়োজন হয়।" মা তখন কেদারবাবুর বাড়িতে তাঁর ঘরে অতিথিদের নিয়ে রয়েছেন। কেদারবাবুর কথামতো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। রাস্তায় যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগল, স্বদেশী ছেড়ে এসে কি ভাল করছি? না, আবার স্বদেশীই করব? আবার পরক্ষণেই মনে হলো, যে-আদর্শের এখন সন্ধান পেয়েছি তা-ই তো মহত্তর আদর্শ। এইরকম দোটানায় মন তখন চঞ্চল। ভাবতে ভাবতে কেদারবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেছি। আমার

সম্বিত ফিরল মায়ের ডাকেঃ "কী বাবা মতি? কেদার কিছু বলে পাঠিয়েছে?" আমার চেতনায় কে যেন সজোরে আঘাত করল। আমি যে অস্থির ভাবনায় জর্জরিত হচ্ছিলাম, মায়ের কণ্ঠস্বরে যেন তার উত্তর পেয়ে গেলাম। মায়ের কথার উত্তরে বললামঃ "না মা, মাস্টার মশায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানতে পাঠালেন।" মা স্মিতহাস্যে বললেনঃ "না বাবা, সব ঠিক আছে।"

আমি মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মা মাথায় হাত রেখে বললেনঃ "বাবা, ওসব আজে-বাজে ভাবনায় কাজ নেই। যে পথে এসেছ, সেটাই ঠিক পথ। আমি তোমায় বলছি। এখানেই মন স্থির করে থাক। ঐরকম হঠকারিতায় দেশের কাজ কি কিছু হয় বাবা? মনকে গড়ে তোলো। তারপর যদি কিছু করার থাকে, ঠাকুরই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন।"

মা একটানা কথাগুলি বলে গেলেন। যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরাও শুনলেন। কিন্তু কেউই জানতে পারলেন না হঠাৎ মা কেন এসব কথা আমাকে বললেন। কিন্তু আমি ভালভাবেই বুঝলাম যে, মায়ের কাছে মনের কথা লুকানো যায় না। মা অন্তর্যামিণী। তারপর থেকেই স্বদেশীর ভাবনা মন থেকে চিরতরে চলে গেল।

মায়ের কথা কি বলে শেষ করা যায়? দাদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও একান্ত অনুগত সেবক কিশোরী মহারাজ) যখন কোয়ালপাড়া আশ্রমের কাজে ব্যস্ত হলেন, আমার ভাল লাগেনি। এই পথেই যে আমারও ভবিতব্য এতটুকু ধারণা হয়নি সেসময়। ভাবতাম—পূজা ধ্যান করে কি হবে? সেভাবেই চলতুম। তারপর শ্রীশ্রীমার কোয়ালপাড়া যাতায়াত চলল। সকলেই যাচ্ছে, সেই কৌতূহলে আমিও আশ্রমে যেতুম। উৎসবে কিছু কাজ করতুম। স্বামীজীর বই পড়তে ভাল লাগত। ছবিও কাছে রাখতুম। সেটা হবে দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেছি। তখন আমার গর্ভধারিণী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেই সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে

উঠে দাঁড়ালাম। মা আমার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে আমার প্রয়াতা গর্ভধারিণীকে দেখতে পেলাম। পরম বিস্ময়ে আমি আবার মায়ের চরণে প্রণাম জানাতে মা বললেনঃ "কী হলো রে মতি, এই তো প্রণাম করলি!" আমি বললামঃ "তা হলোই বা।" মা আর কিছু বললেন না, মৃদু হেসে বললেনঃ "ক্ষ্যাপা ছেলে!"

আমার দীক্ষার ঘটনাও আশ্চর্য। আশ্রমে যোগ দিয়েছি। আশ্রমে আছি, কাজকর্ম করছি। কিন্তু দীক্ষা নিতে হবে এবং সন্ন্যাস নেওয়া দরকার—এসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আশ্রমের বড়রা যেমন নির্দেশ করেন সেইমতো কাজ করি। গানবাজনা, ভজন এইসব নিয়ে ঠাকুর-মায়ের নামগান করে কেটে যায়। সম্ভবত সেটা ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস। মা তখন জয়রামবাটীতে। মা জুঁইফুল ভালবাসতেন। দেশড়ায় কী একটা কাজে যেতে হয়েছিল। সেখানে ঘোষেদের বাড়ির বাগানে খুব জুঁইফুল হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা হতে লাগল যে, ওদের বলে বাগান থেকে কিছু ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে মাকে দিই। কী আশ্চর্য, আমি বার বার বাগানের দিকে তাকাচ্ছি দেখে গৃহকর্তা বললেনঃ "এ-বছর খুব জুঁই হয়েছে। তোমাদের আশ্রমের জন্য কিছু ফুল নিয়ে যাও! ঐ কলাপাতা কেটে তাতেই নিয়ে যেও।" আমি আর দেরি করলাম না। ভাল ফুল দেখলেই আমার মালা গাঁথার ঝোঁক জাগে। আমি সেই ফুলগুলো নিয়ে সোজা জয়রামবাটী হাজির হলাম। মামীদের কাছ থেকে ছুঁচ-সুতো নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে দুটি মালা গাঁথলাম। কেন দুটো মালা গাঁথলাম তা জানি না। তারপর মালা দুটোর ওপর পুকুর থেকে জল ছিটিয়ে দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। মা তখন স্নান সেরে পুজোয় বসেছেন। আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে মালা দুটো তাঁর পাশে রাখতেই মা বললেনঃ "বাঃ, খুব সুন্দর মালা হয়েছে।" তারপরই বললেনঃ "মতি, তুমি স্নান সেরে তাড়াতাড়ি এস। আজ তোমাকে দীক্ষা দেব।" আমিও যন্ত্রবৎ স্নান সেরে মায়ের কাছে হাজির হলাম। পাশে পাতা আসনে মা বসতে নির্দেশ দিলেন। তারপরেই মা

মন্ত্রদান করলেন। আমার গাঁথা জুঁইয়ের মালার একটি মালা মা ঠাকুরকে পরিয়ে দিলেন। মন্ত্রদানের পর বললেনঃ "পুষ্প নিবেদন কর।" আমি পাশে রাখা অপর মালাটি মায়ের পদপ্রান্তে রেখে প্রণাম জানালাম। মা তাঁর দুই পদ্মহস্ত আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। বুঝলাম, মায়ের করস্পর্শে আমার জন্মান্তর হলো। * ❑

সংগ্রহঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* স্বামী মহাদেবানন্দের মাতৃস্মৃতিটি তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী মহেশ্বরানন্দের (ডাক্তার মহারাজ) সঙ্গী, সহযোগী ও সহকর্মী ডাঃ চৈতন্যময় মণ্ডল। ডাঃ মণ্ডল ২৭.১.২০০৫ তারিখে ৯৫ বছর বয়সে প্রয়াত হন।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

স্বামী জপানন্দ

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকের কথা। কয়েক মাস আগে বাবুরাম মহারাজের শরীর গেছে। স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ তখন বেলুড় মঠের কাজকর্ম দেখতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারীদের দেখাশোনা করতেন। বেলুড় মঠে তখন খুব অভাব-অনটন। তার ওপর ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ। ঔষধ ও পথ্য ঠিকমতো জুটত না। পথ্যের মধ্যে লেবুর রস-সহ সাগু, বার্লি। দুধ ক্বচিৎ জুটত। এককালে ৬-৭ জন সাধু ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন।

একদিন আমি ও একজন সাধু উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাই। আমরা মাকে প্রণাম করে দাঁড়াতে মা আমার সঙ্গী সাধুটিকে দেখে খুব ব্যথিত কণ্ঠে বললেনঃ "বাবা, তোমার এরকম চেহারা হলো কি করে? তোমার কত ভাল শরীর ছিল!" সাধুটি বললেনঃ "ম্যালেরিয়ায় ভুগে, মা। মঠে বড় কষ্ট এবং অভাব। সেখানে পথ্য বলতে বার্লি ও লেবুর রস। দুধ জোটে না। অনেকেরই এখন ম্যালেরিয়া হচ্ছে মঠে।"

মঠের ছেলেদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে মা ক্ষোভে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। তিনি ওপরের বারান্দা থেকে তীব্র চিৎকার করে ডাকলেনঃ "শরৎ! শরৎ!" মা সাধারণত লোক দিয়ে শরৎ মহারাজকে ডাকাতেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলতেন। তাঁর এরূপ উচ্চকণ্ঠ কেউ কখনো শোনেনি। তাই মায়ের উত্তেজিত কণ্ঠে সবাই চমকে উঠল। সারা বাড়ি যেন কম্পমান! শরৎ মহারাজ ভাবলেন—কী জানি এক গুরুতর কাণ্ড ঘটে গেছে। মা তো কখনো এমন করে ডাকেন না!

শরৎ মহারাজ মোটা মানুষ। নিচের অফিসঘর থেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। আমরা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে

করজোড়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেনঃ "বলুন মা, কী হয়েছে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে মা বললেনঃ "এসব কী শুনছি, শরৎ! বেলুড় মঠে ছেলেরা অসুখে ভুগে ভুগে শেষ হচ্ছে—ঠিকমতো পথ্য জোটে না। শুধু বার্লি ও লেবুর রস খেয়ে বাঁচবে কি করে? সবে বাবুরাম চলে গেছে—ছেলেদের কেউ দেখছে না। তোমরা যদি কোন ব্যবস্থা করতে না পার...। " শরৎ মহারাজ বললেনঃ "আপনি শান্ত হোন, মা। আমরা এখুনি ব্যবস্থা করছি।" আমরা উভয়ে খুব অপ্রস্তুত হলাম।

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেসময় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। শরৎ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে এবং সব ঘটনা তাঁকে জানালেন। সব শুনে অচঞ্চল মহারাজও বিচলিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সচিব অমূল্য মহারাজকে (স্বামী শঙ্করানন্দকে) ডেকে শ্যামবাজার মার্কেট থেকে সবজি, চাল-ডাল-আটা-চিনি-সুজি-ঘি ও নানারকম সওদা কিনিয়ে নৌকা করে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেন। শরৎ মহারাজ এসে মাকে সব জানালেন। মা শান্ত হলেন।[১]* ❏

১ স্মৃতিকথাটি **স্বামী চেতনানন্দের** (বর্তমানে আমেরিকাস্থ সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ) কাছে প্রাপ্ত। ১৯৭০ সালে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী জপানন্দজী কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে এই স্মৃতিচারণ করেন। স্বামী চেতনানন্দ স্মৃতিচারণটি আনুপূর্বিক তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন।—**সম্পাদক**

*** উদ্বোধন, ৯৮তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৩, পৃঃ ২৯৬**

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

১৯১৪ সালের প্রথম দিকে বেলুড় মঠে আসি। বগুড়া থেকে শিয়ালদা ট্রেনে এসে সালকিয়া হয়ে বেলুড় মঠে আসি। মাঘ মাস—বেলা দুটো। আবার বয়স তখন ১৬ বছর। মঠে তখন বাবুরাম মহারাজের আমল। তাঁর দয়াতে মঠে স্থান পাই। যাই হোক, মাঘ মাস গেল, ফাল্গুন মাস এল। ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল।

ঠাকুরের তিথিপূজা এসে গেল। তিথিপূজার দিনের কথা আমার তত মনে নেই, বোধহয় ভজনগান-টান হয়েছিল। তবে উৎসবের কথাটাই আমার বেশ মনে আছে। চতুর্দিকে লোকের ভিড়। বাঁশের ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে চতুর্দিকে। একদিকে ভজন হচ্ছে, একদিকে কালীকীর্তন। একটি দিব্যভাব চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি ঠাকুরঘরের কাজ করছি আর মাঝে মাঝে বাইরে এসে দেখছি লোকের ভিড়। ভিড় আমি বড় ভয় করি। একবার কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে ভিড়ের মাঝে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, এই ভিড় দেখছি যখন, তখন হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মুখে দাড়ি, খালি গা, ধুতির খুঁটটি কাঁধে ফেলা। এসে সস্নেহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "এইদিকে আয়। খিদেতে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। দাঁড়া দাঁড়া।"—বলে তিনি কোথা থেকে কিছু খাবার নিয়ে এলেন। তাতে যতদূর মনে পড়ে, কিছু বোঁদেও ছিল। তিনি সস্নেহে আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে লাগলেন আর আমার সর্বাঙ্গে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, আমি কিছুই জানি না। তিনি চলে গেলেন—তাও কিছু বুঝতে পারলাম না। যখন খেয়াল হলো, সন্দেহ হলো—তখন ভিড়ের মধ্যে তাঁকে কত

খুঁজলাম, কিন্তু আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। স্বয়ং ঠাকুরই কি আমাকে ঐভাবে কৃপা করতে এসেছিলেন! একটু সন্দেহ যেন এখনও রয়ে গেছে। এখনও ভাবি কি করে এ-ঘটনা সম্ভব হলো। সারাদিন খাওয়া দাওয়ার বালাই ছিল না। আমি কোথাও গান শুনেছি, ভিড় দেখেছি আর ঠাকুরঘরের কাজ করেছি। এইরকম করে সারাদিন বেশ আনন্দে কেটেছে। অহরহ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আমার মন সেইদিন। সন্ধ্যার পর, বোধহয় আরতির আগে বা পরে আমার ঠিক মনে নেই। শুনলাম, মা এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্ছেন। চন্দনগাছ ও নাগরী নামক গাইয়ের কাছে একটা গাড়ি দাঁড়ানো। তাতে মা যাবেন শুনে দৌড়ে গেলাম। গাড়িতে মা তখন উঠে গেছেন। আমি গাড়ির দরজা খুলে 'মা মা' বলে একবারে মায়ের পায়েই হাত দিলাম। মা-ও "এস বাবা, এস" বলে আমায় অভয় দিলেন। আশ্চর্য এই যে, আমি মাঠাকুরানীকে আগে কখনও দেখিনি, অথচ ঠিক মাতৃপদেই আমার প্রণাম নিবেদিত হলো। এই সন্ধ্যে থেকে—মাকে প্রণাম করে যখন এলাম—তখন আস্তে আস্তে ভিড় কমে যাচ্ছে, আমি একলা পায়চারি করছি আর 'মা-মা' বলে আমার অন্তরের সেই মাকেই আহ্বান জানাচ্ছি। আমার দু-নয়ন থেকে আনন্দাশ্রু পড়ছে। অপূর্ব এক ভাবাবেগে আমার মনপ্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এরকম ভাবের আস্বাদন আর কখনও আমি পাইনি। সমস্ত দিনরাতই কী আনন্দে যে আমার কেটেছে সেটা বোঝাতে পারব না।

চৈত্র মাস। একদল ছেলে আহিরীটোলা থেকে সাঁতার কেটে বেলা প্রায় আড়াইটে তিনটের সময় মঠের ঘাটে এসে উঠল। ভিজে কাপড় এবং একখানা গামছা তাদের সম্বল। বাবুরাম মহারাজ তাদের দেখে স্নেহে বিগলিত হয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেদের জন্য কাপড় দিতে বললেন আমাদের। তখন অতিথিদের জন্য মঠে কাপড় রাখা থাকত। ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে তিনি তাদের বসতে দিলেন। আমরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করছিলাম। তাই আমাদের আর কিছু না বলে তিনি নিজেই রান্নাঘরে—উনুনে তখনও অল্প আগুন ছিল, তাতে কয়লা দিয়ে উনুন ধরিয়ে—খিচুড়ি বসাবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। বাবুরাম

মহারাজ রান্নাঘরে গেছেন—আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাড়াতাড়ি করে গেলাম সেখানে। বললামঃ "মহারাজ, কি করছেন! আমাদের বলুন কি করতে হবে, আমরা করে দিচ্ছি।" বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ "তোরা সারাদিন খেটেছিস, আবার এসব করবি তোরা!" আমরা জোর করাতে উনি আমাদের বলে দিলেন সব তরকারি (তখন যা পাওয়া যায়) দিয়ে খিচুড়ি করতে আর তার সঙ্গে একটু ভাজা। রান্না হয়ে গেলে ঠাকুরের সামনে খাবার ধরে বললেনঃ "ঠাকুর, ছেলেরা এসেছে। তাদের একটু খাবার ব্যবস্থা করা হলো। তুমি একটু খেয়ে প্রসাদ করে দাও। তোমার প্রসাদ ছেলেরা খাবে।" তখন মঠে সর্বত্র ঠাকুরের পট থাকত। তারপর বাবুরাম মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন তাদের। তাদের খাওয়া শেষ হতে বেলা প্রায় চারটে-সাড়ে চারটে হলো। তারপর তাদের নিয়ে বসে ঠাকুরের গল্প আরম্ভ করলেন।

বৈশাখ মাস। অক্ষয় তৃতীয়া।[১] পূর্ববঙ্গের গুটিকয়েক ছেলে এসেছেন দীক্ষার জন্য। কেষ্টলাল মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা এসেছেন মাঠাকুরানীর কাছে দীক্ষার জন্য। কেষ্টলাল মহারাজের ইচ্ছা আমিও দীক্ষা নিই। কিন্তু আমি তাঁকে দীক্ষার জন্য বলিনি। কেষ্টলাল মহারাজ নিজে থেকেই বললেনঃ "তুই এখন ভাবছিস বোধহয় আমি শুধু রইনু বাকি? তা দীক্ষা নিবি?" আমি সে কথায় কোন সাড়াশব্দ করিনি। এই কথাটা হলো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর। আমি সকালবেলা উঠে ঠাকুরঘরের কাজ করছি, সে-সময় হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ এসে বললেনঃ "যা বেটা, মার কাছে বলি হয়ে আয়।" আমি কথাটা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ "ওরে যা, দীক্ষা নিয়ে আয় মার কাছ থেকে।" ভেতরে ভেতরে আমার একটা ইচ্ছা বাবুরাম মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেব। আমাকে নীরব দেখে উৎসাহের সঙ্গে তিনি বললেনঃ "মা-ই আমাদের সব। মায়ের কৃপা পাওয়া মানে ঠাকুরেরই কৃপা পাওয়া। মাকে দেখা ঠাকুরকে দেখা—এক।" কেষ্টলাল মহারাজ সেসময় সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বাবুরাম মহারাজ

১ তারিখটি ছিল ২৮ এপ্রিল ১৯১৪।—**সম্পাদক**

বললেনঃ "যাও কেষ্টলাল, এটাকেও নিয়ে যাও।" তারপর গঙ্গার ঘাটে আমরা উপস্থিত হলাম। পানসি নৌকাতে করে আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠলাম। আমাদের ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান হয়ে গিয়েছিল। কেষ্টলাল মহারাজ আমাদের নিয়ে উদ্বোধনে উপস্থিত হলেন। আমার মনে আছে ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও একজন দীক্ষার্থী। নারায়ণ ও দীনেশ বলে পূর্ববঙ্গের দুটি ছেলে ছিলেন। আমরা মোট পাঁচজন ছিলাম। তারপর একে একে আমাদের দীক্ষা হলো। আমি দেখলাম আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জিনিসপত্র নিয়ে মায়ের কাছে গেছেন। আমি কিছুই সঙ্গে নিইনি। মা আমাকে দীক্ষা দেওয়ার পর মাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "সকলেই তো আপনাকে অনেক কিছু দিল। আমার তো কিছুই নেই। আমি তো কিছুই দিলাম না!" তাতে মা বললেনঃ "মা-ই ছেলেকে দেয়। ছেলে আবার মাকে কি দেবে? তোমাকে কিছু দিতে হবে না।" একটা অদ্ভুত কথা এই—মা যে কি দীক্ষা দিলেন আমি ভুলে গেলাম। দীক্ষার্থীদের তাড়ায় আমাকে নিচে নেমে আসতে হলো। বিকেল বেলায় হঠাৎ কেষ্টলাল মহারাজ বললেনঃ "যাও, মা-র কাছ থেকে নিজের নিজের মন্ত্র আবার জেনে এস।" আমি মা-র কাছে গিয়ে বললামঃ "আমার মন্ত্রটা একবার বলে দিন।" মা আবার আমার মন্ত্রটি বলে দিলেন। কেষ্টলাল মহারাজ তখন একথা না বললে আমার মুশকিল হয়ে যেত। মাকে প্রণাম করে আমরা মঠে ফিরে এলাম।

মনে কোন সন্দেহ হলে আমি সোজা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উদ্বোধনে হাজির হতাম। মঠে এসে দেখেছি ও শুনেছি যে ঠাকুরের সন্তানেরা এক একজন সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ভগবান; শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ভগবতী। মায়ের যাঁরা কৃপাপ্রাপ্ত তাঁদের নাকি এটাই শেষ জন্ম। ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। 'শেষ জন্ম' কি বুঝতাম না, তবে নিজের একটা ধারণা ছিল 'শেষ জন্ম' অর্থে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। যাই হোক সময় সুযোগ করে একেবারে মায়ের কাছে উদ্বোধনে গিয়ে হাজির হলাম। মাকে আমি 'তুমি' সম্বোধনই করতাম। মাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "মা, তোমাকে বা ঠাকুরের সন্তানদের যে সকলে ঈশ্বর, ভগবান বা ভগবতী বলে সে কি সত্যি?" মা বললেনঃ

"হ্যাঁ বাবা, সত্যি।" আবার জিজ্ঞেস করলামঃ "মা, সকলে বলে, তোমার কাছে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের শেষ জন্ম—একথাও কি সত্যি?" মা বললেনঃ "হ্যাঁ বাবা, সেকথাও সত্যি। আমার কাছে আর রাখালের কাছে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের শেষ জন্ম। কাউকে কাউকে হয়তো জন্ম নিতে হতে পারে, তবে তাও ঠাকুর যখন আসবেন সেই সময় তাঁর সঙ্গেই আসবে তারা। আর তোমার তো শেষ জন্মের আধার। তোমার আর জন্ম হবে না।" আমি তো মঠে ফিরে এলাম। মঠে আছি হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলাম যে, মা যেন বলছেন, আমাকে বিবাহ করতে হবে এবং মাদ্রাজে জন্ম নিতে হবে। স্বপ্নে আমি মাকে বললাম—মা, আমি যে সাধু হয়েছি, তাও আমাকে বিবাহ করতে হবে? মা যেন বললেন—হ্যাঁ বাবা, তোমাকে বিবাহ করতে হবে। আমার ঘুম ভেঙে গেল, মনে দারুণ অস্বস্তি। আবার মার কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলামঃ "মা, স্বপ্নেও তুমি যা বল তা কি সত্যি?" আমার তখন চোখে জল এসে গেছে। মাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলে জিজ্ঞাসা করলামঃ "তবে কি আবার আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে?" মা হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেনঃ "না বাবা, তোমাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তোমার তো শেষ জন্ম।" বলে মা আমার সেই রিষ্টিযোগ ['রিষ্টি' শব্দের অর্থ পাপ, অমঙ্গল, গ্রহদোষ।] কাটিয়ে দিলেন। ছেলেমানুষ ছিলাম; প্রশ্ন করে সব কিছু জেনে নেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না অথবা প্রশ্ন মনে জাগলেও প্রকাশ করতে পারতাম না। এই প্রসঙ্গে মা বললেনঃ "মহামায়ার এমনি লীলা—ঠাকুরের ভক্ত সন্ন্যাস নিয়ে সাধনভজন করতে হৃষীকেশ গেল—ফিরে এসে বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর এল না। মহামায়ার কৃপা না হলে কিছুই তো হয় না!"

শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করার খুব ইচ্ছে আমার হয়েছিল একবার। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা মাতৃমণ্ডলী নিয়ে থাকতেন। সেখানে আমরা ছেলেছোকরারা বেশিক্ষণ তাঁকে পেতাম না। মা নিজেও মেয়েদের মধ্যে থাকতেন বলে বেশিক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না আর শরৎ মহারাজও মায়ের কাছে ছেলেদের যাওয়া পছন্দ করতেন না। কাজেই

আমার পক্ষে উদ্বোধনে গিয়ে মায়ের সেবা করা সম্ভব ছিল না। মা নিজে সেবক বেছে নিতেন। আর আমরা থাকতাম মঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। তার আগের তিথিপূজার আগে আমি মঠে এসেছি। একবছর হয়ে গেছে। মা এসেছেন। আমি তখন ঠাকুরঘরের কাজে ব্যস্ত। ঠাকুরের ভোগ উঠে গেছে। মা এবার প্রসাদ পাবেন তাঁর পার্ষদবর্গের সঙ্গে অর্থাৎ রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি তাঁর ভাইঝিরা ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ, বলরাম বাবুর বাড়ির মেয়েছেলেরা এবং আরও অন্যান্য পরিজনবৃন্দের সঙ্গে। রাসবিহারী মহারাজ আমাকে এসে বললেন ঃ "তোমার ঠাকুরঘরের কাজ হয়েছে? ভোগ উঠে গেছে, তুমি তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসো, মাকে প্রসাদ দেবে তুমি।" রাসবিহারী মহারাজের নির্দেশে আমি ঠাকুরের ভোগের থালাশুদ্ধ বাটির ব্যঞ্জনাদিসহ সব মায়ের সামনে রাখলাম। মায়ের সেবার স্থান হয়েছিল স্বামীজীর ঘরের দোতলার পূর্বমুখী বারান্দায়। মা সেখানে তাঁর মেয়েদের নিয়ে বসেছিলেন। যাই হোক, আমি ঠাকুরের ভোগের পাত্র সমেত প্রসাদ মায়ের সামনে রাখলাম, তিনি সেই পাত্র থেকে তুলে তুলে খেতে শুরু করলেন। আর আমাকে বললেন সেই পাত্র থেকে মেয়েদের পরিবেশন করতে। তারপর ঠাকুরের পায়েসের বাটি থেকে ঐভাবে নিয়ে পরিবেশন করে দিতে বললেন। আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে ঠাকুরের পাত্র থেকে যে-কেউ ঐভাবে খেতে পারে। মা সাক্ষাৎ ভগবতী সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি তো দেহধারী! দেহধারী কেউ তো সেভাবে ঠাকুরের পাত্র থেকে খেতে পারেন না! আমি সবে নতুন এসেছি কাজেই আমার একটু অবাক লেগেছিল। মায়ের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমি মায়ের হাতে জল দিচ্ছিলাম। তখনও মঠে কল হয়নি। আমাদের সব কাজই তখন গঙ্গাজলে হতো। আঁচানো হয়ে যাওয়ার পর আমি জল দিয়ে মায়ের পা ধোয়াতে গেছি, তখন মা আমাকে বললেন ঃ "একটু দাঁড়াও বাবা।" বলে গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করে তারপর তাঁর পা ধোয়াতে আদেশ করলেন। আমি মায়ের পা ধুইয়ে দিয়ে তাঁকে বললাম ঃ "মা, আমাদের এখানে যে জল আমরা ব্যবহার করি তার সবই তো গঙ্গাজল। আমাদের শৌচে যাওয়ার জন্যও গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়।

তাহলে কি আমাদের ঐ সমস্ত অশুচি কাজে জল ব্যবহার করার আগেও মন্তকে ধারণ করতে হবে?" মা বললেনঃ "হ্যাঁ বাবা, গঙ্গাজল কিনা? অশুচি কাজের আগে মস্তকে জল ধারণ করতে হয়।"

যাই হোক, মায়ের প্রসাদ পাওয়ার পর মা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের জানালা থেকে মহিলাদের নিয়ে কালীকীর্তন শুনতে বসেছেন। ইতিমধ্যে আমি এক থালায় অনেক পান নিয়ে মায়ের কাছে এসেছি। মা কোন কথা বললেন না, কেবল পান তুলে নিলেন। মনে মনে আমি একটু ধাক্কা খেলাম। মা যখন মেয়েদের নিয়ে থাকতেন তখন ছেলে-ছোকরাদের সেখানে যাওয়া পছন্দ করতেন না—একথা আমি জানতাম। তাই তাঁর একটু কঠোরভাব দেখে আমার সেকথাই মনে হয়েছিল। একবার উদ্বোধনে আমাকেই অনেক ভাল ভাল কথা বলার পর বলেছিলেনঃ "আচ্ছা বাবা, এবার এস। মেয়েছেলের বাড়ি তো, এখানে বেশিক্ষণ থাকা তোমার উচিত হবে না।" এই ছিলেন আমাদের মা। ছেলেদের মধ্যে কোন ক্রুটি দেখতে পেলে তিনি যেমন কঠোর হতে পারতেন, তেমনি মেয়েদের বেলাতেও হতেন। তৌল তাঁর সমানই ছিল।

মায়ের অশেষ কৃপার কথা শুনেছিলাম স্বামী ভূমানন্দের মুখে। শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) মায়ের মন্ত্রশিষ্য। সন্ন্যাস স্বামীজীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। শুকুল মহারাজ অশেষ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন। ভেতরে অদ্বৈত জ্ঞান এবং বাইরে দেখলে মনে হতো ভক্তিবাদী। জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছিলেন তিনি। মহারাজ প্রভৃতি বলতেন—কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) ও শুকুল মহারাজ সম্বন্ধে—যে তাঁরা নাকি তরে গেছেন। এই শুকুল মহারাজ একবার কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে অনুযোগ করলেনঃ "মা তুমি, তুমি নিষ্ঠুরা! মা, তুমি কী কৃপা করলে, যে তুমি থাকতেও আমার কোন দর্শনাদি হচ্ছে না!" এটা তাঁর আর কিছুই নয়, মনের আক্ষেপ প্রকাশ। তাঁর এই কথা শুনে মা খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেনঃ "কি! এতবড় কথা! স্বয়ং ঠাকুর আমকে বলতেন দয়াময়ী, তিনি কখনও আমাকে একটা ফুল দিয়ে পর্যন্ত আঘাত করেননি, আর তুমি আমাকে নিষ্ঠুরা বলছ? যাও, বেরিয়ে যাও, আমার সুমুখ থেকে চলে

যাও।" মা তো সহজে এভাবে উত্তেজিত হতেন না, তাঁর এই ভাব দেখে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে এসে শুকুল মহারাজকে সরিয়ে দিয়ে যান এবং মাকে শান্ত করেন। তারপর থেকে শুকুল মহারাজ একেবারে স্থির হয়ে যান। একেবারেই ভেতরে প্রবেশ করেন। আনন্দপূর্ণ আমরা তাঁকে দেখেছি। মনে হয় বাইরে মায়ের ঐ কঠোর ব্যবহার অন্তরে তাঁকে রসসিঞ্চিত করে তুলেছিল। তাই তিনি এমন অপূর্ব হতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা যে আমাকে কতভাবে করুণা করেছেন বলে শেষ করতে পারি না। একবার আমি তাঁকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখি। আমার দীক্ষা নিয়ে কিছুই হচ্ছে না যখন, তখন তাঁর মন্ত্র তাঁকে ফিরিয়ে নিতে বলেছিলাম। মায়ের ওপর অভিমানবশতই আমি তখন মহারাজের কাছে বলরাম মন্দিরে থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই তিন বৎসর তাঁর কাছে যাইনি। তাতে অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীরা আমাকে ডেকে আমার মনের কথা চিঠিতে মাকে জানাতে বলেন। সেইজন্যই মাকে আমার এই দীর্ঘ পত্র লেখা। মা আমার চিঠি পেয়েই আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে যেতেই বললেনঃ "বাবা, সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নিচেতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয়—ওগো সূর্য, তুমি আমাকে ওপরে তুলে নাও! সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে ওপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

মা দেহ রেখেছেন। আমি তখন কলকাতায় এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়িতে আছি পূজা উপলক্ষ্যে। সারাদিন পূজা ইত্যাদি করে রাত্রে মায়ের নাম করে শুতে গেছি অনেক রাত্রে। রাত্রি তখন প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভাঙল। একটি মেয়ে ডাকছে আমাকে। বললেঃ "বশীবাবু (বশীশ্বর সেন) আপনাকে ডাকছেন।" আমি একটু অবাক হলাম। বশীবাবু এত রাত্রে আমাকে ডাকছেন! যাই হোক, গেলাম তো বশী-দার কাছে। বশী-দা বললেনঃ "তুই মায়ের ওপর অভিমান করেছিস?" আমার তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি ঠিকমতো। দেহ তখনো টলছে। বশী-দা আমাকে রাস্তায় নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে পায়চারী করতে লাগলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ "তুমি আমাকে

এইকথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?'' বশী-দা বললেনঃ ''আমি স্বপ্ন দেখলাম, মা আমাকে বলছেন, 'দেখ, ঈশ্বর বড় অভিমানী। ও আমাকে বড় কষ্ট দেয়। ঠাকুর আমাকে দয়াময়ী বলতেন, আর ও আমাকে এত কষ্ট দেয়, আমার ওপর অভিমান করে! তুই ওকে দেখিস।'' বশী-দার চোখে জল। আমি স্বীকার করলাম মায়ের ওপর অভিমানের কথা। মায়ের প্রসঙ্গেই রাত্রি শেষ হলো। সেই স্মৃতি স্মরণ করে বশী-দা আজও আমাকে মনিঅর্ডার পাঠান।

আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব, রিপুর তীব্র তাড়না যখন আমাকে অস্থির করে তুলত আমি কিন্তু সব হয় মাকে নয় মহারাজকে জানাতাম। রেখে ঢেকে কিছু বলতাম না। আমি তখন পুরীতে মহারাজের সঙ্গে আছি। সেখান থেকে জয়রামবাটীতে মাকে চিঠি লিখি আমার রিপুর তাড়নার কথা জানিয়ে। তিনি তার যে উত্তর দেন তাতে তিনি লিখেছিলেনঃ ''তোমার সব রিপু শীতল হোক।'' কী কথা! আজও যেন বুঝতে পারি না। আরও লিখেছিলেনঃ ''জপ করে যাও।'' * ❑

* 'স্মৃতিকথা'—স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ, কলকাতা-৪২, ১৩৭৭, পৃঃ ২৫-২৬, ৩৫, ৩৯-৪৩, ৭৩-৭৮

মাতৃসান্নিধ্যে

স্বামী স্বস্বরূপানন্দ

স্বামী স্বস্বরূপানন্দের (আশু মহারাজ) পূর্বাশ্রমের নাম আশুতোষ অধ্বর্যু। তাঁর পিতার নাম ভোলানাথ অধ্বর্যু এবং মাতার নাম রামকুমারী দেবী। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ সালে। বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষের উৎসাহ ও সহযোগিতায় জয়রামবাটী আসেন মাতৃদর্শনে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেন ১৯১৪ সালে; ১৯১৭ সালে বাঁকুড়া মিশন সেবাশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান; ১৯২৩ সালে স্বামী সারদানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ। সমকালে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী-কলকাতা গমনাগমনের সময় বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে অবস্থান করে তারপর যাত্রা করতেন। আশু মহারাজ প্রায়শই সেখানে হাজির হতেন মাকে দর্শন করতে। বাঁকুড়ায় রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাপর্বে বিভূতি ঘোষ, ডাক্তার মহারাজ (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) ও আশু মহারাজ (স্বামী স্বস্বরূপানন্দ) ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। বাঁকুড়ায় আদি মঠ ছিল সতীঘাটার কাছে, গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে। ১৯৩০ সালের বন্যায় মঠবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ডাক্তার মহারাজের সঙ্গে আশু মহারাজ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে পার্শ্ববর্তী জনৈক ভক্তের গৃহে অবস্থান করেন। এর কিছুদিন পরে বর্তমান মঠের অবস্থান যেখানে, সেই স্থানেই আশ্রম নির্মাণ করে তাঁরা অবস্থান করতে থাকেন। চিকিৎসা-সেবা দিয়েই বাঁকুড়া মঠের যাত্রা শুরু। ডাক্তার মহারাজ অধ্যক্ষ হলেও আশু মহারাজ ছিলেন তাঁর প্রধান সহকারী। আশু মহারাজ সম্পর্কে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর শ্রীশ্রীসারদাদেবী গ্রন্থে একটি বিবরণ উল্লেখ করেছেন : "রাজেন দত্ত বলেন, 'জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বরবাবুর বাড়িতে আছেন; বাঁকুড়া যাইয়া আশু মহারাজ তাঁহাকে পূর্বদিন দর্শন করিয়াছিলেন। আমিও এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দর্শন করিতে গেলাম। খানিক কথাবার্তার পর আমরা চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই মা বলিলেন : 'আশু কাল গামছা ভুলে গেছে, তুমি নিয়ে যাও।' আশু মহারাজ আমাকে গামছাখানা আনিতে বলিয়াছিলেন, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মা গামছাখানি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে দিতেও ভুলিলেন না।'" (শ্রীশ্রী সারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৬, পৃঃ ১৮৭) বাঁকুড়া মঠের গোশালা তাঁর চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। মঠে তিনি সারাদিন মঠ ও গোশালার পশুদের পরিচর্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন-চার ঘণ্টা ধরে জপ-ধ্যান

করতেন এবং সন্ধ্যার সময় ঠাকুর-মার কথা পাঠ করতেন। প্রয়াণের কয়েকবছর আগে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। মঠাধ্যক্ষ তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠাতে আগ্রহী হলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে নারাজ ছিলেন। রোগের বৃদ্ধি যখন চূড়ান্ত মাত্রায় তখন বাঁকুড়ার ডাঃ বিজয় মণ্ডল ও অন্যান্য কয়েকজন তাঁকে নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাতৃগতপ্রাণ সন্তান কারও সেবা না নিয়েই হাওড়া স্টেশনেই ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯ আগস্ট দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেছিলেনঃ "গঙ্গা কত দূর? বেলুড় মঠ কত দূর? জয় মা!" তারপরই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

আশু মহারাজের গায়ের রঙ ছিল শ্যামবর্ণ। যেমন লম্বা, তেমনই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। শ্রীশ্রীমা তাঁর উদ্দেশ্যে বলতেনঃ "আশু আমার ডাকাত ছেলে।"

(আশু মহারাজের বিবৃত তথ্য সরবরাহ করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী মহেশ্বরানন্দের সহকর্মী ডাঃ চৈতন্যময় মণ্ডল, বিভূতি ঘোষের মধ্যম পুত্র কেদার ঘোষ, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বাঁকুড়ার রাজেন দত্তের পুত্র অমিয় দত্ত।)

—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সংগ্রাহক)

সম্ভবত ১৯১৩ সাল হবে। বিভূতি ঘোষ মহাশয় ও বৈকুণ্ঠ ডাক্তারের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনে মনে হতে লাগল একবার জয়রামবাটী গেলে কেমন হয়? বিভূতিবাবুর কাছে জয়রামবাটী যাওয়ার পথের হদিশ জেনে একদিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ি একাই। সঙ্গে রাজেন দত্তেরও যাওয়ার কথা ছিল। কি একটা কারণে তাঁর যাওয়া হলো না। তখন মনে হলো, আমি একাই যাই না কেন! বিষ্ণুপুর থেকে সোজা হাঁটতে লাগলাম। সেটা বর্ষাকাল ছিল। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যখন জয়রামবাটী পৌঁছালাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল। লোককে জিজ্ঞাসা করে মার ঘরের কাছাকাছি এসে দেখি এক বয়স্কা মহিলা এক হাতে কয়েকটি ধোওয়া বাসন নিয়ে আর এক হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ভাবলাম ওঁকে জিজ্ঞাসা করব যে, এখানে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িটি কোথায়। আমায় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ না দিয়ে সেই মহিলা আমার ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারা দেখে বলে উঠলেনঃ "এসো বাবা! জলে-ঝড়ে খুবই কষ্ট পেয়েছ?"

তাঁর স্নেহভরা কণ্ঠস্বর শুনে আমার আর যাচাই করার কোন সুযোগই হলো না। মনে হলো, নিশ্চয় ইনিই শ্রীশ্রীমা! আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম জানালাম। মা বৈঠকখানা ঘরটি দেখিয়ে বললেনঃ "বাবা, একটু বিশ্রাম নাও। আমি আসছি।"

আমি বৈঠকখানায় তালপাতার চাটাইয়ের আসনে বসে একটু বিশ্রাম নিতে লাগলাম। তার কিছুক্ষণ পর মা নিজেই একটি রেকাবিতে কিছু মুড়কি ও দুটি নারকেল নাড়ু ও জল সমেত সেই গ্লাসটি আমার সামনে রেখে বললেনঃ "ওগুলো খেয়ে নাও বাবা!"

দীর্ঘ পথ হেঁটে আমি খুবই পিপাসার্ত ছিলাম। মার হাতে জলের গ্লাসটি দেখে তখনই মনে হচ্ছিল ঐ গ্লাসটি চেয়ে নিয়ে জলটা খাই। কিন্তু লজ্জায় চাইনি। পরে মা যখন আমার জন্য সেই গ্লাসটিই আনলেন তখন খুবই আনন্দ লাগছিল। মনে হলো, আমি পিপাসার্ত হয়ে যে জয়রামবাটীতে ঢুকব—এ কথা কি মা জানতে পেরেছিলেন? আমি জয়রামবাটীতে আসব একথা তো কাউকে জানাইনি! যাই হোক, ভাবলাম মা যখন জগজ্জননী, তখন তো তিনি সবই জানতে পারবেন!

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "বাবা, কোথা থেকে আসছ?"

আমি বললামঃ "বাঁকুড়া থেকে।"

মা বললেনঃ "বিভূতি, বৈকুণ্ঠ—এরা সব ভাল আছে?"

আমি জানালামঃ "হ্যাঁ মা। তবে আমি যে আজ এখানে আসব সেকথা তাঁদের বলিনি। তাঁরা আমাকে অনেকবার বলেছিলেন এখানে আসার জন্য। কয়েকদিন হলো আমি কেবলই রাত্রে স্বপ্ন দেখছি যে, আমি জয়রামবাটী যাচ্ছি। অনেক পথ—হাঁটছি তো হাঁটছিই। কখনো একটা মাঠের কাছে এসে আর পথ দেখতে পাচ্ছি না। তখনই ঘুম ভেঙে গেল। আবার কোনদিন দেখেছি হাঁটতে হাঁটতে জয়পুরের জঙ্গলে এসে পড়েছি। সামনেই এক মস্ত ভাল্লুক। তখন ছুটতে আরম্ভ করলাম। ছুটতে ছুটতে পড়ে গেলাম; ঘুম ভেঙে গেল। এভাবে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতে থাকায় ভাবলাম, মা বোধহয় আমাকে দর্শন দেওয়ার জন্যই এরকম স্বপ্ন

দেখাচ্ছেন। তাই কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে এলাম।"

মা সব শুনে বললেনঃ "ভালই করেছ, বাবা। আমারও আজ মনে হচ্ছিল, কেউ আসছে। এখন বিকাল, এরপর বেরুলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে, বাবা। আজ এখানে থেকে যাও।"

মার কথামতো সে রাত্রে জয়রামবাটীতে থেকে গেলাম। মা পরে খোঁজ নিলেন—কি নাম? কয় ভাই? কি করি? বৈকুণ্ঠ ডাক্তার ও বিভূতি ঘোষের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি কত দূরে? আমি সব বললাম। মা মাঝে মাঝে বললেনঃ "বাবা, ঠাকুরকে স্মরণ করবে। সব বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে।"

এরপর অনেকবার মায়ের কাছে যাতায়াত করেছি। কখনো কোয়ালপাড়ায়, কখনো সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে, কখনো বা জয়রামবাটীতে। মায়ের আমাদের দয়ার শরীর। আমাদের কষ্ট তিনি এতটুকু সইতে পারেন না।

আমি সব সময়েই একটু অগোছালো। হিসাব পাঠ নেই। দীক্ষা নেওয়ার দরকার আছে, নিতে হয়, এ বোধও তখন হয়নি। সেবছর পুজোর সময় বৈকুণ্ঠ ডাক্তার জানালেন যে তিনি জয়রামবাটী যাবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি যাব কিনা। তিনি যাবেন সপ্তমীর দিন। একথা শোনা মাত্র আমি রাজি হয়ে গেলাম। পুজোর সময় জয়রামবাটীতে হাজির হলাম। শুনলাম মহাষ্টমীর দিন দীক্ষা হবে। বহু ভক্ত এসেছেন, তাঁরা দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পুজো চলছে। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমি উপবাসে আছি। আমার মনে হতে লাগল, আমিও তো দীক্ষা নিতে পারি! আবার মনে হলো, না, মা যদি নিজের থেকে দীক্ষার কথা বলেন, তবেই দীক্ষা নেব, নচেৎ নয়। আমি পুজোর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকলাম। তখন বেলা প্রায় নটা-দশটা হবে। মা আমাকে ডাকলেন এবং বললেনঃ "বাবা আশু, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো।" মায়ের কথা শুনে আমার চোখে জল বেরিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এলাম। মা-ই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মায়ের কৃপাতেই সেই শুভ মহাষ্টমীর দিন আমার দীক্ষা হয়ে গেল।

এর বেশ কয়েকবছর পর ডাক্তার মহারাজ সন্ন্যাস নিলেন। আমার আর সন্ন্যাস নেওয়া হয়নি। ঘর ছেড়ে ডাক্তার মহারাজ, আমি, কমল মহারাজ সবাই মঠ এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে নিয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হলো, মা-ই তো সব। তাঁর কাছে যদি সন্ন্যাস নিই ক্ষতি কি? যেই না একথা মনে ওঠা, পরের দিনই জয়রামবাটীতে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছালাম সেখানে। গিয়ে মাকে প্রণাম করেই বললামঃ "মা, আমাকে সন্ন্যাস দিন।" মা বললেনঃ "আমি তো সন্ন্যাস দিই না। তুমি মঠে যাও। মঠে গিয়ে রাখালের কাছে সন্ন্যাস নাও।" আমি জেদ ধরে বসলাম, বললামঃ "মা, আপনিই আমাকে সন্ন্যাস দিন।" মা যত বলেন মঠে নিতে, "মঠে নিতে হয়", আমার তত জেদ বেড়ে যায়। আমি তখন আমার গলার পৈতা ছিঁড়ে মার সামনে রেখে বললামঃ "আমার ধর্ম-কর্ম সব যাক। হয় সন্ন্যাস দিন, নয়তো আমার সব উৎসন্নে যাক।" এই বলেই মার পায়ে পড়ে কান্নায় ফেটে পড়লাম। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেনঃ "ক্ষ্যাপা ছেলে! ওঠো বাবা!" পরে রাত জেগে মা নিজেই কাপড় গেরুয়া করে আমাকে গেরুয়া দিলেন এবং বললেনঃ "বাবা, বেলুড় মঠে গিয়ে রাখালের কাছে বিরজা হোম করে নিও।" মার আশীর্বাদী গেরুয়া পেয়ে তা মাথায় ঠেকিয়ে মনে হয়েছিল—আমার জীবন সার্থক! আমি ধন্য! আমার আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস হয়েছিল কয়েক বছর পর ১৯২৩ সালে শরৎ মহারাজের কাছে। ❑

সংগ্রহঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী বিজয়ানন্দ

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে মা শেষবারের মতো জয়রামবাটী থেকে অসুস্থ হয়ে উদ্বোধনে এলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমাদের চারজনকে—স্বামী জগদানন্দ, মুকুন্দানন্দ, কেশব (অক্ষয়ানন্দ) ও আমাকে—কাশী সেবাশ্রমে কর্মিরূপে যেতে আদেশ করেছেন। আমরা সবাই মাকে প্রণাম করতে গেলাম। মা তাঁর খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। রাসবিহারী মহারাজ আমাদের হুকুম দিয়েছেন—সাত হাত দূর থেকে প্রণাম করবে, তার চেয়ে বেশি এগিয়ে যাওয়া চলবে না। স্বামী জগদানন্দ ও মুকুন্দানন্দ উভয়েই মায়ের আশ্রিত, তাঁরা সাত হাত দূর থেকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তারপরই মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), শরৎ মহারাজ ও রামলাল-দাদা প্রণাম করতে এলেন। মহারাজ মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ "মা, আজ কেমন আছেন?" মা ধীরে ধীরে বললেনঃ "রাখাল, এ শরীর আর বেশিদিন থাকবে না।" শরৎ মহারাজ হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসেছিলেন, তিনি প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠলেন। রামলাল-দাদা জিজ্ঞেস করলেনঃ "খুড়ি, কেমন আছ?" মা কোন জবাব দিলেন না।

তাঁরা চলে গেলে কেশব সাত হাত দূর থেকে প্রণাম করল। এমন সময় রাসবিহারী মহারাজ হঠাৎ অদৃশ্য হলেন—কি কারণে জানি না। আমিও ঐ সাত হাত দূর থেকে প্রণাম করলাম। মা তখন আস্তে আস্তে বললেনঃ "বাবা, আর একটু এগিয়ে এসো।" সাহস পেয়ে মা-র তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "বাবা, তোমার নাম পশুপতি?" আমি বললামঃ "হ্যাঁ মা।" মা বললেনঃ "তুমি

কাশী যাচ্ছ?" আমি বললামঃ "মা, আমার কিন্তু একেবারেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই।" "কেন?" "কারণ, ওখানে আমার বাড়ির সবাই আছে। গেলে তারা মুশকিলে ফেলবে।" মা বললেনঃ "তোমার কোন মুশকিল হবে না, বাবা। কাশী যাও। সেখানে আমাদের দুটি ভাল ছেলে আছে—একজনের নাম হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ), আরেকজনের নাম লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ)।"

আমি তবুও বললামঃ "মা, আমার কিন্তু যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নেই।" তিনি জবাব দিলেনঃ "যাও বাবা, তোমার কোন ভয় নেই।" এমন সময় মা বললেনঃ "বাবা, আমার আরও কাছে এসো।" তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ে মাথা রাখি। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেনঃ "এসো।" এমন সময় রাসবিহারী মহারাজ হাজির হলেন। তিনি রেগে বললেনঃ "তোকে আমি বলেছি দূর থেকে প্রণাম করতে।" মা বললেনঃ "আমিই ওকে ডেকেছি। রাসবিহারী, তুমি চেঁচামেচি কোরো না।"

এই হলো মায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ—প্রথম ও শেষ। এর কিছুদিন পরেই এপ্রিল মাসে কাশীতে লাটু মহারাজের দেহত্যাগ হয় এবং জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমাও দেহত্যাগ করেন।... মা তাঁর কাজ দেশ-বিদেশে করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয়, মা যেন ঠাকুরের সঙ্গে এক সিংহাসনে বসে আছেন এবং ঠাকুরকে বলছেনঃ "তুমি একটু সরে বোসো, আমি এবার কাজ করি।" [১]* ❑

সংগ্রহ ও অনুলিখন ঃ স্বামী চেতনানন্দ

১ স্বামী বিজয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় বেদান্ত প্রচার করতে যান এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ভারতে আসেন। তখন কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন একদিন তিনি সাধুদের কাছে স্মৃতিচারণ করেন এবং তা টেপরেকর্ড করা হয়। মায়ের এই স্মৃতিকথা সেই টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখিত হয়েছে।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৪, পৃঃ ৬৭৮

মায়ের আকর্ষণ

স্বামী অবিনাশানন্দ

পড়েছিলাম—

"মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণাঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণাঃ।
পরগুণপরামাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।।"

—মনে বাক্যে এবং দেহে যাঁদের পুণ্য পীযূষধারা পরিপূরিত, নানাবিধ উপকার-সাধনদ্বারা ত্রিভুবনকে প্রীত করাই যাঁদের স্বভাব, পরের গুণ পরমাণুতুল্য হলেও পর্বতপরিমাণ করে দেখে যাঁরা নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন, এমনও কয়েকজন সাধু পৃথিবীতে দেখা যায়।

এই শ্লোকের উক্তিগুলি মায়ের জীবনে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য দেখেছি। কী মিষ্টি কথা, মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর! প্রতিটি কাজ হতে কল্যাণ বিকীর্ণ হতো। একটি দিনের চোখে দেখা ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৯ সাল, জয়রামবাটীতে রয়েছেন, জ্বর হয়েছে। রাধুর ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে—রাধুর পাগলী মা উনুন থেকে একটি লম্বা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে মারতে আসছেন। গ্রামের কয়েকজন বুড়ি নিজেরা ঝগড়াঝাঁটি করে মায়ের কাছে এসে আপসের পরামর্শ চাইছে—রাধু তাইতে খুব রেগে চড়া গলায় মাকে তীব্র গালাগালি দিচ্ছে আর বলছেঃ "তুমিই এদের প্রশ্রয় দিচ্ছ।" মা কিন্তু শান্ত। রাধুকে শুধু বলছেনঃ "মিষ্টি কথা বল, মিষ্টি কথা বল।"

এখনো যেন মায়ের সেই অমৃতমধুর কথাগুলি কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, মিষ্টি কথা বল, মিষ্টি কথা বল! দুনিয়ার একশ লোক যার সম্বন্ধে বদ্ধ ধারণা করে বসে আছে—লোকটি বড় খারাপ, অদোষদর্শিনী মা

তাকে দোষ দেননি—তার কল্যাণ-চিন্তা করেছেন, তাকে শোধরাবার চেষ্টা করেছেন। একটি-দুটি বিরল ক্ষেত্রে নয়—ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শঙ্করাচার্য একটি স্তোত্রে মাতা অন্নপূর্ণার বর্ণনা করেছেন—

''নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।...''

আমার মনে হয়, এ যেন শ্রীশ্রীমায়েরই ছবির বর্ণনা। যারাই তাঁর কাছে এসেছে, অভূতপূর্ব আনন্দ নিয়ে ফিরে গেছে। সর্বদাই মানুষকে তিনি দিয়েছেন আশা ও অভয়। কী অদ্ভুত হৃদয়-মনোহারী স্নিগ্ধ শান্ত আত্মিক সৌন্দর্যের মহাসমুদ্র ছিলেন তিনি—পুঞ্জিত মলিনতা, অতি ঘোর দুষ্কৃতিও ধুয়ে মুছে নির্মল পবিত্র করে দিতেন সকলকে; তাই তো তিনি দেবী, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী!* ❑

* যুগজননী সারদা—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, তৃতীয় সং, ১৪০৮, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৫৪-৫৫

শ্রীশ্রীসারদামণির পদপ্রান্তে

স্বামী নির্লেপানন্দ

কী দিনই না উদ্বোধনে পেয়েছিলাম! ঠাকুরঘরে মা—পরনে গেরুয়া নেই, গলায় রুদ্রাক্ষ নেই, সচরাচর চোখে পড়া বাঙালী বিধবার মতো মুখে কপালে চন্দনচর্চিত চিহ্ন নেই। কালী বা কৃষ্ণ নামের নামাবলী অঙ্গে নেই। হাতে হাঙরমুখো বালা দুগাছি, পরনে নরুণপাড় ধুতি। সাদাসিধে। যেন বাঁকুড়া জেলার কোন বাড়ির বউমা-টি। শরীরে বাইরের একটা মাদকতাকারী রূপের স্পর্শ নেই। মা শ্যামা। ভোর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে নিত্য বারোমাস সব ঋতুতে শয্যাত্যাগ। প্রাতঃকৃত্য অন্তে ঠাকুরকে শয়ন থেকে উত্তোলন, বাল্যভোগ দেওয়া। নিজহাতে রোজ ঠাকুরঘর মোছা, ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া, সকাল সন্ধ্যা জপে বসা ইত্যাদি সবই একে একে মনে পড়ছে। তবে শেষের দিকে উদ্বোধনে সেবিকা ও সেবকরা অনেক কাজ তাঁকে করতে দিতেন না। তখন বয়সের ভারও বেড়েছে, অসুস্থতার জেরে শরীরের জোরও কমেছে। তবুও দেখেছি, অন্তত ঠাকুরঘরের সব কাজ, নিজহাতে কলকাতাতেও করবার তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। মাকে দেশে কলকাতার মতো শরৎ মহারাজের হেপাজতে থাকতে হতো না। সেখানে তিনি পিত্রালয়ের ঝিউড়ি, গ্রামের বালিকা। সেখানে তিনি নিজ হাতে কুটনো কুটে, বাটনা বেটে, দুধ মেগে এনে ছেলেদের চা পর্যন্ত খাইয়েছেন। কলকাতায় এই পল্লীবালার যে কৃত্রিমতার দরুণ খানিক অসুবিধা হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখনকার উদ্বোধনের আধখানি উদ্বোধন সামনের দিকে তখন। যেন একটি পাখির ছোট বাসা। ছোট্ট বারান্দাটি চিকে ঘেরা, আলো বাতাস কম।

জয়রামবাটীর মতো পর্দা-ফাঁক, উন্মুক্ত নয়। বাড়ি শুদ্ধ ঠাসা লোক। দোতলা তেতলায় পুরুষদের একরকম ওঠা নিষেধ। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক নিচের ঘরে সম্পাদকতা করেন। সামনে তখন খোলা মাঠ ছিল। রবিবার মাঠময় লোক। দুই রোয়াকে লোক। আর বাড়িতে গিসগিস ঠাসা, থইথই। ওপরে মেয়েরা। ৭০-৮০ জনকে রবিবারে রবিবারে বিকেলে হাতে হাতে মিষ্টি প্রসাদ দিয়েছি। একেকদিন ২৫-৩০ জনকে মা প্রত্যেককে আলাদা করে দীক্ষা দিয়েছেন। কলকাতায় গৃহকর্ম নিজ হাতে তাঁর করবার ইচ্ছা থাকলেও শরৎ মহারাজের ভয়ে, গোলাপ-মা, যোগীন-মার ভয়ে বেশি করতে সাহস করতেন না। বয়সে তিনি গোলাপ-মা, যোগীন-মা—এঁদের ছোট ছিলেন। মনে হতো, গোলাপ-মা বা যোগীন-মা যেন শাশুড়ি, আর মা তাঁদের অধীনা বউ-মা। আগঙ্গার দেশের লোক তিনি, উদ্বোধনের ছাদ থেকে গঙ্গা, দক্ষিণেশ্বরে মা-র মন্দির দেখা যায়। তিনি সুস্থ থাকলে, বাত বেশি চাগান না দিলে নিত্য গঙ্গাস্নান করতে পারেন—এই ছিল তাঁর কলকাতার ওপর আকর্ষণ। মা-র দেহান্তের পর একদিন সারদানন্দ মহারাজ বলছিলেনঃ "আমার সাধ মিটে গেছে। ধার করে উদ্বোধন করেছিলাম। জায়গাটুকু দান খড়ের ব্যবসায়ী কেদার বাবুর। ধার শোধ হয়েছে। আর এতকাল মধ্যে মধ্যে কখনো বেশিদিন, কখনো অল্পদিন মা এখানে বাস করেছেন।" মার আমলে উদ্বোধনে বিজলী বাতি ছিল না। কেরোসিন পুড়ত। বিজলী থাকলে সোনায় সোহাগা হতো। কারণ, মায়ের সুন্দর জ্যোতির্ময়ী অলৌকিক শান্ত অধ্যাত্মজীবনের ভাস্বরতা তো ছিলই।

পূজা নিজে শেষ করে, বা যখন নিজে না করতেন, পূজা সাঙ্গ হলে, কয়জন ভক্ত নিচে আছে তা একটি বালককে[১] গুণে আসতে বলতেন। সান্ধ্যভোগ শেষ করে ঠাকুরের মিষ্টি, ফলমূল, প্রসাদ ভাগাভাগা সাজিয়ে দিতেন। কালো বড় একখানি বারকোশের ওপর ঐগুলি চড়িয়ে বালক বিতরণ করত। শেষে বলে দিতেন, এইটি মোহনের ছেলেকে দিও—মায়ের পুরনো চাকর মোহিনীমোহনের একমাত্র শিশুপুত্র। অত ভিড়ের

১ 'বালক'টি বক্তা স্বয়ং। পূর্বাশ্রম সম্পর্কে তিনি যোগীন-মার দৌহিত্র—যোগীন-মার একমাত্র কন্যা গনুর কনিষ্ঠ পুত্র।—সম্পাদক

ভিতর দেখতাম, কোনদিন মা ছেলেটিকে ভুলতেন না। মা-র সব দিকেই নজর। প্রসাদ বিতরণকারী ঐ বালকটিকে একদিন তারই কোঁচড়ের কাপড় নিজে খুলে কতকগুলি আম বেঁধে দিয়ে বালিকার মতো বলছেনঃ "যা বাবা, খপ করে নিচে নেমে বাড়ি চলে যা। সাবধান, গোলাপ না দেখতে পায়। দেখতে পেলে আমাকে বকবে।" ছেলেটি তখন রবিবার রবিবার তাদের কলকাতার বাড়ি থেকে আসত। তারা গরিব। ভাল খেতে পাবে বলে মা-র কাছে আসত। ছেলেটি উপরন্তু মা-বাপ খেকো। মা-র তার ওপরেও কী করুণা! আবার সর্বাধিষ্ঠাত্রী হয়েও গোলাপ-মার সম্বন্ধে কী সুমধুর ভয়!

আরেকদিন। বুড়ো ঝি বলছে—"মা, খয়েরের অভাবে পান খেতে পাইনে, গোলাপ-মা বড় কড়া, বেশি দেয় না।" একগাদা খয়ের তাকে তক্ষুণি দিয়ে মা বলছেন—"পালা পালা বাছা, এই বেলা। ঐ গোলাপ এল বুঝি। আমাকে এক্ষুণি বকবে।" তাঁরই সব, তবু গোলাপ-মাকে মিষ্টি ভয়! মা কারুকে কম দিতে পারতেন না। প্রসাদ দিতেন হাত ভরে—ফল, মিষ্টি, মোহনভোগ। বলতেনঃ "কিছু খেয়ে জপ-ধ্যান, পুজোয় লাগো।" সেটাই ছিল তাঁর মতে সমীচীন শিবব্রত। "মনকে, আত্মাকে ভুখা রাখতে নেই। তাতে আত্মা কষ্ট পায়। তাতে কোন পুণ্যি নেই। বরং তাতেই ক্ষতি হয়।" আসলে মা শুধু দয়াবতী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রহ্মবতী। দয়া তাঁর একটি সাত্ত্বিক অভিপ্রকাশ, অভিব্যঞ্জনা। লক্ষ্মীবারে মা-র জন্ম। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছিল তাঁর। শেষের দিকে উদ্বোধনে দেখেছি অফুরন্ত জিনিস আসছে। আমের সময় ল্যাঙড়া, হিমসাগর, ফজলী অজস্র, এমনকি দামী আলফানসোও। পেট পুরে সবাই খাচ্ছে। তাঁর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার জিনিস বলে বোধই নেই। দু-হাতকে দশ হাত করে খালি 'দীয়তাং, দীয়তাং, দীয়তাম্'!

তখন নতুন আনকোরা মা-র ছোট্ট বাড়িটি একরকম গঙ্গাতীরেই। একেবারে সদর রাস্তার ওপর নয়, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি নেই, অথচ জানবাহন, বাজার-হাট, ডাকঘর—সবকিছু কাছে। একটু গলির আবরণে পরিরক্ষিত, ঘেরা, ঢাকা। এখন ঐ তল্লাটে চতুঃসীমানায় মস্ত মস্ত বিস্তৃত

রাস্তা পুরনো পরিবেশকে ভুলিয়েছে। ভাল হয়েছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ছেলেবেলা থেকে মা-র গঙ্গা-বাই। গঙ্গার উপকূলেই মা-র অন্তলীলা। উদ্বোধনে তখন কী আনন্দ, কী আনন্দ—নাচে শান্তি, নাচে স্বস্তি, নাচে সাম্য। নাচে ভক্তি, নাচে মুক্তি, নাচে পরমাপ্রীতি। মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খোলা। 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'। সব প্রথম মা-র অন্নদান, প্রসাদ দান। উদ্বোধন মা-র অন্তলীলার পীঠভূমি, নিখিলের তীর্থ।

মদীয় সংশ্লিষ্ট একদিনের ঘটনা। ১৯১৬ সালের একদিন বিকেল, গ্রীষ্মকাল। ঠাকুরঘর খোলা হয়েছে। মা পা-দুটি ছড়িয়ে, যেমন ছবি, উত্তরের সরু বারান্দায় বসে। জপমালায় ঝুলির ভিতর আঙুলগুলি। দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে। সামনে মাঠের দিকে চেয়ে আছেন। নামমাত্র চেয়ে আছেন। অন্তরে যেন কি দেখছেন। বাহ্য কোন কিছু গোচরে নাই। সেটা গুরুবার, মা-র জন্মবার। ম্যানেজার একতলার অফিসঘরে আমাকে আদেশ করলেনঃ "ওরে, এখুনি আমেরিকায় বোধানন্দ স্বামীকে চিঠি লিখতে হবে। আজ মেল ডে। দেরি করলে হবে না। বড় জরুরি ব্যাপার। এই ফটো তাঁর আশ্রমের। তিনি পাঠিয়েছেন। মাকে দেখাতে হবে, এবং মা দেখে কি বলেন জানাতে হবে।" বারবার তিনবার মা-র কাছে গিয়েও কোন কথা বলতে সাহস হলো না। ব্যর্থ। ফিরে এসে বললামঃ "আমার দ্বারা হবে না। উনি একমনে বসে আছেন, কিছু কথা বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। আর কাউকে পাঠান।" তিনি নাছোড়, "ওরে, তোর দ্বারাই হবে।" শেষে বাধ্য হয়ে গিয়ে আলগোছে আস্তে আস্তে বলছি, "মা, আমেরিকা থেকে হরিপদ মহারাজ এই ছবি পাঠিয়েছেন। আপনি দেখে কি বলেন জানাতে বলেছেন। ডাক চলে যাবে, তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে হবে।" শুনলেন। মা-র মুখের ভাব দেখলাম কষ্টে মাখানো। সজোরে কে যেন অন্তর থেকে বাইরে টেনে আনছে। তখনই কিন্তু সামলে নিলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বকুনি দিলেন না। ছবি একদম না দেখেই খালি মুখে বললেনঃ "বল গে, বেশ হয়েছে।" যদিও আমি দাঁড়িয়ে ছবি সামনে ধরেছিলাম। তখন কি ছাই বুঝি, মা-র বিজ্ঞানীর অবস্থা! চোখ চেয়েও দর্শন!

১৯১৬—আজও সে ছবি মনে তাজা। উদ্বোধনে শ্রীদেবের সন্ধ্যারতি সাঙ্গ। মায়ের দক্ষিণী দুই মেয়ে, চিরকুমারী। দুই বোন, শ্রীমতী কনক, শ্রীমতী শিবা। মাকে স্তব শোনাচ্ছেন—

"শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধমৌলে
মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
তমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ।। ৪
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্।। ৫
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশা
ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীড়ে।। ৬ (বেদসারশিবস্তোত্র)

মা হাত জোড় করে সমাহিতা। সুপ্রসন্না। চিত্রার্পিতের মতো বসে। তাদের সুমিষ্ট স্বর, বিশুদ্ধ বাণী। দূর থেকে নিচে সর্ব কর্ম কলরবের মধ্যেও শরৎ মহারাজের কান ওপর দিকে খাড়া। শব্দব্রহ্ম জাত-সাপকে আকর্ষণ করছে। তিনি স্থির, নিশ্চল। প্রায়ই নিবেদিতা স্কুল থেকে এসে ওঁরা মায়ের আদেশে আবৃত্তি করতেন। সেবককে হরি মহারাজের কথাঃ "সনৎ (স্বামী প্রবোধানন্দ), তুমি দেহের সেবা করলে, আর ললিত (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) সমগ্র 'ভাগবত' শুনিয়ে আমার মনের সেবা করল। ললিতের বাণী অশুদ্ধ হলেও।" এই কি মায়ের কিঞ্চিৎ মনের সেবা? নিশ্চয়ই তাই। শ্রীমা চোখ চেয়েই ভাব-সমাধিস্থ। কতবার ঐভাবে যে উদ্বোধনের দোতলায়, তিনতলায় মাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তা গোণা গাথার মধ্যে আসে না। অগণন।

১৯১৬ সালের আরেকটি ছোট্ট ঘটনা। সরু একফালি একতলার পশ্চিমের বাঁকা দেওয়াল ঘেরা বারান্দায় আলুভাতে ভাত, গরম গরম

ডাল, সঙ্গে মাছভাজা একখণ্ড, সকাল সকাল মুখে তাড়াতাড়ি গুঁজে মায়ের বাড়ীতে আশ্রিত অনাথ বালক আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হচ্ছি স্কুলে যাওয়ার জন্য। আমাকে বাগবাজার থেকে গোলদীঘি পর্যন্ত তিন মাইল হাঁটতে হবে। মা তেল মেখে সেকেলে বউমার মতো একগলা ঘোমটা দিয়ে ডাকাবুকো গোলাপকে 'শাশুড়ি' সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে পিছনের খিড়কি দরজা দিয়ে শান বাঁধানো লম্বা লম্বা আঁকা বাঁকা সর্পিল গলির সারি মাড়িয়ে সদর ট্রাম রাস্তায় শেষে পড়ে গঙ্গা নাইতে যাচ্ছেন। আমাকে সস্নেহে বললেনঃ "বাবা যাচ্ছ? তোমাকে আবার এতটা পথ যেতে হবে।" এক অনাথ, আশ্রিত বালকের প্রতি সে কী দরদ ঐ ক'টি কথায়! মাতৃহারা, পিতৃহারার মা তিনি ছাড়া আর কে?

মায়ের পায়ে বাতের ব্যথার জন্য হাঁটতে কষ্ট হয়। শরৎ মহারাজ গোলাপ-মাকে বললেনঃ "মায়ের অনুমতি হলে নিত্য পাল্কির ব্যবস্থা করব।" মাকে বলা হলে মা বললেনঃ "না গোলাপ, আমি তো এখন একদিন অন্তর যাই। এত কাছে মা গঙ্গা, মহাতীর্থ! পায়ে হেঁটে এইটুকু যাওয়াই ভাল।" সহজে আরাম নিতে নারাজ। এর ওপর আর কারও কথা চলল না।

হতভাগাদের ওপর মায়ের দরদ অপরিসীম। উদ্বোধনের সরাসরি দক্ষিণদিকে তখন পুরনো ইঁট বার করা হাঁ-করা ভাঙা ঝরঝরে, কিন্তু এককালে বনেদি বামুনবাড়ির মেয়ে নন্দ মাতৃহীনা। পিতা নেশায় শরমজ্ঞান হীন। নবকার্ত্তিকের মতো চেহারা, টিকোলো নাক, দুধে আলতা রঙ। বুড়ো পিতামহ পাড়ার নামকরা তারেবাড়া। নেশায় সদাই রাঙাচক্ষু। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মা-বিহীন সংসার। অনেকগুলি ভাইবোন। নন্দ রাধুর সই। একসঙ্গে পুতুলখেলা, আমোদ-আহ্লাদ। পুতুলে পুতুলে বিয়ে খেলা। শ্রীমা মা-খেকো নন্দকে বড় স্নেহ করতেন। খুব ভাল ভাল মেঠাই, সন্দেশ, ফলমূল, প্রসাদ বেশি করে দিতেন যাতে বাড়ির সবাই মিলে খেতে পারে, সবায়ের কুলোয়। মা-র নজর সকল দুঃস্থদের প্রতি। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দরিদ্রের দরদী। রাধু, একেকদিন দেখেছি, নন্দর বাড়ি গিয়ে এত খেলায় মেতে যেত যে, কেউ ডাকলে আসতেই চাইত না। পিসিমার নাম করে ডাকলেও

আসত না। মা নিজে খিড়কি দিয়ে গিয়ে সটান তাদের বাড়ি থেকে আধ-পাগলা রাধুকে ধরে আনতেন। নন্দ মাকে 'দিদিমা' বলত। বড় মিষ্টি লাগত।

শ্রীমায়ের সুবিস্তৃত করুণাতন্তু গ্রথিত জগৎজোড়া জাল। সবাইকে টেনে আশ্রয়, অভয়, ভোজন দিতেন। উদ্বোধন বাড়ির পূর্বদিকের গায়ে লাগানো প্রতিবেশিনী জেলে অমূল্যর মায়ের প্রতিও মায়ের করুণা-কটাক্ষ। তার ঘরে গাই ছিল। দুধ বিক্রি করে কিছু আয় হতো। মায়ের বিরাট রন্ধনশালার আনাজের খোসা-স্তূপ গোখাদ্যরূপে অমূল্যর মা পেত। তার জন্য সেগুলি নির্দিষ্ট থাকত। পুরনো খবরের কাগজও সে রাশি রাশি পেত। তাই দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে ঐ বিধবার কিছুটা আয় হতো। যার যা প্রাপ্য বিনা কুণ্ঠায় তাকে তাই দেওয়া মায়ের শিক্ষা। কোন কিছু অপচয় হতো না। ব্যবস্থা সব ছিমছাম। কোথাও কোন ছিদ্র থাকত না। যাঁদের মন একাগ্রতার চরম শিখরে, বাইরের ব্যবহারও তাঁদের শৃঙ্খলাপ্রণালী সম্মত। এলোমেলো মোটেই নয়। প্রায় অবিরাম সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতস্থ হলে লোক-ব্যবহারে সর্বদাই নিয়মানুগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সকলের প্রতি কর্তব্য পালনে ছিলেন উন্মুখ।

গোবিন্দকে মা-র কত যত্ন! মা উদ্বোধনে থাকতে মা-র দেশের গোবিন্দ একবার এল। তখন সে কাছাযুক্ত ব্রহ্মচারী। পরবর্তী কালে স্বামী তত্ত্বানন্দ। মা দেখে ভারি খুশি। গোলাপ-মাকে বললেনঃ "ওগো, এই ছেলেটি মাথায় করে বয়ে কত তরিতরকারী জয়রামবাটী নিয়ে যায়। ওকে ভাল করে খাওয়াও।" শরৎ মহারাজ মা-র দেশের সাধুদের বড় যত্ন করতেন। তাঁরা লেখাপড়া না জানলেও, তাঁদের যে মা-র প্রতি অগাধ ভক্তি, তাঁরা যে মা-র অন্তরঙ্গ! কয়েক বছর পরে হাসপাতালে দারুন বসন্ত রোগে কলকাতায় গোবিন্দের দেহান্তর হয়। মা-র কৃপাপ্রাপ্ত, শরৎ মহারাজের কাছে সন্ন্যাস। অন্তিম বিবরণ শুনে শরৎ মহারাজ বললেনঃ "মা তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিলেন।" ঘটনাকাল—জুন ১৯২৭।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ। সোনার কাঠি ছোঁয়ালে রূপকথার পাত্রপাত্রী জেগে ওঠে। উদ্বোধন ছোট বাড়িটির কিছু প্রসার হয়েছে। সে বছর, ১৯১৬,

জয়রামবাটীতে মা-র নিজস্ব অ-পাকা বাড়ি হয়। কতদিকে মা-র নজর! কত সাবধানী! কত নিজ আরামে অমনোযোগী! যখন জয়রামবাটীতে তাঁর আলাদা বাড়ি হওয়ার উপক্রম হচ্ছে (কত কৃপা ভায়েদের ওপর; পাকা বাড়ি করালে জমিদার ক্ষেপে যাবে, ভাইদের গাঁয়ে বউ-ঝি নিয়ে বাস করা দুষ্কর হবে) তখন গোড়ায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই বলছেনঃ "আমার আবার আলাদা কি হবে?" নিজেকে অমন চিরতরে মুছে ফেলতে আর কি কাউকে এ-জগতে দেখব? ঐ বছর জুলাই মাসে দেশ থেকে সদলবলে মা আসেন কলকাতায়। এই আসেন, এই আসেন রব চতুর্দিকে। দোতলার বারান্দায় পাতলা চিকের দল সব ঝুলতে আরম্ভ করল। রামকৃষ্ণ-বচনে আছে, চিকের আড়ালে মা থাকেন। মা সকলকে দেখতে পান, কিন্তু কেউ মাকে দেখতে পায় না। দক্ষিণেশ্বরে নামে মাত্র ঘর নহবতটুকুতে ১৮ বছরের সারদাদেবী দরমা, চাটাই, মাদুরের পর্দায় সুগুপ্তা। ঢাকা চারিধার। পিঞ্জরাবদ্ধা কেশরিণী। সেই মা এখন ৬২, পীড়াগ্রস্ত শরীর। দেশের ম্যালেরিয়াতে ভিতরটায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। বাতের দরুন বাম পা-টি নেপটে চলতে হয়। তথাপি পূর্বাচরণ রক্ষা। দক্ষিণেশ্বর কলকাতার তিনি যে বউমা, বরাবরের বউমা। ভদ্রলোকের এক কথা। এই বয়সেও পর্দা পুরোপুরি। বার্ধ্যক্যেও স্বামীর শেখানো চাল অব্যাহত। একই দাগা বুলিয়ে যাচ্ছেন। চলেছেন, 'নট' নড়ন-চড়ন। যেখানে যেমন। দেবপ্রতিম পতির অনুশাসন মান্য—পতিব্রতা। জয়রামবাটীর মাটিতে কিন্তু দেবীর অন্য মূর্তি। বাঁধনহারা পাখি। মুক্তিই মনুষ্য-আত্মার সঙ্গীত। "Freedom is the song of the soul"—স্বামীজীর কথা। দৃশ্য এখনো চিত্রপটে অম্লান, অটুট। মা-র ঘোড়ার গাড়ি এসে সদর দোরে দাঁড়াল। গাড়ি নয়, আনন্দের তুফান। ছুটোছুটি। বৃদ্ধা 'বিজয়া' গোলাপ-মা ওপরে বারান্দা থেকে বালিকার তৎপরতায় উৎসাহ-উৎফুল্ল মুখে ভুয়ো ভুয়ো শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। ওঁদের জীবনের কেন্দ্র প্রভু, মা, আর তাঁদের ভক্তবৃন্দ। যোগীন-মার যেন জ্ঞান-ভক্তি-তন্ত্রময় তনু। বড় বড় চোখ দুটি ঢলঢল ভাবগম্ভীর। মাকে গাড়ির উপর উপবিষ্টা দর্শনে প্রাণ-মন তাঁর ভরপুর। এক গাল হেসে মাকে চুমু

খেয়ে "এসো মা, এসো" বললেন। বলাটি ভারি মিষ্টি করে বলা। শ্রীপাদপদ্মে মাথা দিয়ে প্রণাম। দীর্ঘ প্রণতি। আমরা গান গাই—'নাবিক ধাবিত মৃদুপদ রাম.....'। এক্ষেত্রে রামপ্রাণার পাদপদ্ম। গঙ্গাজলে জ্যান্ত গঙ্গাদেবীর পূত পাদপদ্ম প্রক্ষালন। বসনাঞ্চলে তৎক্ষণাৎ মুছে দেওয়া। মা মাথায় হাত দিয়ে আশিস ও প্রতিচুম্বন অন্তে 'জয়া' যোগীনের হাত ধরে গাড়ি থেকে অবতরণ করলেন। যতক্ষণ না দোতলায় নিজ ঘরে পৌঁছালেন তদবধি অবগুণ্ঠন। মা সিংহবাহিনীর দুই সখী মাকে পেয়ে যেন সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে পেলেন। আত্মহারা। চিরদিন অহমিকার দানবকে দলিত রেখে মা-র কদর, মা-র মূল্য বিশেষ করে এই দুই সখী শিখিয়েছেন। গোলাপ-মা, যোগীন-মা ভক্তজীবনে দৃষ্টান্তস্থল। আদর্শ। মা এসেছেন। এর আগের এক খেপে শ্রীমার আসার পর ১৯১২ সালে একটি পত্রে শরৎ মহারাজ আমাদের মেজদি নন্দরানীকে আসামে লিখছেন—"শ্রীশ্রীমা কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরায় কাজ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে।"

সেবছর (১৯১৬) দুর্গোৎসবে শ্রীমায়ের গণভুক্ত হয়ে বেলুড় মঠে চার-পাঁচদিন তীর্থবাস। পরম আনন্দ পেয়েছিলাম। জীবনে তার আমেজ আজও মুছে যায়নি। আজও স্মৃতির বাগিচায় সদ্য প্রস্ফুটিত টাটকা ফুলের সামিল হয়ে রয়েছে। বাগবাজার মায়ের ঘাট থেকে আলাদা আলাদা নৌকাযোগে সব যাওয়া হলো। কত গল্প, কত হাসি, কত ছেলেমানুষি! উদ্বোধনে তখন ভাণ্ডারী মহারাজ খুদ-দা (খুদুমণি মহারাজ—পরবর্তী কালে স্বামী শ্যামানন্দ—রেঙ্গুন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা)। সবায়ের রসদ, ডান হাতের ব্যাপার, খ্যাঁট তাঁর হাতে। বেলুড় মঠে একসময় ওঁর মেজদা রাম মহারাজ ঠাকুরের বাজার-হাট করতেন। পাই পয়সাটির পর্যন্ত হিসাব গরমিল হওয়ার জো নেই। নিজে চোখে দেখে বা জিভে চেখে নিয়ে জিনিসপত্র কিনতেন। পাঁচ-দোকান যাচাই করতেন। দুই ভাই ঠাকুর ও মায়ের সংসারে যথেষ্ট শারীরী মেহনত করেছেন বছরের পর বছর। মনে পড়ে, খুদ-দার সঙ্গে উত্তর কলকাতার কুমারটুলি নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তখন বেলুড় মঠের পশ্চিম দিকস্থ গঙ্গা-সংলগ্ন বাগানবাড়ির

মালিক—সেই মালিকের অনুমতির জন্য গিয়েছিলাম। তখন ঐ বাগানটিকে 'সোনার বাগান' বলা হতো মালীর নামে।[২] মালিক সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে মত দিলে শ্রীমা ও তাঁহার পরিকরবৃন্দ মহাপূজার কয়দিন সেখানে কাটালেন। সেখানে মা-র সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মাও যান। আর মঠবাড়িতে পূজায় মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শিবানন্দজী, অজস্র ভক্তের ভিড়, ও বহু সাধু-ব্রহ্মচারী। গমগমে ভাব, জমজমাট। সর্বদা 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্।' রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অতগুলি দিকপালের একত্র সমাবেশ! সবার মাথার মণি মহাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা।

নেচে নেচে করতালি দিয়ে ভক্ত জমায়েত মধ্যে মুখে ঘন ঘন 'জয় মা', 'জয় শ্রী গুরুমহারাজ' ধ্বনি। দুর্গাদেবীর মধ্যাহ্ন আরতি শেষ। পঙ্গতের পর পঙ্গত ভক্তেরা বসে প্রশস্ত বাঁধানো চাতালে খিচুড়ি প্রসাদ পাচ্ছেন। কর্মীরা বসার ঠাঁই করা, সারি সারি মাটির গ্লাসে জল দেওয়া, এঁটো পাতা পরিষ্কার করে ধোয়াধুয়ি অন্তে আবার কুশাসন পাতা লাইনের পর লাইন চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন বেজার ভাব নেই, হাসিখুশি, স্ফূর্তিময় সবাই। সে একটা দেখবার জিনিস। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রেমময় পরম পবিত্র বাবুরাম মহারাজ আনন্দে মাতোয়ারা, আপনভোলা। যেন ফেটে চৌচির হবার উপক্রম। দুধে আলতা রং, অপূর্ব লালিমাময় মুখচ্ছবি, শিল্পীর তুলিতে আঁকা, যেন বাস্তব নয়। সকলকে আদর-সম্ভাষণ, প্রচুর আদর-যত্ন, আর মুখে ঘন ঘন 'জয় মা, মহামাঈ কী জয়', জয়জয়কার। চিন্ময়ী সারদা মাতার উপস্থিতিতে মৃন্ময়ী দশভূজা দশদিক উজ্জ্বল করে জেগে উঠেছেন। তপস্বী ভিন্ন মাকে ও ঠাকুরকে কেই বা বুঝবে? মহাষ্টমী, সন্ধিপূজা, মহানবমীতে কুমারীপূজা[৩] প্রভৃতি বিশেষ

---

২ এখন বাগানটি মঠের সম্পত্তি, মিসেস লেগেটের আর্থিক আনুকূল্যে ক্রীত। এখন এটির নাম—'লেগেট হাউস'। আগে যে মালি বাড়িটির দেখাশুনা করত সে ছিল উড়িষ্যার মানুষ, নাম 'সোনামণি' বা সংক্ষেপে 'সোনা'। তা থেকে 'সোনার বাগান'।—**সম্পাদক**

৩ সেসময় মঠে নবমীর দিন কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হতো।—**সম্পাদক**

বিশেষ লগ্নক্ষণে শ্রীমা দুর্গামণ্ডপের সামনে মেয়েদের জন্য ঘেরা লাইনে উপবিষ্টা হয়ে খুঁটিনাটি ক্রিয়াবহুল পূজাকার্যটি তন্নতন্ন করে দেখতেন ও হরিনামের ঝুলি হাতে জপও সঙ্গে সঙ্গে করতেন। দুর্গার নিত্য সন্ধ্যারতিটি দর্শন করা চাই-ই। রাত্রে সাধু-ব্রহ্মচারীরা যখন দেবীমণ্ডপে ভজন গাইতেন মা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুনতেন। বরাবর জীবনভোর ভজনে তাঁর পরম অনুরাগ। দুর্গাদেবীর সম্মুখে বিশালনেত্রা যোগীন-মার জপধ্যানে মগ্ন ভাবও দেখবার মতন। তাঁর ঐকালে বাহ্যজ্ঞান থাকত না। চোখে মুখে ঈশ্বরীয় নেশার রেশযুক্ত ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দজী এবং বড় মহারাজের সুমিষ্ট, সুপ্রশান্ত শ্রীমুখমণ্ডলেও অনুভূতির ছাপ দেখে ভক্তেরা মোহিত। মঠে তখন এঁরা সকলে মিলে একটি বৃহৎ সুবিশাল ব্রহ্মচক্র রচনা করেছিলেন। সবই সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে ঘটত।

মহাষ্টমীর দিন কাতারে কাতারে ভক্তবৃন্দ দিবাভাগে সারি সারি লাইন দিয়ে একে একে শ্রীমাকে প্রণতি নিবেদনে রত। যেন ছবি দেখলাম। 'মুভি'তে চিরতরে তুলে রাখবার দৃশ্য। চৌকির মতন একখানি তক্তার উপর বসে শ্রীশ্রীমা পাদপদ্ম দুখানি ভূমির ওপর ন্যস্ত রেখেছিলেন। দেখতে দেখতে বিল্বপত্র ও জবা পুষ্পের পাহাড় তাঁর পায়ে রচিত হলো। মায়ের সম্পর্কে প্রভুর বচন—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখলাম। তার মধ্যে এটিও।" মা নিজমুখেও বলেছেন—"যারা কাছে তারা বোঝে না, এ দেব অঙ্গ। এই শরীর দেবশরীর জেনো।" সারদা-রূপ ঈশ্বরীর রূপ। এধারে অবগুণ্ঠনা মা অত প্রণাম নিতে নিতে ঘেমে উঠলেন। গোলাপ-মা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলে মায়ের কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। সব শেষ হলে মায়ের ঠাকুরের মতন রসিকতা। ঈষৎ হাস্যসহ বললেন: "ও যোগীন, কত বাঙাল আসবে গো!" বাস্তবিক, সংখ্যার দিকে তাকালে পূর্ব বাংলাই ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে বেশি করে নিয়েছে। বাবুরাম মহারাজের উক্কামারা কথা: "যদি ভক্ত দেখতে হয়, পূর্ব বাংলায় যাও।"

এবার দুর্গোৎসবের উপসংহার। দেবীর নিরাজন বা বিসর্জনের প্রাক্‌দৃশ্যটি বড়ই করুণ, মর্মভেদী, হৃদয়বিদারী, কোমলতাপূর্ণ, মেদুর। উপক্রমের উলটো। শুরুতে কী প্রচণ্ড উত্তেজনা, উদ্যম, উৎসাহ।

জীবনের খরস্রোতে আলো আঁধার পরপর আসে। সুবৃহৎ প্রতিমার মুখোমুখি একখানি উঁচু চ্যাটালো রকমের চৌকির ওপর শ্রীমাকে উঠিয়ে দেওয়া হলো। মা দুর্গাদেবীর শ্রীমুখের নাগাল পেলেন। থুতনি স্পর্শ করে, যেমন আমাদের করতেন, বারবার চুম্বন ও ঘনঘন আদর করতে লাগলেন এবং অজস্র অশ্রুবর্ষণ করলেন। কৈলাসযাত্রার জন্য বিদায় দিতে প্রাণ যেন তাঁর রাজি হতে চায় না, বুক ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যশূন্য, নিস্পন্দ! মা দেবীকে তো সাক্ষাৎ দেখতেন। এতকাল কেটে গেল, আজও মুখোমুখি এই দুই দেবী আমার মনে সজীব হয়ে রয়েছেন। সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিবারের মাতামহী শ্যামাদেবী জগদ্ধাত্রী বিসর্জনকালে প্রতিমার ,কানে কানে বলেছিলেন, "মা জগাই, আবার এসো"। শ্রীমাও এক্ষেত্রে অনুরূপ অনুরোধ করে থাকবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘনঘন বহু ভক্তকণ্ঠে মা মহামায়ার জয়রব। প্রতিমা উঠিয়ে ভক্তরা কাঁধে চাপালেন। গঙ্গাঘাট-মুখী অতঃপর সকলে। চারখানি নৌকাযোগে মূল মঠের ঘাটের সামনে (স্বামীজীর ঘরের নিচে) রাত্রের তিমিরে ডে-লাইট ও গ্যাসের রোশনাই। ঢাক ঢোল, নানা বাদ্যভাণ্ডসহ বিপুল উন্মাদনার ধ্বনি। গঙ্গামৃত্তিকা থেকে অরূপী মায়ের রূপ-বিগ্রহ নির্মাণ, পরে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, চারদিনের পূজা, আরাধনা রূপে প্রাণ সংহরণ, পুনরায় গঙ্গাগর্ভেই রূপ নিমজ্জন—আকার বিসর্জন। "তোহে জনমি হন তোহে সমায়ত"—সত্য সত্য। নৌকার ওপর অনেকক্ষণ ধরে কাঞ্জিলাল ডাক্তার ও বলিষ্ঠ যুবক বশী সেনের উদ্দাম আনন্দপূর্ণ নৃত্য। মা-ও বাগানে লোহার ধাপ থেকে এবং পরে প্রশস্ত গঙ্গামুখী চাতাল থেকে বিসর্জন-ছবি অনিমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন। তারপর অন্তর্জলী পর্ব সাঙ্গ। সকলের শান্তিবারি গ্রহণ। জীবন্ত দুর্গাকে আবার অগণন ভক্তের মহাষ্টমী দিবসের ন্যায় বিজয়ার শুভশ্রদ্ধা—প্রণাম নিবেদন। পবিত্র গঙ্গা-উপকূলস্থিত মঠভূমিতে এবং আশেপাশে গভীর ভক্তির গভীর স্রোত সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হতে লাগল।

বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরের নিচে প্রশস্ত বাঁধানো চাতালের

ওপর মঞ্চ নির্মাণ করে এবারের দুর্গোৎসবে গিরীশচন্দ্রের 'জনা' অভিনয় হয়। বাগবাজারের ছেলেরাই সব অভিনয়ে নামেন। স্বামীজীর 'গৌরে' (নরেশচন্দ্র ঘোষ) প্রবীর এবং তুলসীরাম-জামাতা নারাণবাবুর অগ্নির অংশগ্রহণ স্পষ্ট মনে আছে। শিবানন্দজীর দোতলার ঘর থেকে মা অভিনয় দেখলেন, শুনলেন এবং সকলের সঙ্গে আনন্দে অংশগ্রহণ করলেন। বলরামবাবুর ভাইপো নিতাইবাবু (নিত্যানন্দ বসু—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত) দুর্গোৎসবের এই বছরের সমস্ত খরচ—এক হাজার এক টাকা—সানন্দে বহন করেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চললেও এখনকার তুলনায় সস্তাগণ্ডা ছিল।

রাত্রে প্রতিমার সামনে দেবীভজন মা দোতলা থেকে শুনে মোহিত হয়ে যেতেন, একথা বলেছি। সাধু-ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে মাতৃনাম। এক রাতের আসরের ঘটনা। মহারাজের গান শুনতে শুনতে ভাব হয়। মণ্ডপ থেকে তাঁকে ধরে জ্ঞান মহারাজের ঘরের পাশের একতলার ঘরটিতে (গঙ্গার উলটো ধারে) নিয়ে যাওয়া হয়। মা ওপর থেকে নেমে কানে নাম শোনালেন ও মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলে আবার সহজ হন। বলরামবাবুর ছেলে রামবাবুর সাদা ঘোড়া, কালো রঙের গাড়িতে মা মঠে যান এবং তাতেই কলকাতা ফেরেন। বেলুড় মঠের পুরনো, বর্তমানে বিলুপ্ত রাজসিক ফটকে গাড়ি ঢোকা মাত্র সানাইয়ের মিঠে রব, সহকার শাখা, মঙ্গল পূর্ণকুম্ভ সজ্জা, মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির উচ্চ রোলে জয়ধ্বনি মনে পড়ছে। প্রাঙ্গণে মায়ের গাড়ি থামামাত্র গোলাপ-মা তাঁর সাদা কাপড়ের আঁচলটি বিছিয়ে দিলেন। সব রকম কাজের কৌশল তাঁর জানা ছিল। শ্রীমা গাড়ির ভিতর থেকে শ্রীপাদপদ্ম দুখানি বাইরে বাড়িয়ে মেলে দিলেন। একে একে সারি দিয়ে শান্ত সংযত ভাবে সকলেই জীবন্ত দুর্গার পাদস্পর্শের সুযোগ পেয়ে, এবং সেই সৌভাগ্যে কৃতার্থ হলো। ফেরার সময়ও এক ব্যবস্থা ও দৃশ্য। যেন শ্রদ্ধা ভক্তির স্রোত বইছিল, মনে হলো। বহু ভক্ত-সমাকীর্ণ বিস্তৃত খোলামেলা বেলুড় মঠভূমি। ছুটির দিন। কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে মাকে তাঁর 'বাড়ী' উদ্বোধনে পাঠিয়ে দিলেন। শৃঙ্খলার

সুন্দর ছবি ফুটে উঠল।

শ্রীমা বাগবাজার বোসপাড়া গালাকলের পাশে, এখন অবশ্য গালার কল নেই, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ পালিতা কন্যা রাধুকে নিয়ে আছেন। [৩১ ডিসেম্বর ১৯১৮—২৬ জানুয়ারি ১৯১৯] রাধু আধা পাগল। তার শব্দ বাই। কাঠের শব্দেও রাধু অস্থির। মাকে প্রণাম করতে গেলাম। আমাদের অবারিত দ্বার। ৫৩/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং। দোতলার ওপর রাধুকে নিয়ে মা রয়েছেন একটি ঘরে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। তিনি সদাই সজাগ। আমার পায়ের শব্দ পেতেই খুব মৃদু স্বরে বললেনঃ "বাবা, আস্তে আস্তে, শব্দ না হয়।" একটি থলেতে এক্ঝুড়ি তরিতরকারি মাকে দেওয়ার জন্য যোগীন-মা সঙ্গে দেন—ভক্তদের আনীত। দেখে মা বললেনঃ "আহা বাবা, তুমি এগুলি বয়ে কষ্ট করে নিয়ে এলে? যোগীনের যেমন কাণ্ড! এখানে এত কে খাবে? ওখানে (উদ্বোধনে) ছেলেরা মেয়েরা সবাই রয়েছে, ওখানে ঢের আনাজ দরকার।" 'আপনি কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করেছি। বললেনঃ "এই দেখ না, আছি আর কেমন। বাঁখারি বেঁকিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে ধনুক করে কাঠের লম্বা তীর লাগিয়ে সারাটি দিন কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কাকের আওয়াজ পর্যন্ত রাধুকে কষ্ট দিচ্ছে। (হাসতে হাসতে) যোগীনকে বোলো, রাম অবতারে সীতাকে তীরধনুক ধরতে হয়নি, এবার রাধি আমাকে দিয়ে তাও ধরালে!"

তখন আমার ১৫ বছর বয়স। বড় ভাইয়ের আক্ষরিক লাথি খেয়ে শ্রীসারদা মায়ের ও সারদানন্দের অমৃতহ্রদে আমার পড়ে যাওয়া। এতো আত্মিক পাথেয় পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা নিয়ে তাঁদের পদতলে বৈরাগ্যাশ্রয়ীর আসা নয়। হিমেতে থেকে লেখাপড়া শিখে নিজের গাড়ি না চড়তে পারলেও স্বাধীন উপজীবিকা পাব এই আশা ছাড়া তো আর কিছু নয়। কয়েকমাস থাকতে থাকতে কৈশোর ও যৌবনের সঙ্গম বয়সে মা-র সম্বন্ধে কেমন একটা অবিশ্বাস, একটা ছোট ঝড় বলা যেতে পারে, মনের তলে তলে চাপা গুমরিয়ে উঠল। কে ইনি? দিনরাত উঠতে বসতে দেখছি। গা সওয়া। যত্ন করেন। খুব প্রসাদ খেতে দেন। এঁর মধ্যে দেবীত্ব-

দেবীত্ব কোথায়?

ম্যাট্রিক পাশের পর ১৯১৭-র শেষে কিঞ্চিৎ কলেজী অভিমান আসে। একটু 'কথামৃত' ওপর ওপর ওলটাচ্ছি, পল্লবগ্রাহী ভাবে 'লীলাপ্রসঙ্গ' দেখছি। সায়েন্সে ঈশ্বর তত্ত্ব অগম্য। সংযম দীর্ঘসাধন তপস্যা না থাকলে এ পথের সবটাই অন্ধকার ঠেকবে, হেঁয়ালী বোধ হবেই। অহমিকার তো মাথামুণ্ডু নেই। এলেই হলো, যেন মাকে বোঝবার যোগ্য হয়েছি, শরৎ মহারাজকে তো কোন ছার? মা পুজোর আসনে একাগ্র হন, কাঠ হয়ে বসে প্রাতে ধ্যানে বসেন বটে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ঘনঘন বাহ্যজ্ঞান লোপ কোথায়? টাকা ছুঁলে হাত বাঁকে কই? এ কি দলপাকিয়ে জগদম্বা খাড়া করা? চারহাত দেখতে পেলে তো হয়, বা দশহাত। অবতারের মহাশক্তি হতে হলে নিরিখ মানদণ্ড কি, তা যেন আমার জানা-ই! কপালের জোরে শিকে ছেঁড়ার মতো রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল, তার থেকেই কি বাকিটা গড়ে উঠল? মাস্টার মশায়কে একজন বললেনঃ "আপনার প্রভুর ঘনঘন ভাব হতো। আপনার তো ভাব দেখি না।" তিনি শান্ত জবাব দিলেনঃ "কে বাবা তোমার জন্য ভাব করে বসে থাকবে?" মায়ের সব জীবনটা তো তখন আমার অজানা। তখন কে জানে নির্বিকল্প সমাধি না হলে সম্পূর্ণ অহং যায় না। মায়ের জীবনের পিছনে কত কঠোরতা, কত তপস্যা, কত ভাবসমাধি, স্মিত সমাধি, তার খবর তখন করি নাই। তখন কে জানে যে এক হিসাবে মা অহরহ সমাধিস্থা। প্রভু সমাধির সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ "সমস্ত মনটা একমুখী হওয়া, আর বাহ্য দৃষ্টি থাকে না—এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।" মা তখন সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থা। মনটা ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চাওয়া অবস্থায়। সেই মুখচ্ছবি স্মৃতিতে টেনে এনে এখন বুঝি। ফ্যালফ্যালে। চোখদুটি তখন দেখে আনমনা মনে হতো। প্রকৃত, ঈশ্বরমনা।

অন্তিম পর্ব তখন তাঁর লীলার। পৃথিবীতে অকাতরে শক্তি বিলিয়ে স্বকীয় জীবনলীলা গুটিয়ে আনছেন। বাইরে আপাতত কতকটা সহজ ভাব। বহিরঙ্গ দেখলে ভাব সম্বরণের অসীম শক্তি। তখনো বুঝিনি, মা দেবী বটেই। মানবীও। পাকা সোঽহং পর্দা ছুঁয়ে, প্রভুর দাসী হয়ে প্রভুর

মহিমা ছড়াচ্ছেন। নিম্নগ্রামে নেমে লোকব্যবহার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, হঠাৎ বিয়ে নয়, ছকবাঁধা খেলা। যুগে যুগে ইনিই শক্তিস্বরূপিণী কুটোবাঁধা, সুযোগ্যা। হেঁজিপেঁজি নয়। প্যালা পঞ্চার কাছে দিব্যভাব মা কেন দেখাতে যাবেন? দীক্ষিত বেতনভোগী বাজার সরকারকে [চন্দ্রমোহন দত্তকে]ঃ "তোমার তত্ত্বকথা মাথায় ঢুকবে না। যা বলি, সওদা নিয়ে এস।" যার সঙ্গে যেমন, তার সঙ্গে তেমন। লঘুতা তাঁতে তো ছিল না। বিষয়ীকে প্রভু বলেনঃ "ঠিক বলেছ। নরেন-টরেন এরাই আমার মাথা খেলে। অবতারের আবার ক্যাঙ্গ্যার!" শুদ্ধ যুক্তিতে অবতারবাদের নাগাল মেলে না। মন থেকে স-ব কাম-কাঞ্চন রাগ তিরোহিত নরেন্দ্রাদি তাঁকে ও মাকে বোঝেন। প্রভু বলতেনঃ ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা—আমাকে ভক্তি-ভক্তের স্তরে রাখ, বিলাস করব, একেবারে জড় করে রেখো না। এর মানে ব্রহ্মজ্ঞান তুচ্ছ নয়। মারও তখন পাতলা 'আমি' নিয়ে কৃপা-বিতরণ স্তরে অবতরণ। সাধিকারূপে সর্বোচ্চ গ্রামে মা ওঠেননি তা নয়। প্রকৃতস্থ ও সমাধিস্থ—দুই স্তরে আনাগোনা। সর্বদা ভিতরে যোগাবস্থা, লোকব্যবহার মধ্যেও। মানবতা স্বীকার করে নিয়েই লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর ও মায়ের সাধন-ভজন। ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্য কখনো এক প্রকার নয়। সচরাচর ওঁদের মন কণ্ঠের নিচে নামে না। প্রভুর দু-চারবার যা নেমেছিল, তা মানবতা-নিবদ্ধ অহমিকা-মেঘ আসার দরুণ। একদিক দিয়ে জীবকে সাহস দেওয়ার জন্য। পরব্রহ্মের সবটা অবতারেও প্রকট নয়। অনেকটা প্রকট।

যখন দিবারাত্র তাঁর সান্নিধ্য মা ঘটালেন তখন তিনি ৬২ এবং আমি ১৫ বছরের বালক। কিন্তু পবিত্র বালকহৃদয়ে তখন বিষয়বুদ্ধির লেশ ঢোকে না। সন্দেহ আসা খুব স্বাভাবিক। এসেও ছিল। বছর দুয়েক পর। কিন্তু তাঁরই কৃপায় তাঁর কাছে থাকতে থাকতে তাঁর অসামান্যতা, সমরসতা, অত পুজো পেয়েও নিরহঙ্কার ভাব, সর্বজীবে অপরিসীম দয়া—কিছুটা ধরতে পারলাম। আপনা থেকেই তাঁকে নানা অবস্থায় দেখতে দেখতে একটা প্রবল শ্রদ্ধা অন্তর অধিকার করল। তারই ফলে সর্ব অন্তঃকরণ দিয়ে নিত্য অভয়পদকমলে মাথা রেখে দীর্ঘ প্রণাম করতে

লাগলাম দিনের পর দিন। মা জানতেন এই ভক্তিভরে লুণ্ঠনের অর্থ। নিত্য নিজেকে তাঁর পায়ে ন্যস্ত রাখা। এই তো সম্যক ন্যাস। তাই কি তাঁর দয়ার উদয় হলো? আর মা বুঝিয়েছেন, শরণাগত না হলে আত্মসমর্পণ না করতে পারলে তত্ত্বে, অবতারতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে অনুপ্রবেশ হয় না।

মনে পড়ছে আমার ওপর মায়ের অহৈতুকী কৃপা বরিষণের কথা। ১৯১৮। শ্রীমা রাসবিহারী ব্রহ্মচারীকে বলেনঃ "ওকে আমার নিকট দীক্ষা নিতে বল।" কিন্তু অবিশ্বাস, সংশয় বশেই আমাকে তা বলা হলে আমি বললামঃ "এখনো দীক্ষা নেওয়ার মন হয়নি।" তার দু-বছর পরে যেদিন মন উতলা হলো, দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতা জাগল এবং ঠাকুরঘরে মাকে নিবেদন করতে গেলাম, কিন্তু বলা হলো না। রাধু গোলমাল তুলে গোল বাঁধাল। সেইদিনই মায়ের শেষ রোগশয্যা গ্রহণ, শেষ ব্যাধির দৌরাত্ম্যে। অশরীরী হয়েও পর বৎসর মায়ের পাশের ঘরে শরৎ মহারাজের খাটের ওপর শায়িত আমাকে স্বপ্নে তাঁর কৃপা হলো। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। মনের মধ্যে অদ্ভুত শান্তিধারার প্রবাহ বয়ে গেল। কোন জিনিষ পাওয়ার অত্যুগ্র ব্যগ্রতা অন্তে সেই জিনিস হস্তগত হলে যে শান্তি আসে সেই ধরণের শান্তি। শরৎ মহারাজ যখন সেই জিনিসই ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ কানে শোনালেন, আবার সেই শান্তিরই অনুভব। অধিকন্তু আরো একটি ভাব হৃদয়ে এল। এঁদের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে জীবন ধন্য করতেই হবে।

কর্মস্রোতের মাঝে মাকে দিনরাত দেখে উপনিষদ বোধ সুগম, সুকর, সহজ হলো। অদ্বৈতরূপিণী মা আমাদের ১৪ বছর তাঁর পদচ্ছায়ায় রেখেছিলেন। দুটি চোখ দেখলে মালুম হতো চৈতন্য-নদীতে ডুব দিয়ে সদ্য সদ্য উঠেছেন। চোখের পাতায় পাতায় অনুভব উপলব্ধি, সত্যপ্রাপ্তির রেশ জড়ানো মাখানো। মা-ই সকলের আশ্রয়। অথচ মায়ের গিন্নিমো, কর্তামি এসব একদম নেই। Un-contaminated—প্রকৃত নির্লেপ। এর জুড়ি কোথায়? সবের মধ্যে থেকেই সবের উর্দ্ধে। আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধের দ্বারাও লিপ্তা নন। নিম্নমুখী মোটেই নয়। কলকাতাতে তো মা যখন 'নাবালিকা', গোলাপ-মা, যোগীন-মা, শরৎ মহারাজের আন্ডারে,

তখন জপরতা মাকে বা ধ্যানরতা মাকে দেখে তাঁর দেবীত্ব আমাদের ভূয়োভূয়ঃ পরিষ্কার হয়ে গেছে চিরদিনের মতন।

মা ১৯১০-এ উদ্বোধনে বউমা। অবগুণ্ঠনে আবৃতা। বালক আমার কাছে কিন্তু মা জয়রামবাটীর ঝিউড়ি। অতি নিকট জন, সত্যকার মা। জয়রামবাটীতে মাকে দেখিনি বলে আমার বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত খেদ নেই। ১৪ বছর কলকাতাতে মাকে আপন বোধে পাওয়া এবং শেষ চার বছর দিনরাত নিরন্তর কাছে থাকা মহাভাগ্য। এই মূলধন এখনো ভাঙিয়ে চালাচ্ছি।

ভক্ত দুর্গাবাবুর (ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ) একটি বিবাহিতা তনয়া জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে সন্দেহজনকভাবে শ্বশুরবাড়িতে মারা যাওয়ায় পিতাকে কাতর দেখে শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেনঃ "আচ্ছা, ওকে কখনো মার কাছে এনেছিলে?" তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ মহারাজ, ছেলেবেলায় মা ওকে কোলে করেছেন— কতবার! কত প্রসাদ খাইয়েছেন।" তখন মহারাজ হাঁফ ছেড়ে বললেনঃ "তবে আর কি ডাক্তার? যেভাবেই শরীর যাক ও মেয়ের কখনো অসদ্গতি হবে না। নিশ্চিত জেনো।" ললিত চাটার্জীর [মায়ের বীরভক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়] কথা মনে পড়ছে। তখন শীতকাল, ১৯২৩। অন্তিম সময়ে তিনি বাক্‌রুদ্ধ। শিয়রে শরৎ মহারাজ সময় শেষ হয়ে আসছে দেখে তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে তিনবার উচ্চকণ্ঠে বললেনঃ "ললিত, মাকে ভুলো না, মাকে ভুলো না, মাকে ভুলো না।" মা মানে বোধিতে ভরা একটি বাক্তি। মাতৃবোদ্ধা শরৎ মহারাজ বলতেনঃ "ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করা চলত। মা-র সঙ্গে চলে না।"

১৯০৬ সালে আমার ৬ বছর বয়স। সেদিনের কথা মনে আছে। বাবা মারা গেলেন চোখের সামনে দিনদুপুরে বেলা ১টা। বড় বড় বোনেরা সব কান্নায় আছাড়-পাছাড়। করুণ দৃশ্য। বাবা রোগশয্যায়, সুপ্রশস্ত, সুবিশাল বক্ষ, দৃঢ়তনু ভাবগম্ভীর শরৎ মহারাজকে প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহে যোগীন-মার সঙ্গে দেখতাম। পাঁচ পাঁচটি নাবালক পুত্র। আমাদের গর্ভধারিণী যদি যোগীন-মার সবেধন নীলমণি না হতেন, তাহলে বোধহয় আমাদের প্রতি

যোগীন-মার এতটা টান থাকত না। সর্বোপরি পরমহিতকারিণী যোগীন-মার যোগ, যোগীন-মার ভরসা, ঠাকুর-ঠাকুরানীকে জীবনভোর প্রযত্নবলে আপন করে পাওয়ার সুযোগ আমাদের মিলত না। কলকাতার বহু বহু অনাথ বালকদের মতো সংসারের স্রোতে কবে ভেসে যেতাম। যোগীন-মা স্বয়ং দেব-দেবী রক্ষিত। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে আমরাও মায়ের দোরধরা। সেই বেদীতেই আমরা উৎসৃষ্ট হলাম। শ্রীশ্রীমার পদপ্রান্তে গর্ভধারিণী শ্রীমতী গনুসহ আমরা বাগবাজারে গেলাম। আমাদের পারিবারিক অভিধানে 'বাগবাজার' মানেই শ্রীমা ও শরৎ মহারাজ। মায়ের তখন ভাড়াবাড়ি। রামকৃষ্ণ লেন যেখানটায় বাগবাজার স্ট্রীটে পড়েছে, ঠিক সেইখানে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে। দোতলায় মা থাকতেন। মনে আছে, মা কোলে নিলেন, মিষ্টি খেতে দিলেন। তত্ত্ব সেবার বয়স তো নয়, মিষ্টি সেবার বয়স। তবে যাঁর কাছে যাওয়া হচ্ছে তিনি সচল জ্বলন্ত জীবন্ত তত্ত্ব। সেই কি কবিকঙ্কণ কথিত "কোল দিয়া আশীর্বাদ কৈলা নারায়ণী?" আলবৎ তাই। মা নিজ মুখে বলেছেনঃ সর্বজীবে মাতৃভাব ছড়াবার জন্য এবার ঠাকুর আমাকে রেখে গেছেন। নাবালক, নির্বোধ, পিতৃহারার দল মায়ের সত্তার মধ্যে দেহভাব বর্জিত অথচ অফুরন্ত স্নেহধারাপ্লুত আসল মা দেখেও তখন নিশ্চয়ই দেখল না। কারণ, সোজা কথা—এটি সাধন-সংবেদ্য।

তারপর উদ্বোধন বাড়ি তৈরি হতে না হতেই কলকাতায় প্রথম বেরিবেরি মড়ক। শ্রীমতী গনুর ঐ রোগ হলো। ছোট ভাই বঙ্কুর হলো। পরবর্তী পরিচ্ছেদ মঠের হিল্লেতে বায়ু পরিবর্তনে কাশী যাওয়া। সেখানে ১৯১০ সালে পর পর দুই ভাই এবং শেষ গর্ভধারিণীর কাশীলাভ। শ্রীমাকে প্রথম ঐ সালেই তাঁর নিজের বাড়ি উদ্বোধনে দর্শন। তখন আমি সদ্য মাতৃহীন, জ্যেষ্ঠ ভাই ও তাঁর বধূর নিত্য নতুন নির্যাতনে উত্যক্ত, অবসন্ন, মনমরা। গৌহাটিতে এক ভগ্নিপতির অন্নপুষ্ট হওয়ার ফাঁড়া থেকে মা-ই যেন টেনে আনলেন। সেখানে গিয়ে কোনমতেই মন টিকল না। সেই অবাঞ্ছনীয় বাসপর্ব ভেঙে দিয়ে মা-ই টেনে আনলেন। এর ভিতর আর কারো হাত নেই। বাপ মরার পর শ্রীমা-র পাদপদ্ম, মা মরার

পর দিদিমার—মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—সেই শ্রীশ্রীমার অভয় পদতল। স্বামীজীর ভাষায়—"সুচরণম্ অভয়ঃপ্রতিষ্ঠম্"। মা-ও তখন একাধারে শ্রীশ্রীদেব ও শ্রীশ্রীদেবীর দুটো অংশ লীলাভিনয় করছেন। ঠাকুর মা-তে লীন। দ্রষ্টা রাখাল মহারাজ বলরাম মন্দিরে সেবককে বলছেনঃ "মাকে দর্শন করে আয়। ঠাকুরকে দেখা হয়ে যাবে। ব্রহ্ম ও শক্তি একাধারে মা।" এখন যত দিন যাচ্ছে, শ্রীমায়ের কৃপায় মাকে একটু একটু বুঝছি। প্রথমে এই বোধ মাদৃশ হীনজনের তো থাকার কথা নয়।

কে এই মা? গণনায় বলে গোলাপ-মা, যোগীন-মা দুজনকেই শ্রীমা অপেক্ষা বয়োধিকা। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারে তা বোঝার উপায় ছিল না। যোগীন-মা বালিকার মতো সেই প্রথম দিনে শ্রীমার কাছে অপগণ্ড অনাথ নাতিদের জন্য অনবরত চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমরা তো ভ্যাবাচ্যাকা। আমাদের সামনেই কাতরে নিবেদন করলেনঃ "মা, এরা অনাথ। আগেই পিতৃহীন, সদ্য সদ্য মাতৃহীন। এদের কেউ নেই, কি হবে? কি করে মানুষ হবে? আজ থেকে তুমি এদেরও মা।" ছয় বছরের প্রথম দর্শনে একটু যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছিল। এবার আজকের দর্শন সুস্পষ্ট। তখন তো আর বুঝি না, কাশীর মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে যে মাকে দাহ করেছি তাঁর চেয়েও এই মা বড় মা! যতদিন বাঁচব, মায়ের সেই মধুমাখা, ব্যথামধুর, সমবেদনাময় মূর্তি মনে আঁকা থাকবে। মুখমুকুর সুপ্রশান্ত, সুসমাহিত। বারবার আমাদের মাথায় শ্রীহস্ত বুলিয়ে, থুতনি ধরে চুমু খেয়ে সুমিষ্ট স্বরে দিদিমাকে বললেনঃ "ভয় কি মা? তুমি অত উতলা হয়োনি এদের জন্যে। এদের ঠাকুর আছেন।" প্রাণে প্রাণে আশীর্বাদ ও প্রসাদ দানে ধন্য করলেন। আমাদের ভয় নেই, ঠাকুর আছেন। আসল মা, বিদ্যাজননী আছেন। এ মহাবাক্য অভয়াত্মক আপ্তবাক্য। পরম আশ্বাসবাণী সিদ্ধমন্ত্র হৃদয়স্থ করতে আমার প্রায় ৭০ বছর লাগল।

অনেক ওলোটপালটের পর, অনেক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষাগ্নি থেকে মুক্ত হয়ে দেখছি, মা-র কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বেদবাক্য। অকাট্য।

He met Jesus and the moment one word made him free.

প্রথম দর্শন যেন দেবীপ্রতিমার একমেটে। দ্বিতীয় বার পতিতপাবনী

নারায়ণীর সুস্পষ্ট পাকা দর্শন। কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ তপস্যা দহনে দহনে মা বুঝিয়েছেন, এখনো বোঝাচ্ছেন, এ শুধু প্রসাদ দেওয়া মা মাত্র নয়, হেঁজিপেঁজি মা নয়, মাছি-পশুপক্ষীর মা নয়। ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রী মহামাতৃকা, ত্রিভুবনতারিণী। উদ্বোধনে মায়ের দলে বালককে একরকম ভর্তি করেই নিলেন। অলক্ষ্যে নীরব গণভুক্তিকরণ-কার্য সুসম্পন্ন হলো। যিনি পল্লীনিবাসী শ্রমজীবি মুসলমান আমজাদের মা, তিনি যে আমাদেরও মা হবেন তা তখন বোঝা না গেলেও আজ অতি সুস্পষ্ট। ঘটনা ঘটে যায় সদ্য সদ্য যার অর্থবোধ হয় না। সময় লাগে। গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি হয় বহু বহু পরে। মাস্টার মশায় বলতেনঃ "মা নিজের হাতে প্রসাদ দিলেন, এর অর্থ মা প্রসন্না হলেন।" আজ জেনেছি, মা চাউনিতে মানুষকে ভক্তিপ্রসাদ, মুক্তিপ্রসাদ দেওয়ার হিম্মত রাখতেন। সচরাচর বহিরঙ্গের কাছে বিনয়ের আবরণে নিজ প্রকৃত সত্তাকে লুকোতেন মাত্র। মায়ের এই অহেতুকী কৃপার কথা অন্তরের কথা— একথা কি কোনদিন সম্পূর্ণ বলা যাবে? মনে তো হয় না। ৭৬ বছর বয়স পূর্তির পরে আজ শেষ পাড়ি দেওয়ার রসদ সামনে নিয়ে তা-ই বুঝছি।

মায়া-জননী আর নিত্যা-জননী। তেজী চিন্ময়ানন্দ স্বদেশী শচীনের মহাপ্রয়াণের ক্ষণ। শেষ শ্বাস উপক্রম। সকাল বেলা শ্রীমা ওপরে। রাত জেগে শচীনের মায়া-গর্ভধারিণী মা নিদ্রাগতা। নিত্যা-জননী মা সারদাদেবী বললেন দৃঢ়কণ্ঠেঃ "ওকে ডেকোনি। কেঁদে বাছার যাওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটাবে। তোমরা ঠাকুরের নাম করতে থাক।" এই ছবি মনের পটে এখনো আঁকা আছে। আরো দু-চারটি খুচরো ঘটনা। মা-র দুটি ছেলে গোলমেলে ত্যাগপন্থী শিষ্য। একজনকে মা বললেনঃ "বাবা, তুমি ২ নম্বরের সঙ্গে মিশো না। ও তোমার বড় ক্ষতি করবে।" উত্তরে ১ নং বললেনঃ "কেন মা? ও তো আমার গুরুভাই।" মা বললেনঃ "তা হলে কি হয় বাবা? সব সত্তা আলাদা আলাদা। থাক আলাদা।" ১ নং পরে বলতেনঃ "জীবনে মার কথা অমান্য করায় অকথ্য কষ্ট ২নং আমাকে দিয়েছে।" তাঁদের কৃপার দ্বার অবারিত। কিন্তু কৃপা হজম করা সহজ নয়। দেবালয়ে বিড়াল বাস করে। বিড়ালের হরিভক্তি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে

বিশ বছর যে লোক জড়িয়ে ছিল, সে কিন্তু বিবেকানন্দ বনে নাই। কিন্তু তাঁরা কৃপা করেন।

শরৎ মহারাজ একদিন আমাকে বলেছিলেনঃ "কৃপা যদি মানো, তাহলে জেনো, কৃপায় কোন কন্ডিশন, কড়ার নেই। কৃপা অহৈতুক।" ব্যাপার সত্য সত্যই তাই। হিসেবী বুদ্ধিতে খতিয়ে এসব বোঝানো দুষ্কর। অথচ কারণবাদী যুক্তিসর্বস্ব আমরা। স্বভাবতই বিশ্লেষণরত অনুক্ষণ। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দশ বছরের ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা ও নিয়তবাস প্রসঙ্গে যত ডুব দিচ্ছি, ততই কৃপার ব্যাপার দেখে তাজ্জব বনছি। ভাগ্যিস সবচেয়ে ছোট ছিলাম, তাই অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। মা কোনদিন বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। গর্ভধারিণীকে তিনি হার মানিয়েছেন।

আমার জীবনে পিতৃমাতৃহারা হওয়ার পর প্রথম জ্যেষ্ঠ সহোদর (যার প্রথমা কন্যা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়) একান্তই পর হয়ে দাঁড়াল। একই বাড়িতে থাকলেও, সহোদর যে 'ফুট'-এ হাঁটে, আমি তাকে দেখে ইচ্ছে করেই উলটো 'ফুট'-এ যাই, তার হাওয়া যাতে গায়ে না লাগে। তখন সদ্য মাতৃহীন। তার থাপ্পড় লাথি খেতে খেতে নিত্য হয়রান হচ্ছি। পুরো পাঁচ বছর। এ যেন আমার সংসার রোগের পাঁচবছর ভোগকাল। আবার পট পরিবর্তন। মা-র ও শরৎ মহারাজের সান্নিধ্যে গেলেই অপার স্নেহ। স্নেহই বলব, আর কি নাম দেব ভাষা পাই না। মানুষের আকার হলেই মানুষ হয় না। নিজগৃহে স্নেহের অত্যন্ত অভাব। সঙ্গে সঙ্গে মঠগৃহে ঐ স্নেহ সমবেদনারই প্রাচুর্য, যা দিয়ে জীবনের ময়দা মাখা হবে। দশ থেকে পনের বয়সে মা-র কাছে সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া, পাদস্পর্শ করার সুযোগ লাভ হওয়াতে কি সুন্দর যে ভক্তি-বুনিয়াদ আস্তে আস্তে মা গাঁথতে লাগলেন তা আজ বেশ সুস্পষ্ট। মস্ত সুবিধে পাওয়া গিয়েছিল বহু লোকের ভিড়ে মাকে প্রণাম করে পালানো নয়। মা চিনলেন কি না চিনলেন সেভাবে যাওয়া নয়। যোগীনের কচি কনিষ্ঠ নাতিরূপে নগণ্য হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়া-আসা। তৎসং থাকবেই। মা-র বিশেষ অনুকম্পা, বিশেষ নজর।

দিনে দিনে মহাকাল এগিয়ে চলে। ক্রমশ ১৯১৫ সেপ্টেম্বর মাস এগিয়ে এল। জ্যেষ্ঠের সাংসারিক কূটনীতি চরম পর্দায় উঠতে লাগল। তারিখটা মনে নেই। পরন্তু আমার জীবনের জরুরী তারিখ। সেদিন তাঁর পত্নীর কি ফরমাস না খাটার দরুন আমার সঙ্গে তকরার হয় দুপুর বেলা। তিনি আমার প্রতি একান্ত বাম হলেন। বিকেলে মালিক বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে আমার নামে অভিযোগ হলো। বাবু সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা। আমাকে পদাঘাত। তার ফলে দু-তিনটি ধাপ নিচে ছোট সিঁড়িতে পড়ে গেলাম। ওপরে উঠতে দিতে একান্ত নারাজ।—"তুমি এখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। তোমাদের ও সাধু-ইজম ফাদু-ইজম আমি মানি না। এখানে আর থাকা হবে না। অনেক বরদাস্ত করেছি, আর না।"—কঠোর বাস্তব! বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়।

'আমার বাড়ি'—এই যে বুদ্ধি, বাড়ি-ভাগ, গেহবন্ধন—এসব মায়ার এক মস্ত জট। মা যে অত সকালে বন্ধন কাটছেন, তা তখন তো বুঝি না, এখন বৃদ্ধ হয়ে খানিকটা বুঝি। মা-র কৃপায় দৃষ্টি পালটেছে। বাড়ি থেকে আমাকে তাড়ালে, পৌগণ্ডের ভাবালুতায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে মা-র বাড়ি ছুটলাম। মা তখন দেশে। শরৎ মহারাজের দোতলা নতুন ঘরটা তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। কাঁচা আছে কিছু। তিনি পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দোতলার ডানদিকের ঘরে রাতে শয়ন করেন। নিচে ছোট বৈঠকে বসেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম ও লেখাপড়া করেন। আমাকে আলুথালু উত্তেজিত অবস্থায় দেখে বললেনঃ "কিরে! তুই এই সন্ধ্যের সময় হঠাৎ?" বৃত্তান্ত শুনলেন। বললেনঃ "যাক, তার আর কি হয়েছে? তুই এখানেই থাক।" মা-র প্রতিনিধি, মা-র চিহ্নিত ভারবাহী, ভাববাহী শরৎ মহারাজ একেবারে বাহ্য হৈচৈ বর্জিত। মাতৃপ্রেমে বিগলিত হৃদয়ে রাত্রে নানারকম খাওয়ালেন। তাঁর ঘরে (এখানেই পীড়িত পূজনীয় শশী মহারাজকে দর্শন করেছি, গোলাপ-মারও এই ঘরেই পরে দেহান্ত হয়) নিজে বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে গুঁজে দিয়ে কাছে শোয়ালেন। সকালে উঠে কোথায় শৌচে যেতে হবে, কোথায় মুখ ধোয়া, সব বুঝিয়ে দিলেন। মাতৃহারাকে মাতৃস্নেহের পুষ্টিদানের জন্যই শ্রীমা ও শরৎ মহারাজ।

মা বাড়ির গাঁট কেটে দিলেন—তারিখ টোকা না থাকলেও, সেই স্মরণীয় শুভ পুণ্যদিনে। সেটা ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর। ডিসেম্বরেই মা এসে পড়বেন দেশ থেকে। শ্রীশ্রীসারদা পীঠে পৌগণ্ডের অনুপ্রবেশ লাভ। দিবারাত্র থাকার অধিকার। পীঠদেবতা পীঠশক্তি—মা আর তাঁর দ্বারী শরৎ মহারাজের, গোলাপ-মার নিত্য সঙ্গলাভ। রোদনের মধ্য দিয়ে ক্লেশতপ্ত হয়ে মহামাতৃকার আনন্দলোকে আগমন। কে জানত তখন, রামকৃষ্ণ-উপমার জীবন্ত প্রতীক সারদা-মা ও তন্নামানন্দ বাগবাজারে অতি নিকটে আধ্যাত্মিক চুম্বকের দুটি সমুন্নত সুমেরু পর্বত নিঃশব্দে তিষ্ঠমান। তাঁদের কাছে যাওয়া এবং বহু বছর সঙ্গে রাত্রিবাসের অর্থ—তাঁদের অলক্ষ্য প্রভাবে ভোগ-কামনা-কালিমাময় আমাদের দেহ-মন পোতাশ্রয়ে সঞ্চিত অবিদ্যা অজ্ঞানের বদ সংস্কারস্তূপ—কুকর্মের যত লোহালক্কড়, পেরেক, স্ক্রু ইত্যাদি সবকিছু ক্রমশ আলগা করে সমূলে তাঁরাই উপড়ে দূর করবেন। ঐ বছর শেষাশেষি মা এলেন জয়রামবাটী থেকে উদ্বোধনে।

মা বলতেনঃ "কারুর ভাব ভাঙতে নেই।" ১৯১৬ সালের একটি ঘটনা। পাচকের ফর্সা ধুতি, মনটা ময়লা, চরিত্র মলিন। শ্রীমা ভাতের হাঁড়ি ছোঁয়াতে কিছুতেই সে ভাত খেল না। শ্রীমা তো অস্থির—"আহা, কি করলুম, বামুনের ছেলের খাওয়া হলোনি!" সে পয়সা দিয়ে দোকান থেকে খাবার কিনে খেতে যায়। গোলাপ-মা যত বলেন "উনি কুলীন বামুনের মেয়ে, তুই খা গুপীনাথ, কিছু খারাপ হয়নি ওঁর ছোঁয়ায়।" কে শোনে? শেষে বলে কি—"আমাদের উৎকল বামুন তো নয়!" উদ্বোধনে মা কালো পাথরের খোরায় অন্ন খেতেন। রূপোর ছোট একটি বাটিতে ঠাকুরের প্রসাদী গাওয়া ঘি, যা তাঁকে দেওয়া হতো, দেখতুম আলুভাতে ঘি দিয়ে মেখে তাড়াতাড়ি একটু মুখে দিয়েই বলতেনঃ "ও গোলাপ, ছেলেরা সব বসে আছে, দিয়ে এসো।" মায়ের প্রসাদ প্রথমে মুখে দিয়ে তবে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ছেলেরা খাওয়া শুরু করতেন। তার ফলে ঘি একটুও মা-র পেটে যেত না।

বাংলাদেশের এক মহতী ধর্মমেলা শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব। গঙ্গার

পশ্চিম কূল আলো করে প্রতি বছর এই মেলা বসে বেলুড় মঠে। খুব ঘটা, খুব ধুমধাম, খুব কীর্তন, খুব ধর্মালোচনা, খুব দোকানপাট। অধিকারিভেদে সর্বত্র যাতে ইচ্ছা যোগ দাও। ঐ উপলক্ষ্যে তখন হোরমিলার কোম্পানির ঐ উপলক্ষ্যে চালু জাহাজেই কাতারে কাতারে নরনারী যেত, আমরাও যেতাম। উদ্বোধনের সাধুরা আমাদের free ticket দিতেন প্রতি বছর। শ্রীমা সকাল সকাল একটু মেলাভূমি বেড়িয়ে দেখে প্রায় চার ঘণ্টা আন্দাজ আন্দুল কালীকীর্তন আগাগোড়া বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন। ভজন তাঁর বরাবরই প্রিয় বস্তু। কোন কোন বছর পুরনো ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে, কোন কোন বছর মঠবাড়ির দোতলায় মহাপুরুষের ঘরে বসে। একবারের আসরের কথা মনে পড়ছে। কালীকীর্তন খুব জমেছে। মঠের পরিবেশই আলাদা—ভবতারিণী-বাহিনী, মঠকূল-বাহিনী মা জাহ্নবীর সামনে। অগণন ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ। পূজনীয় রাখাল মহারাজ দু-একখানি গান মণ্ডপে সকলের সঙ্গে বসে শুনলেন। ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর ভিতরে উঠে যান। বহিরঙ্গের কাছে ভাব সংবরণই তাঁর স্বভাব। শ্রীমা দোতলা থেকে বলে পাঠালেন, 'দয়াময়ী হয়ে গো মা' গানখানি তাঁর বড়ই প্রাণস্পর্শ করেছে, আবার গাইতে বললেন। সেদিনের যোগাযোগ দুর্লভ। মহড়ার প্রধান গায়ক মণি ভট্টাচার্য। দু-চোখে দরদর মাতৃভক্তির সুরধনী ধারা। ইস্পাতের মতো ত্রিসপ্তক কণ্ঠ। যেমন ইচ্ছে চড়ানো, নামানো করায়ত্ত। কণ্ঠে মধুক্ষরণ অবিরাম। ইনি আমাদের এই প্রদেশের কালীকীর্তনের ভগীরথ। কালীনাম পদাবলী তাঁরই মাতৃসিদ্ধ পূজ্যপাদ পিতৃদেব 'প্রেমিক' মহেন্দ্রনাথের অমর রচনা। আর আসরের তারিফকারিণী শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা। আর আছেন রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং। "রাখালের দল নিয়ে রাখাল রাজা / গোষ্ঠে এসেছে সখী কুসুমে সাজা।" মণিকাঞ্চন যোগ। গায়কদের অহো ভাগ্য। মণিবাবুর মতো নিরভিমান পরমগুণী নির্লোভ ব্রাহ্মণ বড় একটা আর চোখে পড়ে না। জনস্রোতের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের 'বডিগার্ড' গোলাপ-মাকে খুব মানাত। আমরা ফ্যালফ্যাল করে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকতাম। যেন এ রাজ্যের লোক নন।

১৯১১ সাল হবে। মায়ের ভাইপো ভূদেব আমাদের প্রায় সমবয়সী। ছেলেবেলায় দেখতে অপূর্ব শ্যামশ্রী। যেন কষ্টিপাথরে কালো শিশু কেষ্ট ঠাকুরটি। তার শখ উদ্বোধনে মায়ের ঘরে দুর্গাপুজো করবে। মাকে বলল ঃ "ও পিসিমা, তুমি ব্যবস্থা কর।" মা একটু চিন্তা করে বললেন ঃ "এই ছোট জায়গায় প্রতিমা এনে তো পুজো সম্ভব নয়। তা হবে, ঘটেপটে তোর দুর্গাপুজো হবে। প্রকাশকে (ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র—শরৎ মহারাজের সহোদর) বলব, পুজো করে দেবে। তুই বসে বসে দেখবি, শুনবি, আহ্লাদ করবি, তা হলেই হলো।" আমরা বাড়ি থেকে ভূদেবের নেমন্তন্নে যোগ দিয়েছি। শ্রীমা আমাদের সমবয়সী কয়েকটি ভূদেববন্ধু বালককে কলাপাতায় হাতে করে খুব যত্নের সঙ্গে প্রচুর প্রসাদ বণ্টন করলেন। শুভকাজে, দেবকর্মে উৎসাহ দেওয়ার ভাব মায়ের অফুরন্ত।

আর মনে আছে জ্ঞান মহারাজের ছেলের দল সুদূর জানবাজার থেকে জ্ঞান মহারাজের নির্দেশে দুর্গা প্রতিমা বিজয়ার দিন মাথায় বহন করে বাগবাজারে শ্রীমাকে দেখিয়ে খুব ঘটা করে জাঁকজমকে বিসর্জন দিতেন। তাঁদের কী ভক্তি, কী লম্ফঝম্ফ, আর সমস্বরে উচ্চরোলে আকাশ ফাটিয়ে গান—'মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার? / মায়ের হাতে খাই পরি, মা নিয়েছেন আমার ভার!' দোতলার বারান্দায় শ্রীমা জোড়হাত করে ঘন ঘন দেবী প্রণামরতা। ভিন্ন টোলা থেকেও অনেকগুলি প্রতিমা একজোট হতো। শরৎ মহারাজ সদরে বেরিয়ে এসে প্রণাম করতেন। চমৎকার দৃশ্য! মা অনুমতি দিলেন। সবাই আস্তে আস্তে সারি সারি প্রতিমা নিয়ে গঙ্গামুখো হলেন। ছেলের দলের নেতা রাজবল্লভ পাড়া নিবাসী মণি গাঙ্গুলীকে স্মরণ হয়। উৎসাহী, উদ্যমী, হাস্যমুখ, ভক্তিময়, উজ্জ্বলশ্রী, দীর্ঘকায়, সোনার বরণ। বাগবাজারের ধার্মিক অকৃতদার জাপক নিবারণদা ছোট্ট প্রতিমা গড়তেন নিজ হাতে। নীরব ভক্ত, কোন জাহির বা আড়ম্বর নেই। মা কোন কোন মূর্তি দেখে "বড় সুন্দর" বলতেন।

১৯১৬ সালের কথা। মনে পড়ে, একবার শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আমরা

পুরনো বালিগঞ্জে শোকহরণবাবুর (শোকহরণ দাসগুপ্ত[৪]) বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছি। সে খাবার কী ধুম! পূর্ব বাংলায় 'রকম'কে বলে 'পদ'। অগুন্তি আমিষ নিরামিষ পদ। পরম পরিতোষ সকলের। মা সরলা বালিকার মতো গ্রামোফোন রেকর্ডে কয়েকটি গান শুনলেন। 'কয়গণ্ডা লঙ্কা দিসস্ আটগণ্ডা কইসিলাম!'—আর হাসি। শোকহরণবাবু মঠকে খুব আপন জ্ঞান করতেন। ঘন ঘন মায়ের কাছে আসা ছিল। বলরাম আবাসে মহারাজের কাছে প্রায়ই টিফিন কেরিয়ারে করে মাংস, পোলাও, কখনো পাত্র ভরে আইসক্রীম নিয়ে যেতেন। আমরা এসব প্রসাদ পেয়েছি।

"জয় দিদি, জয় জামাইবাবু! জয় দিদি, জয় জামাইবাবু! জয় দিদি, জয় জামাইবাবু! (সঙ্গে সঙ্গে) জয় ট্যাকা, জয় ট্যাকা, জয় ট্যাকা! দিদি ট্যাকা দাও, দিদি ট্যাকা দাও, দিদি ট্যাকা দাও। দিদিগো, দোহাই তোমার, ট্যাকা দাও।" সারদা-রামকৃষ্ণের নামের পর টাকা—যেন পায়েসের পর নিম ঝোল। আলোর পাশেই কালো। নইলে আলোর কদর হবে কি করে? উদ্বোধনে সদর দরজায় ঢুকতে ঢুকতে মুখে ঘন ঘন পূর্বোক্ত 'মহামন্ত্র' সব উচ্চারণ করতে করতে মায়ের সহোদর মিসকালো কালীমামার (মেজমামা) হাস্যরস-কৌতুকপূর্ণ নাটিকার বিদূষকের মতো রঙ্গমঞ্চে একদিন সহসা অনুপ্রবেশ ঘটল। সারদা লীলানাট্যের যেন গোপাল ভাঁড়। মূর্তিমান বৈপরীত্য—'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স' (Anti-climax)। কাষ্ঠবৎ শুকনো চেহারা। দেশের ম্যালেরিয়াতে যেন সর্বশক্তি চুষে নিয়েছে। ঠাকুরের 'হৃদে' যেন বসানো। মায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসন্নমামা সম্পর্কে প্রভুর উক্তিঃ "ঐ যে গো, তোমার কালটে, নরুণ মুখো (ছুঁচালো, সরু, লম্বাটে) ভাইটা আসে, টাকাটা, সিকেটা যা তোমার কাছে পায় তাই নিয়ে যায়। ওদের সঙ্গে তোমার টাকার সম্বন্ধ।"

১৯১৮ সাল। জুন মাস। রাধুর বাই জাগল—"ছাদের ওপর ও কে

---

৪ শোকহরণবাবু, তাঁর স্ত্রী সুমতিবালা এবং সুমতিবালার দিদি সরযূবালা সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত ছিলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র প্রথম সুদীর্ঘ ও মূল্যবান স্মৃতিকথাটি সরযূবালা সেনগুপ্তের।—**সম্পাদক**

আওয়াজ করছে। যা পিসীমা, শব্দ বন্ধ কর। কাকের আওয়াজে আমার বুক কাঁপে। যা পিসী, শিগগির কাক তাড়া গে। ছাদে ছাদে। দোতলার বারান্দায়।" অম্লানবদনে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে, বিবেকানন্দ-কথিত জীয়ন্ত দশভূজা, বর্তমানে দ্বিভূজা শ্রীমা কন্যার আবদারি আদেশ পালন করছেন! দেখবার মতোই দৃশ্য। অলক্ষ্যে স্বাভাবিক নিরহঙ্কারিতার, মহত্ত্বের নীরব নিথর অভিপ্রকাশ। তারিফ করতে পারি কই? এখানে তো আর কোন আড়ম্বরের ঘটাঘটি নেই! সমাধিস্থ হলে তবেই অহংতত্ত্ব নাশ হয়। পুরোপুরি।

দুপুরবেলা। গরম কাল। খাওয়া দাওয়ার পর। বাড়ির সবাই খানিক বিশ্রাম করছেন। শুধুই মা-র চোখে ঘুম নেই। পীড়িতা মেয়ের জন্যে নিজেই রোগজীর্ণা মা উদ্ব্যস্ত। তিনতলার ছাদের ওপর দিককার ছোট্ট ঘরটিতে দরজা জানালা এঁটে কয়েকটি পাখি মাত্র খুলে আমার ওপরের অগ্রজ এম.এ. পরীক্ষার্থী আশ্রিত যুবক শুয়ে শুয়ে চুপচাপ বই পড়ছে। পাশেই আমিও ঐভাবে অধ্যয়নরত। দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে মৃদুভাবে হ্যান্ডেলটি ঘুরিয়ে মা দরজা খুললেন। বড় নরম সুরে নিজেই একান্ত অপ্রতিভ হয়ে বলছেনঃ "কই বাবা, তোমরা দুভায়ে তো চুপচাপ পড়ছ দেখছি, আর নিচে রাধু খালি খালি আমায় বলছে, 'ওপর থেকে আওয়াজ আসছে। যা যা, দ্যাখ।' " মায়ের এই সহজ ভদ্রমূর্তি আজও বুকে আঁকা। বড় বড় উপাধি-ব্যাধিযুক্ত তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই গুণের একান্ত অভাব।

২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। উদ্বোধনের ছাদে সামিয়ানা টাঙিয়ে সুন্দর ব্যবস্থায় মায়ের শুভ জন্মতিথি উৎসব পালন। ছোট বাড়ি। স্থানের বড় অভাব। সারা দিনে পাঁচ-ছয় খেপে সবশুদ্ধ প্রায় সাতশো নরনারী পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। ধূপধুনা পুষ্পমাল্যজাত সৌরভে দশদিক আমোদিত। সুপ্রসন্ন পরিবেশ। মা-র পরনে পট্টবাস। গলায় পুষ্পমালা। শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য শ্বেত রক্তপদ্ম গোলাপ। ফুলে ফুলে পর্বতাকার। মাস্টার মশায়ের অপ্রকাশিত নোটে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের সম্পর্কে

বলছেনঃ "ওর পা যেন জগদ্ধাত্রীর পা। সুলক্ষণযুক্ত পা।"

মাকে ঐ শুভবাসরে যোগীন-মার প্রণাম। সে একটা চুপি চুটি দেখবারই ব্যাপার। ঠাকুরঘর। যোগীনের ভাবে ঢলঢল মুখমণ্ডলে বিস্ফারিত দুটি পদ্মআঁখি, যেন আঁকা। বহু বহুক্ষণ ধরে মা-র শ্রীপদে মাথা রেখে প্রণতি নিবেদন। পুষ্পার্ঘ্য দান। দাঁড়িয়ে উঠেও ভাবের ঘোর কাটেনি। যেন টলছেন। মা মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। চিবুকে করাঙ্গুলিস্পর্শে চুমু দিচ্ছেন। আর সবচেয়ে মিষ্টি—যোগীন-মা—মাকে পরমাদর সোহাগ ভরে চিবুক স্পর্শ করে চুমু খাচ্ছেন বারবার। এ বিশেষ অধিকার তাঁর। শ্রীমার মুখে, "এস, এস মা! এস"—এছাড়া কথা তো বড় নেই এই ব্যাপারে। যেন ব্রজের শ্রীমতীকে নিয়ে শ্রদ্ধা, ভালবাসা গলে গড়িয়ে পড়ছে চার ধারে। ঠাকুরের নির্দেশ—যোগীন মাধবলীলায় ব্রজাঙ্গনাবিশেষ। মা-র শ্রীমুখে যোগীন-মা কি যে দেখেছেন তা তিনিই জানতেন। শরৎ মহারাজের প্রণাম প্রক্রিয়ার গোটাটায় মা তো ঘোমটা ঢাকা। ছোটদের মতো শরৎ মহারাজ হিংসে করতেনঃ "মা তো আর আমার সামনে মুখ খোলেন না।" মা-র তরফে শরৎ মহারাজের প্রণাম গ্রহণ করে যে ভাবান্তর, ভাবাবেশ তা তো আমরা দেখতে পেতাম না। এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, মা-র মুখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে ফেটে বেরুচ্ছে। পাদুটি ঝুলিয়ে চৌকির ওপর বসে। যোগীন-মার প্রণাম একটা পর্ববিশেষ। গোড়াতেই মা বলছেনঃ "মা যোগীন, তোমার তো খপ করে হবেনি, তুমি আগে এস, এইবেলা। এর পর ভিড় বাড়বে।"

তার পরদিন বড়দিন। ২৫শে ডিসেম্বরের একটি ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে, ইংরেজের জয়-জয়কার হয়েছে। কলকাতা ইংরেজটোলা প্রচুর পানোন্মত্ত। আমোদ, হৈ-হল্লার তুমুল স্রোত। লোকে লোকারণ্য। বিশেষ করে, সেদিন—অর্থাৎ বড়দিনের দিন। মায়ের ভাইঝিদের, অর্থাৎ রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতির বড়দিনে সার্কাস দেখার ঝোঁক চাপল। মায়ের পরম ভক্ত ললিতদাদাকে (ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়) তারা বায়না ধরে বসল—দেখাতেই হবে। নিয়ে যেতেই

হবে। ললিতবাবুর কথায় একটি মুদ্রাদোষ ছিল। থেকে থেকে 'কি-বলে', 'কি-বলে' বলা। তিনি বললেনঃ "তোরা, কি-বলে, মাকে যদি রাজি করাতে পারিস সার্কাসে যাবার জন্যে, তবেই, কি-বলে, আমি কোমর বাঁধি। নইলে, কি-বলে, বৃথা কে ঝক্কি সইবে বাবা? বড়দিনের প্রচণ্ড ভিড়ে, আর কেউ, কি-বলে, এ-কাজে একদম সাহসী হবেই না। মা-র কৃপায় একা আমিই, কি-বলে, সুব্যবস্থা করে সবাইকে নিয়ে যাব।"

ভাইঝিদের সনির্বন্ধ আবদারে পিসিমাও শেষমেষ রাজি হয়ে পড়লেন। শরৎ মহারাজের কানে প্রস্তাব পৌঁছুলে তিনি ললিতকে ডেকে বললেনঃ "মা যখন সম্মত, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। কিন্তু তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও, বুড়ো মিনসে। তুমি বুঝে ভেবে দেখ বেশ করে। অনর্থক হোঁৎকামো গোঁয়ার্তুমি করা কি ভাল হবে? যদি মা-র কষ্ট হয়, কে দায়ী হবে? আজকের এই মরসুমে মাকে নিয়ে যাওয়ার সাহস তোমার হয়?" ললিত মিটি মিটি হেসে বললঃ "মহারাজ, কি-বলে, আপনার অনুমোদন না হলে তো, মা, কি-বলে, কোথাও এক পা নড়ছেন না। আপনি মত দিন। আমি দায়ী। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপ্রাণ দেখব, মা-র যাতে, কি-বলে, কোন কষ্ট না হয়। সব ঝক্কি আমি ঘাড়ে নিচ্ছি।"

মা মোটর চড়তে চাইতেন না। বলতেন, বুকে কি রকম বাজে। নইলে তো পরম একান্ত অনুরক্ত সেবক ডাক্তার কাঞ্জিলালের গাড়িখানিই অনায়াসে মায়ের রথরূপে জোগাড় হতো। খান চারেক ঘোড়ার গাড়ি করেই অগত্যা যাওয়া হলো। ময়দানের একপ্রান্তে, দক্ষিণ দিকে, ভিক্টোরিয়া সৌধ বরাবর। সার্কাসদলের নাম নোট করতে ভুলে গেছি। মাস্টার মশায় সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই সিটের দাম সমেত সব কিছুর উল্লেখ রাখতেন। ভাল জায়গায় মাকে ও তাঁর সাথীদের বসানো হলো। মা ও সকলেই খেলা দেখে আনন্দিত। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ১৫ নভেম্বর ১৮৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন।

মাঠে আর লোক ধরে না। বাদ্যভাণ্ডের কলরবে সরগরম। কালো মাথার সাগর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সার্কাস শেষ হওয়ার পর ভীষণ ঠাসাঠাসি। ফেরবার সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। চারধার আলোকময়। কাছে শত চেষ্টাতেও

একখানি গাড়ি পাওয়া গেল না। ললিতদাদা হিমসিম খেয়ে ছুটোছুটি করলেও কোনই কিনারা শেষ পর্যন্ত হলো না। হিমের মধ্যে ঠায় খোলা গড়ের মাঠের ওপর মা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে। তারপর সার্কাসের তাঁবু থেকে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত প্রায় বিশ মিনিটের পথ জখম বেতো পা নিয়ে (মাকে এক পা ঘষড়ে ঘষড়ে বহুকাল চলতে হতো) ধীরে ধীরে অম্লানবদনে হেঁটে এসে মোড়ে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর 'বিজয়া' গোলাপ—মা-র বডিগার্ড। হাত ধরে ধরে ঘোমটা দেওয়া মাকে আনছেন। বড় ছেলে 'সৃষ্টিধর' শরৎকে মায়ের বড়ই মিষ্ট ভয়। শরৎ মহারাজের ঘরে আমি রাত্রে তাঁরই কাছে নিত্য শুই। মা বড় 'কিন্তু কিন্তু' হয়ে মাঠ পেরোতে পেরোতে আগাম আমাকে বলে রাখছেনঃ "দেখলে তো বাবা, নলিতের (মা ললিত বলতেন না, 'নলিত' বলতেন) কোনই দোষ নাই। নিরুপায়। বাছা ও তো আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোন মতে গাড়ি পেলেনি। ও আর কি করবে? শরৎকে বুঝিয়ে একথা বোলো। নলিত যেন আমার জন্য বকুনি না খায়।"—মায়ের কী সমবেদনা, কী করুণা, কী মমতা ললিতমোহনের প্রতি! কিন্তু ঠেকানো গেল না কোনমতেই। শরৎ মহারাজ এধারে তো সন্ধ্যে থেকেই পথপানে চেয়ে বৈঠকে বসে আছেন। তামাক খাচ্ছেন। মা এই আসেন, এই আসেন। উদ্বোধনে ফিরতেই তাঁর জেরার চোটে, আর বিশেষ করে গোলাপ ফুলের কাঁটার মতো শরৎ মহারাজের পাশেই এক 'হাজরা' মশায়ের প্রশ্নবাণের তোড়ে, প্রকৃত অবস্থা সবই বলতে হলো। কতক্ষণ আর আমতা আমতা করা যাবে? সঙ্গে সঙ্গে ললিতকে পিলে চমকানো বকুনির তোড়! মায়ের কষ্ট হয়েছে—আর যায় কোথা? শরৎ মহারাজ বাঘের ন্যায় স্ফীত হয়ে উঠলেন—"আহাম্মক!" ললিতের মাথা হেঁট। সাহস দুঃসাহসে পর্যবসিত। মা তো শরৎ মহারাজের সামনে বেরোতেন না। আড়ালে নিজের ঘরে ললিতের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ঘন ঘন আশীর্বাদ করতে লাগলেন যাতে ললিত মনে কষ্ট না পায়। তবে শেষে বললেনঃ "শরৎ ঠিকই বলেছে, বাবা। এরপর সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ করবে।"—মা যেন মূর্তিমতী করুণা।

মায়ের জীবদ্দশায় শরৎ মহারাজের একাকী একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় নির্মিত উদ্বোধন বাটীই ১৯০৯ হতে রামকৃষ্ণলীলার চিন্ময় কেন্দ্র। চিন্ময় ধাম। মাতৃধাম। মায়ের অন্তিমলীলার অধিষ্ঠান-ভূমি উদ্বোধনই—ব্রহ্মাবাস। স্বামীজী মজা করে বলতেন—"বাবা তো মায়ের গোলাম।" উদ্বোধনের ছাদে দাঁড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরীয় শ্রীভবতারিণী-ঘাটতট প্রবাহিনী মা গঙ্গার সঙ্গে অনায়াসেই, অতি সহজেই ভাবসেতু নির্মিত হয়। ভাবময়ী, চিন্ময়ী, চিদঘনকায়া মাকে, রাখাল মহারাজকে, শরৎ মহারাজকে, যোগীন-মাকে কত দিন না দেখেছি—ছাদে "অসত্ত্যুরস্যাম্ দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—হিমালয়সম প্রভুর লীলানিকেতন, কলির বৈকুণ্ঠ, দক্ষিণেশ্বরকে উত্তরেশ্বর বানিয়ে উত্তরমুখো সব চুপচাপ তাকিয়ে আছেন। সবাই মৌন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানলীন।

মনে পড়ছে ললিতদাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো একটি ঘটনা। মায়ের এক আত্মীয় ছেলেকে এবং আমাকে ললিতবাবু বাগবাজারস্থ ৫৩/২ বসুপাড়া লেনের বাসাবাড়িতে একদিন দিবাভোজে আমন্ত্রণ দেন। ললিত আগে প্রমোদের স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রায় বানচাল হয়েই গিয়েছিলেন। মা তাঁকে অনন্ত অপার দয়ায় রামকৃষ্ণতীরস্থ করেন। আট-নয়টি সন্তানের জনক হয়েও সবকটিকে পর পর একে একে যম-করে অর্পণ করে একরকম বেহেড হওয়ার উপক্রম। মাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দম্পতি যেন কূল পান। ললিতবাবুর স্ত্রীর নাম 'দাসী'। সেই নাম সার্থক মায়ের 'দাসী' হয়ে। জ্বরের আগার জয়রামবাটীতে দাতব্য ডাক্তারখানা স্থাপন করার জন্য শোকগ্রস্ত ভগ্ন তনু-মন ললিত আবার তাঁর মনকে মায়ের পায়ে জোড়া লাগিয়ে অশেষ শ্রম করতে শুরু করলেন। অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মায়ের প্রতি ললিতের টান আঁকড়ে পাওয়া যেত না। মায়ের স্নেহসিন্ধু তাকে দেখলে উথলে উঠত। এটি আমার স্বচক্ষে দেখা। ললিত তাঁর একটি জীবনকথা কতবারই না আমাদের প্রচুর গর্বভরে বলেছেন—"উদ্বোধন বাড়ি হওয়ার বহু আগে আমার শাঁখারিটোলার ভাড়াবাড়িতে গিয়ে মা তাঁর নিজের 'অয়েল' ছবিটিতে আমার কথায় নিজে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করে আমাকে দীক্ষা দেন। আমাকে, কি-বলে,

যা তা ভাবিস তোরা?''—এই তো 'ভক্তের আমি'। ঐ ছবিই ১৯২৩ সালে মায়ের জন্মস্থানে শ্রীমন্দির বিগ্রহরূপে শরৎ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

যাই হোক, ললিতবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়েছি। আমার এবং মায়ের যে আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ সে যে সে লোক নয়—রাধুর স্বামী মন্মথ। তখন ললিতবাবুর বাড়িতে ললিতবাবু নেই। ললিত-গৃহিণী প্রচণ্ড পর্দানশীন। বাড়ির কর্তা না থাকলে আর কে সাড়া দেবে? ঠিকে ঝি কাজ সেরে চলে গিয়েছে। পরে জেনেছিলাম, আমাদের জন্য ললিতবাবু তখন দোকানে দই-মিষ্টি কিনতে বেরিয়েছিলেন। দু-চার বার ডাক দিয়ে ও সদরের কড়া নেড়ে যখন গৃহস্বামীর সাড়া মিলল না তখন আমার সঙ্গীর মেজাজ উঠল সপ্তমে। জমিদার-পুত্র বলে কথা! তার ওপর মায়ের জামাই। যত বলি: "আর খানিকটা দেখুন। হয়তো ললিতদাদা বাজারে বেরিয়েছে কাছেই", কিন্তু শোনে কে? আমাকে হাত ধরে টেনে উদ্বোধনে চলে এল। বলল: "ললিতদার এটা খুব অন্যায়। বাসা ছেড়ে বাইরে গেলেন—আমরা তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি!" এদিকে বেলা পড়ে গেছে। উদ্বোধনে এসে নিজেও খেলে না, আমাকেও খেতে দিলে না।

এদিকে ললিতদা বাসায় ফিরেছেন। শুনলেন, দরজায় ডাকাডাকি করে আমরা ফিরে গেছি। তখুনি ছুটে উদ্বোধনে এসে একেবারে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে। মার কাছে ব্যাপারটা পেশ করলেন: "মা, তুমি ওদের আচ্ছা করে বকুনি দাও তো। বেয়াড়া ছেলে। আমি একটু গেছি দোকানে মিষ্টি আনতে। তোমার বউমাকে তো জান। কারও সামনে বাইরে বেরোয় না। একটু তো অপেক্ষা করবে। আমি তো তক্ষুণি ফিরে এসেছি।" কাঠফাটা রোদ্দুর। গ্রীষ্মকাল। ভদ্রলোক বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। তার হেতু আমার চলে আসার থেকেও আমার সঙ্গীটির চলে আসা। সে যে তার গুরুবংশীয়ার স্বামী। ললিতকে ঠাণ্ডা করে মা বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে বললেন: "ওদের এক্ষুণি আবার পাঠাচ্ছি। ওরা খেয়ে আসবে। তুমি বাবা, নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। আহা, বাছার আমার খামকা খেতে বলে কি ঝকমারি!"

তারপরই সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়ল। মন্মথকে কিছু বললেন না। এ যেন ঝিকে মেরে বউকে শেখানো গোছের। আমি ঐ একবারই মার কাছে বকুনি খেলাম। এখন বুঝছি—ঐ থেকে আমার মহাকল্যাণ হয়ে গেল। মার বকুনির মাধ্যমে আমার চরিত্রের কাঠামোয় দুষ্টস্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দেওয়ার শক্তি শক্তিময়ী আদ্যাশক্তি তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। এত দয়া, তখন কি বুঝি? ঠাকুরঘর বা তাঁর নিজের ঘরের রাস্তার দিকের বারান্দায় আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে তীব্র তিরস্কার— "এই কি তোমার লেখাপড়া শেখা! কলেজে পড়—কলেজে পড়ে তোমার এই বুদ্ধি! ললিত বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তুমি জোর করে খানিকটা অপেক্ষা করতে পারলে না? কি তোমার তাড়া ছিল—ছুটির দিন? (সেদিন ছিল রবিবার) ও (মন্মথ) না হয় গণ্ডমুখ্যু, গোঁয়ার, গাঁওয়ার। ওকে তো কিছু বলা চলবে না।" মায়ের কাছে লজ্জায় অধোবদন। ভক্তবৎসলা মার যে সবদিকেই সমান নজর। অসম্ভব তালবোধ।

তক্ষুণি আবার শরৎ মহারাজকে হুকুম হলো: "এদের দুজনকে নিয়ে তুমি নিজে এক্ষুণি ললিতের বাসায় গিয়ে খেয়ে এসে ললিতকে ঠাণ্ডা করে এসো বাবা।" মনঃক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ 'ললিত'কে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে পূর্ণ, বিপুলভাবে খুশি করার আয়োজন! আদেশমতো তৎক্ষণাৎ 'সৃষ্টিধর' পরম আজ্ঞাবহ, নিরভিমান শরৎ মহারাজ তা-ই করলেন। সত্যিই মাতা-পুত্রের এ এক অপূর্ব দিব্য সম্পর্ক!

শরৎ মহারাজেরও মজা দেখলাম। জামাতা মন্মথকে সামনে রেখে আমাকেই ভর্ৎসনা। গীতার নজির বললেন। সঙ্গ থেকে যা কিছু কুপ্রবৃত্তি সব সঞ্জাত। তা থেকে ক্রোধ ও মোহের উদ্ভব। তারপর একে একে ধাপে ধাপে নিচে নেমে যাবে। তারপর স্মৃতিবিভ্রম। তা থেকে বুদ্ধিনাশ। পরিণামে 'প্রণশ্যতি'। মুখটি বুজে ললিতদাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরা হলো মায়ের বাড়ী। সঙ্গীটি আমার চেয়ে বয়সে বড়। ললিত শেষমেষ আহ্লাদে আটখানা—"আমি কি হেলনা-ফেলনা ভক্ত! কি-বলে, আমার সঙ্গে চালাকি! মা যে আমার হাত ধরে রয়েছেন।" ললিত মাকে

'তুমি' জবানীতে বরাবর বাক্যালাপ চালাত। গোঁফের বহরের দরুণ 'কাইজার চ্যাটার্জী' বলে তাকে ডাকা হতো।

মায়ের নামে ললিতবাবু অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। আমার জীবন তার দৃষ্টান্তস্থল। ১৯১৬ সালের পুজোর ছুটির আগে হেডমাস্টার স্বনামধন্য রসময়বাবু হিন্দুস্কুলে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন: "তোদের কত আগে সব সাবধান করেছি, বয়স যদি ভুল লেখা থাকে তো শুদ্ধ করে নে এইবেলা—দরখাস্ত করে, প্রমাণ দিয়ে। এখন টেস্ট সামনে। স্কুল কমিটি যা নাম পাঠিয়েছে, তাতে তোরও কম হচ্ছে। এবার ম্যাট্রিক দিতে পারবি না।" আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাক্ করে খানিকটা কেঁদেই ফেললাম প্রথমেই। অনাথ বালক, গার্জেন বলতে সন্ন্যাসী, ফ্রি পড়ি, মায়ের বাড়ীতে থাকি—সর্বনাশ! কে আছে? ললিতদাদাকে বললাম: "ও ললিতদাদা, এর কোন উপায় হয়?" সকালবেলা মাকে প্রণাম করবার পর ললিতবাবু বললেন: "মা, এটাকে ভালকরে আশীর্বাদ কর তো। এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে লেখাপড়া সব পণ্ড।" মা সঙ্গে সঙ্গে মাথায়, চিবুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন: "ঠিক হবে। নলিত, তুমি চেষ্টা কর।" আর পায় কে? তাঁর মামা, গিরিশ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার। লম্বা দশাসই দেহ। সমুন্নত সংযত চরিত্র। ধীমান। শরৎ মহারাজের চিঠি নেওয়া হলো। তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল: "ছেলেটির আগামী মার্চে ষোল বছর কয়েক মাস বয়স হবে। এ বিষয়ের সত্যতায় আমিই সাক্ষ্য।" সেই চিঠির আর একটি বাক্য এখনও মনে আছে—"We remember your saintly father who used to visit the Master." —শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগত আপনার সাধুসদৃশ পিতৃদেবকে (ঈশান মুখার্জী) খুব মনে পড়ে। ঈশানবাবুর এত দরাজ হৃদয় ছিল যে, তিনি ঋণ করে দান করতেন। স্বামীজী তাই বলতেন: "বিদ্যাসাগরের চেয়ে ঈশানবাবু বড় দাতা, এক হিসেবে।" যাই হোক, উপাচার্য দেবপ্রসাদের কাছে গিরিশবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে হাজির হলেন। রোগা লিকলিকে চেহারা দেখে দেবপ্রসাদবাবু বললেন: "Mr. Mukherjee,

the boy hardly looks 16." ষোল বছর বয়স বলে মনে হয় না। কিন্তু সেখানে শ্রীশ্রীমা ও শরৎ মহারাজ যে ছেলের উকিল। গিরিশবাবু ও ললিতবাবু উভয়ে ঐ মূলে '১৬ বছর নিশ্চিত' বলায় ললিতবাবুর জয়জয়কার! যেন আহ্লাদের পাখায় উড়ে এসে মা ও শরৎ মহারাজকে জানালেন। ফলে ঐ বছরেই পরীক্ষা দেওয়া হলো।

ললিতদার প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মায়ের আরেক বীরভক্ত ডাক্তার কাঞ্জিলালের কথাও। বড় ডাকাবুকো মানুষ। মায়ের কাছে তাঁরও ছিল জোর। বেশ চমৎকার বলতেনঃ "মায়ের কৃপায়, মহারাজের কৃপায় নতুন মানুষ হব। মার কাছে এসে এইটে বুঝেছি। পূর্বের সব দুষ্কৃতি ঝেড়ে ফেলতে হবে। আর দেখে নিও, আমি থলথলে বুড়ো হয়ে ফোকলা মুখে গুড়ুক টানতে টানতে নাতি-নাতনীদের কাছে খালি হাম-বড়ামি করতে থাকব না—'আমি মা ঠাকরুনকে দেখেছি, আখাল মহারাজকে দেখেছি।' শক্তি থাকতে থাকতে মার কৃপায় চলে যাব।" সারাদিন ডাক্তারির কঠোর শ্রম অন্তে সারারাত প্রায়ই মায়ের পূজায় কাটাতেন। অচলা বিশ্বাস ছিল মায়ের প্রতি। ঠিক হলোও তা-ই। তিন-চার দিনের জ্বরে হঠাৎ চলে গেলেন।

কী সীমাহীন শুদ্ধতা, সরলতা, ঋজুতা দেহধারণ করে আমাদের উদ্ধার করতে, পথ দেখাতে এসেছিল দেবী সারদারূপে, তা আজকের দিনের এই দমবাজি, ধাপ্পাবাজির রাজ্যে ভাবলে স্তম্ভিত, আশ্চর্য হতে হয়। একদিন সকালে প্রণাম করার পর মা বললেনঃ "রাধুকে জিজ্ঞাসা করে এস কি খাবে। আলমারির তাকে ঐ থলিতে খুচরো পয়সা আছে, নিয়ে কিনে আনো।" তেলেভাজাকে বাঁকুড়ার লোকেরা বলে 'ভাব্‌রা'। ভাবরা আর মিষ্টি, চমচম, পান্তুয়া। সবশুদ্ধ সাড়ে পাঁচ আনা হলেই হয়। মাকে বললামঃ "আমি কেন নেব? মা, আপনি নিজে গুণে গেঁথে থলে থেকে বের করে দিন।" টাকা কাউকে দেবার বেলায় দেখেছি, স্বীয় ললাটে ঠেকিয়ে তবে হস্তান্তর করতেন। মা মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে বললেনঃ "না বাবা, তুমিই নাও।" তবু আমার জোর—"আপনি দিন।" তিনি

এলোপাতাড়ি এক খামচা তুলে দিলেন। ঠিক সাড়ে পাঁচ আনাই তা থেকে হলো! আমার কি রকম লাগল। পরে যোগীন-মার কাছে শুনলামঃ "মা গুণতে পারেন না—তা বুঝি জানিস না?"

মা-র যোগীন-মাকে অসম্ভব ভালবাসা, সমাদর, আদর, খাতির। বিকেল বেলা মায়ের কাছে নিত্য যেমন পিতৃগৃহ থেকে (১৯১৬ সাল হবে) আসতেন, একদিন এসেছেন। ঠাকুরঘরের বারান্দায় মা এ-কথা, সে-কথা বলার পর বলছেনঃ "আচ্ছা মা যোগীন, আজ সকালে কতকগুলি ছেলেমেয়েকে মন্ত্র দিলাম। —এই এই। ঠিক হলো কি? তুমি বললে আমার মনটা ঠাণ্ডা হবে।" যোগীন-মা মন দিয়ে মন্ত্রগুলো শুনে বলছেনঃ "মা! আমি একটা হতভাগী, আমাকে জিজ্ঞেস করছ? তুমি বড় বালিকার মতো সরল। তোমার মুখ দিয়ে যে বাক্য বেরুবে মা, সে যে বেদবাক্য! তাতে কি ভুলচুক হবার জো আছে? কখনই নয়!" পরে যোগীন-মা শরৎ মহারাজকে বলছেনঃ "মার ঐ কথা শুনে আমি অবাক! মা আমাকে এতটা বড় মনে করেছেন?" মা-র দেহান্তের কয়েকমাস পর বলরাম-গৃহে রাখাল মহারাজ আছেন। বলছেনঃ "উদ্বোধনে তো সবাই হৈ হৈ করছে। এক শরৎ মহারাজ আর যোগীন-মা—এঁরা ভজনে আছেন।" শিবানন্দজী আমাকে বলেছিলেনঃ "ঐ যে রে, তোরা যাকে দিদিমা বলিস, খুব সাধনভজন করেছে! এখনো করছে।" কিন্তু যখনই যোগীন-মা অবুঝের মতো কিছু বলছেন, মা দৃঢ়কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করতে ছাড়তেন না। যোগীন-মা বাপের দ্বিতীয় খেপের একমাত্র কন্যাসন্তান—তাতলে একটু বেশিই সময় সময় তেতে উঠতেন। এধারে আবার, মাতালের মেয়ে। মা-র সেবামণ্ডলীস্থ এক ব্রহ্মচারীর কি ব্যবহারে মনে নেই, চটে কাঁইবিচি হয়ে গিয়ে, নিত্যকার গঙ্গাস্নান, জপাদি উপাসনান্তে উদ্বোধনে ঢুকে যোগীন-মা একদিন নিচ থেকে চিৎকার করে মাকে বললেনঃ "মা! তুমি রাসবিহারীকে (ব্রহ্মচারী রাসবিহারী—পরবর্তী কালে স্বামী অরূপানন্দ) এখুনি তাড়াও। তা না হলে আমি আর এ-বাড়িতে ঢুকব না। হয় ও যাবে, না হয় আমি যাব।" মা সব কলরব

শুনতে পাচ্ছিলেন। যোগীন-মা ওপরে পৌঁছালে মা দৃঢ়স্বরে বললেনঃ "কেন, যোগীন! ও কথা কি বলতে আছে? অলুক্ষণে কথা। অবুঝ হয়োনি, অবুঝ হয়োনি। ঠাণ্ডা হও। ঠাকুরের প্রসাদী মিছরির পানা খাও। ভুলে যাও ওর কথা। ও যা অন্যায় করেছে, আর করবেনি। আমি তার জামিন। তাড়ানোর কথা কি তোলে? ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ঠাকুরের কাছে, আমার কাছে এসেছে। ওকে তো তাড়াতে আমি কোনকালে পারবনি মা। তাতে তুমি না আসো, আমি আর কি করব?"

একেই বলে যথার্থ ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্টতা। অথচ গণনবিদ্যা সংখ্যাবিজ্ঞানে, অজ্ঞা। প্রকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী। মা-র চরিত অপূর্ব সামঞ্জস্য সাম্য-সুষমাময়। যাকে যখন যেটি বলা দরকার, ঠিক সেইমতো বলা। তখনকার ঐ ব্রহ্মচারীজী যে সত্যিকারের খাঁটি মা, আসল মা পেয়েছিলেন। তাঁর মোহময়ী মা তখন পরলোকগতা। মনে পড়ছে, কত আগ্রহে দিনের পর দিন ঐ ব্রহ্মচারীজী মায়ের কথাবার্তা নোট করতেন চুপি চুপি নিচের ঘরে। 'মায়ের কথা' বলতে আজ যা পেয়েছি, তার মূলে তিনিই।

গোলাপ-মাও ঐ তক্কে এক হাত ঝাড়লেন। তিনি কর্মে দক্ষা। জ্ঞানে, কর্মে, ভক্তিতে—সব দিকে নয়। বললেনঃ "বলি ও যোগেন, গঙ্গাতীরে এক লক্ষ জপ করে এলে, তো কার বাবার মাথা কিনে এলে? এসেই গোটা বাড়ি কাঁপাচ্ছ?" যোগীন-মা বললেনঃ "গোলাপ-দিদি, তুমি আমায় বরাবরই দেখতে পার না।"

মধ্যে মধ্যে নারদ নারদ না লাগলে খেলা জমে না। দুই বুড়িতে পরক্ষণেই ভাবেরও গলাগলি, হলাহলি। অসম্ভব টান পরস্পরের প্রতি। তবে, এইরকম খুকি খুকি খেলাও কখনো কখনো হয়েছে। আশপাশের সর্বত্র সব সংসারের প্রতিচ্ছায়ামতো মা-র সংসারেও মাঝে মাঝে এইরকম একটু আধটু বেসুরো বেজে উঠত। মারও তো পাঁচজনকে নিয়েই কারবার। কিন্তু মা উপস্থিত থেকে সুরেলা আওয়াজকেই সবার ওপরে সর্বোচ্চ ধরে রাখতেন।

দ্বিতীয় আর কে মা-র মতন বহুকাল ধরে ঠাকুরের হাতে গড়া সোনার প্রতিমা—অক্ষরে অক্ষরে, শিশুকাল থেকে? পাঁচবছরে বিয়ে। খেপে খেপে কয়বার দেশেই ভাগবতগঠনের সেরা মিস্ত্রি-কৃত ভিত পত্তন। তারপর কর্তাও সাধন অনলে সব ভুলে ডুব দিয়ে নিখাদ হয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন, মা কালী পরীক্ষার জন্য শ্রীমতী সারদাকে কাছে আনিয়েছেন। ১৮৭২-এ পূর্ণ যৌবনে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে সাধন সিদ্ধিপীঠে মা-র আগমন। চৌদ্দ বৎসর ঠাকুরের চোখে চোখে মা-র সেবাব্রত (শাশুড়ির সেবা), ধ্যান জপ উপাসনাময় জীবন গঠন। একটানা প্রক্রিয়া। মা-র পূর্ণসিদ্ধি তিনি থাকতেই, ঐ পীঠেই। বাইরে মাকে প্রকট হতে দেননি। তখন প্রয়োজনও ছিল না। যোগীন-মার নহবতের স্মৃতি মনে পড়ে। ঠাকুর বলতেন: "ওরে নেটো, দ্যাখ, যে যা জিনিসপাতি আনে সব ওকে দেখাবি, জানাবি, নইলে তাদের উদ্ধার কেমন করে হবে?"

লোকগুরুর কার্যভার মাকে নিতে হবে বলে ঠাকুর নানা বীজমন্ত্র মাকে নিজেই জানিয়ে দেন। পরে কাজে লাগবে। শরৎ মহারাজ মায়ের দেহাবশেষে পরিষ্কার বলেছিলেন: "তোমাদের যাকে যাকে মা যা যা বলে গেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে—তোমরা স্থির জেনো। ঠাকুর ও মা-র সত্তা—চিরসত্তা। তাঁরা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তোমাদের কোন ভয় নেই।"

১৯২০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। মায়ের একটি মুনসেফ দীক্ষিত সন্তান উদ্বোধনের সদরে এসেও মা-র টাটকা বিরহতাপে কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করতে পারছেন না। শেষে সন্ধ্যারতির পর ভাবগ্রাহী শরৎ মহারাজ নিজে বৈঠক হতে উঠে রোয়াকে ঐ অজস্র রোরুদ্যমান ভক্তের বুকে, মাথায় ক্রমান্বয়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে ভিতরে ঢোকালেন। বললেন: "তাঁর মতন কি তুমি আমাদের কাউকে পাবে? তাঁর মতন তিনিই। এস, ভিতরে এস। মা-র প্রসাদ ধারণ কর, ঠাণ্ডা হও।" শরৎ মহারাজ কখনো একটি বাজে বাক্য ব্যয় করেননি। তাঁরই হৃদয়োত্থিত বাণী: "ঠাকুর ও মা অভেদ। তোমরাও পরে বুঝবে। যারা

মা-র আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছ, তাদের আর খেদ কি? ঠাকুরেরই স্পর্শ পেয়েছ। এখন কাজে লাগো। লোকে তোমাদের দেখে অবাক হয়ে যাক। স্বামীজীকে সর্বদা সামনে রেখে চোলো। যোগ্য হও।"

ঠাকুর হিমগিরি, মা প্রথমে মহেশশিরস্থা, জটাজালরুদ্ধা। মাথার জিনিস, পুজোর সামগ্রী, শিবাঙ্গীভূতা। আবার শিবসম্ভূতা। চলমান গতিবন্ত জগতে মা লীলায়মানা হিমালয়োত্থা ক্ষিতিপাবনী জাহ্নবী-জলধারা। শ্রীরামকৃষ্ণ চিদাত্মা, মা চিৎশক্তি। ঠাকুরই মা, মা-ই ঠাকুর। সারদার সারবস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের সার মা। ঠাকুরের কায়া মা-র কায়া। একই কায়া। ভ্রান্ত মানবের অভ্রান্ত হদিশ—উভয়েরই বাণী।

নরেন্দ্রাদির আগমণকালে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়সই স্থির, সমাধি সিন্ধুবারি। শ্রীমা পরে লীলায়িত ভঙ্গীমায় তাঁরই তরঙ্গ। তরঙ্গর পর তরঙ্গ। কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারতময় মাতৃসত্তার প্রসার। শ্রীরামকৃষ্ণ বাদ্য, মা সেই বাদ্যেরই সুমধুর মনোহারী রঙপরঙের প্রাণস্পর্শী বাজনা। বলিহারি লীলামাধুরী। মরি মরি হে ঠাকুর ও ঠাকুরানী। বিবাহিতা, অথচ সানন্দে চিরকুমারী। সচলা চিন্ময়ী কন্যাকুমারী। পাশেই গদাধর। ঘরণী আছে, ঘরে ঘটিবাটি আছে। অথচ ব্রহ্মচর্যের জমজমাট রূপ দুইটি। নিস্পৃহতা দেদীপ্যমান। নরত্রাণতরে শ্রীহরি স্বয়ং সশক্তিক চাক্ষুস অভিব্যক্ত।

একটি কলকাতার মেয়ে মায়ের ছোট নহবতে একদিন ভাবের ঘোরে খ্যাচাম্যাচা হয়ে লাথি মেরে জলের জালা ভেঙে আতান্তর ঘটায়। সর্বংসহা মায়ের বিরক্তি নাই। উলটে প্রভুকে বললেনঃ "আচ্ছা, আহা, ওর মতো আমার কি ভাব হবেনি?" তিনি আশ্বাস দিলেন। বললেনঃ "ওরা শহুরে। খালি হৈ হৈ হুজুগে। বেহায়া। লজ্জার মাথা খেয়েছে। এক পা বটগাছে, আর এক পা বেলগাছে। আস্ত গোটা পাঁঠা চিবিয়ে গেলে। ওদের মতো তুমি কেন হতে যাবে? তোমর সব কিছুই হবে, অপেক্ষা কর। তোমার লজ্জাশীলা ভাব। তুমি বহু ওপরের থাক। ওরা তোমার তুলনায় অনেক নিচু থাকের। অন্তঃসলিলা ফল্গু, শোন নাই?"

রাখাল মহারাজ অকপটে বলেছেনঃ "সুধীর, আমরা তোমাদের সমাধি করিয়ে দিতে পারি। মা কিন্তু আমাদের চেয়ে আরো ভালভাবে পারেন।" স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের লিখেছিলেনঃ মা ঠাকুরানী কি বস্তু, পরে বুঝবে। মাকে অবলম্বন করে আবার জগতে গার্গী, মৈত্রেয়ী উদয় হবেন।

মা-র কৃপার কথা সুশীল মহারাজ (স্বামী প্রকাশানন্দ) মার্কিন দেশ থেকে এসে বেলুড়ে বলছেনঃ "Geometry বেচে [অর্থাৎ Geometry private tution দিয়ে] পাথেয় জোগাড়। চলেছি কাদা মেখে বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটী। টকটকে লাল গোলার মতন সুন্দর ব্রাহ্মণের ছেলেকে সহসা মেটে ঘরের দাওয়ায় উপস্থিত দেখে প্রথম দর্শনেই উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, 'বাবা, তুমি কলকাতার ছেলে, এত কষ্ট করে এসেছ; আমি আশীর্বাদ করি তোমার ভববন্ধন মোচন হোক, তোমার ভববন্ধন মোচন হোক।' সেই আশীর্বাদের জোরই তো আমার জীবনের একমাত্র জোর। তাতেই দিন কেটে যাচ্ছে। মা-ই ভরসা। পরম ভরসা।" চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের বাজার সরকার। রোগা হাড়ে ভেল্কি খেলাচ্ছে। অনলস কর্মী, মা-র কৃপাপ্রাপ্ত। উদ্বোধনের একতলায় সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) শেখাচ্ছেনঃ "মা-র কাছে গিয়ে চাও—'আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন'।" মা প্রসাদ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেনঃ "শেখানো কথা! তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তোমার এতেই সব হবে।" এর পিছনে একটি ঘটনা আছে। এর আগে একদিন ঐ কথা মাকে বলতে সুধীর মহারাজ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন চন্দ্রমোহন মায়ের কাছে গিয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অথচ চন্দ্রমোহন মায়ের কাছে সদা-সর্বদা যাতায়াত করেন। কথাও বলেন স্বচ্ছন্দে। মা তখন পূজা করছিলেন। চন্দ্রমোহনের দিকে তাকিয়ে মা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেনঃ "কি?" ঘাবড়ে গিয়ে চন্দ্রমোহন কোনরকমে বললেনঃ "প্রসাদ।" মা ইশারায় দেখিয়ে দেন "ঐ ওখানে আছে, নিয়ে যাও।" দ্বিতীয় দিন আবার সুধীর মহারাজ চন্দ্রমোহনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠালে মা অমন বলেন।

১৯০৬ সাল। শরৎ মহারাজ এক যুবককে বলছেনঃ "মাকে আজ গুরুরূপে পেয়ে গেলে। তাঁর কথামতো সাধন করলে জগদম্বা স্বরূপে তাঁকে পাবে, উপলব্ধি করবে। কিন্তু খাটতে হবে। যারা বলে—'মাকে দেখেছি, মা-র কৃপা পেয়েছি, আমাদের আবার সাধন কি?' তাদের কথা তো ঠিক, কিন্তু যারা ওরকম বলে তারা আসলে ফাঁকিবাজ। ফলে ওসব ফাঁকির বুলি। মা সিদ্ধির দ্বার খুলে দিয়েছেন, তোমাকে তো সেই দ্বারে যেতে হবে! সিদ্ধিদ্বারে পৌঁছতে হবে!"

১৯১২-১৯১৩ সালের কথা। বিজ্ঞান মহারাজ বলছেনঃ "শরতের বৈঠকখানায় বসে আছি। ওপর থেকে মাকে পেন্নাম করবার ডাক এল। এক-এক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। অন্তরে এক-এক করে সঙ্গে সঙ্গে এক্কেকটি পদ্ম ফুটে উঠছে। পরমানন্দে গোটা দেহমন ভরে উঠল।" এই দিব্যানুভবের সময় নিশ্চয় তাঁর নেতার কথা মনে পড়ছিল। ১৮৯৮ সালে বলরাম মন্দিরে স্বামীজী তাঁকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "ও কি রকম প্রণাম পেসন? মাকে কি ঐভাবে প্রণাম করে? সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর মাকে।"

আবার ঐ বছরই সুধীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে মায়ের বাগবাজারের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ে ফেলে দিয়ে বলেনঃ "এই ছেলেটাকে, মা, ভাল করে আশীর্বাদ করুন তো।" মাকে দর্শন করতে যাওয়ার সময় স্বামীজীর একটি রীতি পরিলক্ষিত হতো। ঘন ঘন নিজের মাথায় ব্রহ্মবারি গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন। আবার, গঙ্গাস্নানান্তে নিত্য প্রাতে প্রণাম করতে যাওয়ার সময় শরৎ মহারাজের কী তটস্থ ভাব, কী সমীহ! কী অপরিসীম শ্রদ্ধাই না দেখেছি।

স্বামীজী যূথপতি, সত্যকার নায়ক, তিনি সকলের আগে মায়ের স্বরূপ, মায়ের মহিমা বোঝেন। দেখেছিলেন, মা স্বয়ং আদ্যাশক্তি। মা দয়া করে ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

স্বামীজী, মহারাজ, যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি বিজ্ঞ বোদ্ধারা মায়ের সম্বন্ধে যা বলার বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'দেখেছেন'—এইটি সর্বদা সবার ওপর মনে রাখতে হবে। মা স্বামীজী

প্রভৃতিদের প্রণাম নেওয়ার সময় আত্ম-সংস্থা, আত্মাধিরূঢ়া হয়ে যেতেন। দেখা যেত, এই সব প্রাথিত মাতৃভক্তেরা চলে গেলে মাকে প্রকৃতিস্থা বা সহজ হতে, নিম্নভূমিতে নামতে বেশ একটু দম নিতে হচ্ছে। মূলের কথা মনে পড়ে। কর্তা নবতের দিকে চেয়ে মাস্টার মশায়কে বলেনঃ "রামলালের খুড়ি গো, ওখানে থাকে। যাকে সামনে রেখে জীব উদ্ধারের কাজ চলছে।" "মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন?..."

১৯১৮ সাল। বলরাম মন্দিরে স্বামী তুরীয়ানন্দ ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষকে মা-র কৃপার কথা বলতে বলতে লাল হয়ে গেলেন। ভাবের পরদায় চড়ে উঠে বললেনঃ "ডাক্তার, দেখছ কি? মা-র কথা কি বুঝছ? কানে শুধু মন্তর নিলে হবে কি? প্রাণে যদি তার চর্চা না কর! অন্তিমে মুক্তি নিশ্চিত, রেজিস্ট্রী করা আছে। কিন্তু যদি খাটো, সাধন কর ঐ মন্ত্রের, তাহলে জীবন্মুক্তির আস্বাদে ধন্য হবে। তবেই মাকে বুঝতে পারবে, বুঝে নিয়ে জগৎ থেকে চলে যেতে পারবে।"

৫৬ বছর কোথা দিয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছে, যেন এই কাল হলো। ২১ জুলাই ১৯২০ সকাল ১০টা। উদ্বোধন। কাল মহানিশায় মা লীলা দেহ ফেলে রেখে, শরৎ মহারাজের ভাষায়, 'কৈলাস যাত্রা' করেছেন। সারা ভারতের অগণন মা-র ভক্তের ভিড়ে ছোট বাড়িটি গিসগিস করছে। ঠাকুরঘরে মা-র দেহ অজস্র পুষ্পসম্ভারে সাজানো। শ্রীচরণে অলক্তরাগ, সীমন্তে সিঁদুরের খেলা। কাতারে কাতারে ভক্ত একে একে শেষ প্রণাম নিবেদন করছেন। পদতলে মা-র 'জয়া', মা-র সখী যোগীন-মার দুই চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুবারি শেষ পূজা প্রপাতবৎ বয়ে চলেছে। মা-র দেহে মেঝেতে নত হয়ে প্রণাম করলাম। যোগীন-মা আমার মাথাটি মায়ের শ্রীচরণে খানিকক্ষণ ধরে রেখে দিলেন। বালক মাকে কতটুকুই বা বুঝবে?

মা-র দেহান্তের দ্বিতীয় দিবসে গম্ভীর সারদানন্দ মহারাজ সহকারীকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে জানিয়ে দিতে বললেন যে-দুছত্র সমাচার, তা মনে আছে স্পষ্টঃ "গত পরশ্ব মহানিশা রাত একটায় পরমারাধ্যা

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কৈলাস যাত্রা করিয়াছেন। তের দিনের দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার বিশেষ পূজা করিবে।" আর একটিও অতিরিক্ত শব্দ নয়। * ❑

* স্বামী নির্লেপানন্দের এই স্মৃতিকথাটির একটি অংশ তাঁর একটি স্মৃতিভাষণ যা ১৯৭৬ সালের জুন মাসে কোন ঘরোয়া সভায় প্রদত্ত। তারিখটি জানা যায়নি। ক্যাসেটবদ্ধ ভাষণটি আমরা সোমদেব চট্টোপাধ্যায়ের (গড়িয়াহাট রোড, গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯) সৌজন্যে পেয়েছি। স্মৃতিকথাটি সংগ্রহের ব্যাপারে স্বামী বলভদ্রানন্দ আমাদের সাহায্য করেছেন। স্মৃতিকথাটির অবশিষ্ট অংশ স্বামী নির্লেপানন্দের অধুনা দুষ্প্রাপ্য দুটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সংকলন ও গ্রন্থনা করেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। গ্রন্থদুটির নাম 'রামকৃষ্ণ-সারদামৃত' (করুণা প্রকাশনী, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৬৮) এবং 'দেবী সারদামণি' (সারদা গুরুকুল কন্যা প্রাইমারী বিদ্যালয়, শীতলা, বাঁকুড়া, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮০)। প্রথম গ্রন্থটি আমরা পেয়েছি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০৩) সৌজন্যে, দ্বিতীয়টি সোমদেব চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও দীক্ষালাভ

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ

১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর শুরু হলো আমার কলেজের শিক্ষা। ১৯১৫ সালে স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে আদেশ করেছিলেন কলেজের পড়াশুনা শেষ করতে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে গিয়ে ভর্তি হলাম। যে-বাড়িতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং তাঁদের দল এসে ছিলেন, সেই অ্যাগ্নেস ভিলাতেই তখন আমার কয়েকজন বন্ধু বাস করছিল। আমি তাদের অনুরোধে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম এবং সেখানেই বাস করতে লাগলাম। আমাদের দলটির যিনি প্রধান ছিলেন, পরবর্তী কালে তিনিই শিকাগো বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ।

এই সময় ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন স্বামী মহাদেবানন্দ। স্বামী মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল জয়রামবাটীর খুব কাছেই কোয়ালপাড়া গ্রামে। কোয়ালপাড়াতেও একটি আশ্রম আছে, যেখানে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে এবং ফেরার পথে অবস্থান করতেন। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমা তাঁর নিজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি ও তাঁর নিজেরও একটি ছবি স্থাপন করেছিলেন। শৈশব কাল থেকেই স্বামী মহাদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁকে একান্ত ভক্তিসহকারে প্রাণ ভরে সেবা করেছিলেন। স্বামী মহাদেবানন্দ একদিন আমাকে বললেন যে, শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসেছেন এবং তিনি তাঁকে দর্শন করতে যাবেন। সেটা ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাস। একথা শুনেই স্বামী মহাদেবানন্দকে আমি বললাম: "মাকে দর্শন করতে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই।" তিনি রাজি হলেন।

সেইমতো ১৯১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আমরা ঢাকা থেকে রওনা হলাম এবং পরের দিন খুব সকালেই কলকাতায় পৌঁছে গেলাম। আমরা সোজা বাগবাজারে পৌঁছে গঙ্গায় গেলাম, স্নান সেরে নিলাম এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ফিরে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা তখন দোতলায় তাঁর ঘরে পূজা করছিলেন। আমরা একতলায় প্রতীক্ষা করছিলাম। দেখলাম, স্বামী মহাদেবানন্দের এটি নিজের বাড়ির মতোই এবং অবাধ তাঁর গতিবিধি। তিনি ওপরে গেলেন দেখতে মায়ের পূজা শেষ হয়েছে কিনা। ইতিমধ্যে মায়ের পূজা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো ঐ পূজার আসনেই বসে ছিলেন। স্বামী মহাদেবানন্দ সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিচে নেমে এলেন এবং আমাকে বললেনঃ "মায়ের পূজা শেষ হয়েছে। আমি প্রণাম করে এলাম, তুমিও প্রণাম করে এস।" আমি ওপরে গিয়ে দেখি মা পূজার আসনে উপবিষ্টা। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম।

যে-মুহূর্তে তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি দীক্ষা নেবে?" আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তিনি আবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেনঃ "আসনে বোসো, (হাতে গঙ্গাজল দিয়ে) আচমন কর।" তারপর বললেনঃ "তুমি কোন্ দেব-দেবীকে সবচেয়ে ভালবাস?" আমি নাম বললাম। তখন তিনি আমাকে ইষ্টমন্ত্র দিলেন। আমার দীক্ষা হয়ে গেল। দীক্ষার সময় যেমন নিয়ম, আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ করার মতো কিছুই নিয়ে যাইনি। কেননা আমার যে ঐভাবে হঠাৎ দীক্ষা হয়ে যাবে তা তো আমি ভাবিনি এবং তার জন্য কোনভাবে প্রস্তুতও হয়ে যাইনি। মা আমাকে আদেশ করলেন তাঁর ঘরে তাঁর খাটের তলায় যে-সব ফল রাখা আছে, তার থেকে কিছু নিয়ে আসতে। আমি কিছু নিয়ে এলে তিনি সেগুলি তাঁকে দিতে বললেন। আমিও তাই করলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। নিচে নেমে এসে স্বামী মহাদেবানন্দকে সব বললাম। শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেনঃ "দেখলে তো, আমরা তাঁর ইচ্ছাতে তাঁর কাছে আসার আগেই গঙ্গাস্নান সেরে এসেছিলাম এবং পূজা শেষ হলেও, আমাদের আসার

কথা কেউ তাঁকে না বললেও অন্তর্যামিণী মা তোমাকে দীক্ষা দেবেন বলে পূজার আসনে বসেছিলেন! তুমি মহা ভাগ্যবান।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্য, আমার বন্ধু জয়চন্দ্র চক্রবর্তী সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সে জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বইটি একটি অসাধারণ সুন্দর বই এবং এখনো আমার পরম প্রেরণার উৎস। তখনকার দিনে সব তরুণ এবং যুবকরা বইটি পড়তেন। জয়চন্দ্রের মামার বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একই গ্রামে এবং খুবই কাছাকাছি। ফলে আমরা পরস্পরকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানতাম। সে আমাদের গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়েছিল। দীক্ষার পর বন্ধুটিকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং মা যে-ধরণের কাপড় পরতেন, সেইরকম সরু লালপাড়ের একটি কাপড় কিনে আনলাম। কিছু আঙুরও কিনলাম। তারপর সেগুলি মাকে নিবেদন করলাম। দুপুরে আমি মায়ের বাড়ীতে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদের সঙ্গে পেলাম মায়েরও প্রসাদ।

স্বামী মহাদেবানন্দ আমাকে বললেনঃ "তোমার দীক্ষার পর মা আমাকে বললেন, 'এই ছেলেটি তো ওর মা-ভাইকে কাঁদাবে।' " অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, আমার জন্য সন্ন্যাস-জীবনই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ১৯১৫ সালে বারিখালে যখন স্বামী প্রেমানন্দকে প্রথম দর্শন করি তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেনঃ "তুই সাধু হবি, তবে এখন নয়, বি. এ. পাস করার পর।" আমি তখন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। শ্রীশ্রীমায়ের কথায় তারই পরিপূর্তি ও সমর্থন মিলল। ❑

সংগ্রহ ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মাকে যেমন দেখেছি (২)

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজ (রামময় মহারাজ) গত ১৪ এপ্রিল ১৯৭৮ খড়্গপুর দুর্গামন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজের একটি মাতৃস্মৃতি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'মাকে যেমন দেখেছি' শিরোনামে (পৃঃ ৬৮-৮৩) প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ভাষণে পূজনীয় মহারাজের স্মৃতিচারণায় নতুন কিছু উপাদান আছে, যেগুলি প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত স্মৃতিচারণায় নেই। ভাষণটি থেকে সেই অংশগুলি এখানে পূর্বের শিরোনামেই প্রথম স্মৃতিকথার দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে উপস্থাপন করা হলো।

ভাষণটির ক্যাসেট রেকর্ডিং করেন ডাঃ **রামচন্দ্র ভট্টাচার্য**। ক্যাসেটটির একটি কপি এবং তার একটি অনুলিখন আমরা পেয়েছি ডাঃ ভট্টাচার্যের জামাতা **অরুণদেব ভট্টাচার্যের** সৌজন্যে। অরুণবাবু আমার কাছে ক্যাসেট এবং তার অনুলিখন পাঠিয়েছিলেন গত ৩০/৪/১৯৯৭ তারিখে। আমি তখন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক।—**সম্পাদক**

মায়ের কাছে দেখেছি, ভাষার ব্যবধান থাকত না। নারায়ণ আয়েঙ্গার, তিনি যখন ব্যাঙ্গালোরে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, মায়ের কাছে এসেছেন। আমি তখন কলেজে পড়ি। তিনি বাঙলা জানতেন না। তাঁকে রোজ একটু একটু করে 'কথামৃত' বাঙলা থেকে ইংরেজী করে বলতাম। যেখানে যেখানে ঠিক ঠিক ইংরেজী শব্দটি আমার আসত না, উনি চট করে সেই শব্দটি বলে দিতেন। মায়ের কাছে ওঁকে নিয়ে যেতাম। উনি যা বলতেন, মাকে বাঙলা করে বলতাম, আর মা যা বলতেন ওঁকে ইংরেজী করে বলতাম। কিন্তু আমার সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে যে, মা আমাকে বলছেনঃ "বাবা, ওঁর কথা বুঝতে পেরেছি।" আর কোন কোন জায়গায় মা বাঙলায় যা বললেন, ওঁকে ইংরেজী করে বলার আগেই উনি

বলছেনঃ "আমি বুঝতে পেরেছি মা কি বললেন।" আশ্চর্য ব্যাপার! এসব প্রেমের ভাষা। সব আপনা আপনি বোঝা যায়।

আমরা জানি, শ্রীশ্রীমা বলেছেনঃ "যদি শান্তি চাও তো কারও দোষ দেখো না। অপরের দোষ দেখো না। অপরের গুণটুকু দেখবে, নিজের দোষ দেখবে।" আমাদের কিন্তু অপরের দোষের দিকেই নজর যায়, গুণটি দেখি না। কিন্তু মা গুণটি দেখতেন। একটি ঘটনা বলি। আমার হেডমাস্টার মশায় (প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) মায়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁর বন্ধু ডাক্তার নলিনী সরকার, তিনিও মায়ের শিষ্য। এঁরা দুজনে খুবই বন্ধু ছিলেন। একদিন আমি আর নলিনীবাবু দুজনে দাঁড়িয়ে আছি; এমন সময় এক ভক্ত এলেন—তিনিও মায়ের শিষ্য এবং স্কুলের শিক্ষক। কাছাকাছি গ্রামেই বাড়ি। তিনি এসে মাকে প্রণাম করে চরণধূলি মাথায় নিয়ে "মা কেমন আছেন" ইত্যাদি দু-একটি কথা বলে চলে গেলেন। তিনি যখন একটু দূরে গেলেন, তখন নলিনীবাবু মাকে বললেনঃ "আপনি কেন ওঁকে আপনার চরণ স্পর্শ করতে দিলেন!" তিনি স্কুলের শিক্ষক, লেখাপড়া জানা লোক, মায়ের শিষ্য, কিন্তু তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু লোক কটাক্ষ করতেন। নলিনীবাবু সেকথা জানতেন। মা বললেনঃ "দেখো বাবা, আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। আমি সতীরও মা, অসতীরও মা। আমার ছেলে, আমার মেয়ে যদি ধুলো ঘেঁটে শরীর ময়লা করে, আমি কি তাদের ফেলে দেব? আমি যে মা। আমি তাদের আমার আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে কোলে নেব।" এই ছিলেন মা! সকলকে তিনি স্নেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতেন, কারুর দোষ দেখতেন না।

কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, মা বকতেন কিনা। আমি বলতামঃ "সহজে না, তবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো দু-একটি কথা বলতেন।" আমার হেডমাস্টার মশায় প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আশি টাকা বেতন পেতেন স্কুলের হেডমাস্টার বলে। তবে তখনকার দিনের আশি টাকা এখনকার দিনের কয়েক হাজার টাকারও বেশি। মা যখন ছিলেন আমরা দুটাকা মণ চাল খেয়েছি। তখন টাকার দাম ছিল। জয়রামবাটীতে আমরা দশ আনা মণ আলু কিনেছি, দুটাকা মণ চাল। যাই হোক, তিনি

কিছু টাকা খরচ করে মায়ের জন্য ফল, মিষ্টি, পান, সুপারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে আনতেন। মনে মনে খুব আশা যে, মা খুব খুশি হবেন। মায়ের পায়ের কাছে ঝুড়িটি রেখে প্রণাম করে উঠতেই মা বললেনঃ "দেখো বাবা, ঠাকুরের কৃপায় তো আমার সব জুটে যাচ্ছে। কোন অভাব আমার নেই। তুমি গৃহস্থ, এতগুলি টাকা কেন খরচ করলে? তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আছে, তাদের ভরণপোষণ আছে, তা তুমি এতগুলি টাকা খরচ করলে কি করে হবে বাবা!" একটি কড়া কথাও মা বলেছিলেন—"বাঁদরের চুল হলো বাঁধতে জানে না।" মেয়েদের লম্বা লম্বা চুল হলে তারা খুব সুন্দর করে খোঁপা বাঁধে কিন্তু বাঁদরের লম্বা চুল হলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়বে। বাঁদর তো দাঁত দিয়ে চুল কাটবেই, সে তো আর খোঁপা বাঁধবে না। এই কথাটি শুনে হেডমাস্টার মশায়ের মনে দুঃখ হয়েছে। বেশ কড়া কথা বলেছেন মা। সেদিন মাস্টার মশায় প্রণাম করে বাড়ি যাচ্ছেন, তখন মা বললেনঃ "দেখ বাবা, কেন বলি জান? তুমি তো সংসারী লোক, তোমার কিছু সঞ্চয় দরকার। আর সঞ্চয় যদি না করো তো বাবা, সাধু-সন্ন্যাসীদের কি দেবে? সাধু-সন্ন্যাসীরা তো রোজগার করে না। তারা তো গৃহস্থের খেয়েই বেঁচে আছে।" তখন মাস্টার মশায় খুশি হলেন। কারণ, শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় নয়, সঞ্চয় করলে সাধুসেবা করা যাবে! মাস্টার মশায় পরে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজেরও (স্বামী সারদানন্দ) এমনি একটি কথা মনে পড়ছে। জ্ঞান মহারাজ তখন জয়রামবাটীতে আছেন। ওঁকে শরৎ মহারাজ ওখানে বসিয়ে যান। বলতে গেলে, উনিই জয়রামবাটীর প্রথম মহন্ত। ললিতমোহন চ্যাটার্জি, মায়ের সন্তান, জয়রামবাটীতে একটি চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারি খুলেছিলেন গরিবদের ওষুধ দেওয়ার জন্য। আমাকে শরৎ মহারাজ বললেনঃ "মা চলে যাচ্ছেন কলকাতায়, তুই এখানে থাকবি, এখানে দেখাশুনা করবি, ঠাকুরের বই-টই পড়বি, ঠাকুরের পুজো করবি আর ডাক্তার যা ওষুধ লিখে দেবেন,

তুই রোগীদের তা দিবি।" ললিতবাবু টাকা সংগ্রহ করে পাঠান, কখনো-বা ওষুধ কিনে পাঠান। উনি জ্ঞান মহারাজকে বলেছিলেন টাকা ও ওষুধের হিসেব রাখতে। জ্ঞান মহারাজ শরৎ মহারাজকে বললেনঃ "আমি হিসেব রাখতে পারব না, আর আমি গৃহস্থের টাকাও নিতে পারব না।" শুনে শরৎ মহারাজ বললেনঃ "গৃহস্থের টাকা নিবি না? পরমহংস কোথায় পাব রে, যে তোকে টাকা দেবে পরমহংস? আমরা তো গৃহস্থের খেয়েই বেঁচে আছি রে! রামকৃষ্ণ মিশনের যা কাজ-টাজ চলছে সব তো গৃহস্থের টাকাতেই চলছে। তুই গৃহস্থের টাকা নিবি না তো কোথা থেকে তোকে পরমহংস টাকা যোগাবে?"

রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন মঠ-মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ওঁর কাছে যেতে আমাদের ভক্তির সঙ্গে একটু ভয়ও মিশ্রিত থাকত। কারণ, তিনি খুব গম্ভীর থাকতেন। কোন রকমে প্রণামটি করে চলে আসতাম। সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলতেন। কিন্তু মা যখন আসতেন বেলুড় মঠে, তখন ঐ মহারাজই একেবারে গলায় কাপড় দিয়ে আর জোড় হাত করে মায়ের পিছু পিছু যেতেন ছোট্ট ছেলের মতন। আর মাও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। একদিন মহারাজ বেলুড় মঠে ভোরবেলা উঠে যেমন রোজ ধ্যান করেন সেইরকম ধ্যান করছেন। সেদিন ধ্যান এমন জমে গেছে যে, উনি যে একটা নিয়মিত সময়ে চা খেতেন সেই সময়টা চলে যাচ্ছে। ওঁর চা খাওয়ার ব্যাপারটা একটু পরিপাটি ছিল— বেশ ভাল চা হবে, কাপটি খুব ভাল হবে, বেশ গরম গরম চা-টি হবে, একটু জলখাবার থাকবে, ইত্যাদি। সেদিন বেলুড় মঠে মহারাজকে ঐভাবে ধ্যানস্থ হতে দেখে সেবকরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উনি উঠছেনও না, চোখও মেলছেন না। সেবকরা তখন তাঁর কানের কাছে বলছেনঃ "মহারাজ, সময় হয়ে গেছে, দয়া করে উঠুন, চা খান।" কিন্তু কোন সাড়া নেই। মা তখন বেলুড় মঠে আছেন 'সোনার বাগানে'। 'সোনার বাগান' মানে গোল্ডেন গার্ডেন নয়, একজন উড়িষ্যার মালি ছিল, তার নাম সোনামণি। সেই সোনামণি বাগানটি দেখাশোনা করত বলে আমরা বলতাম 'সোনার বাগান'। ওটা তখন ছিল এক ধনী

ব্যক্তির বাগানবাড়ি। তিনি বা তাঁদের কেউ বিশেষ সেখানে আসতেন না। তাই মা বেলুড় মঠে গেলে তাঁদের বললে তাঁরা ঐ বাড়িটা ছেড়ে দিতেন।[১] মহারাজের সাড়া না পেয়ে সেবকরা মা-র কাছে গেলেন। গিয়ে বললেনঃ "মা, মহারাজ কি তাহলে মহাসমাধিতে শরীর ত্যাগ করবেন?" মা বললেনঃ "না না, ছেলের ধ্যান খুব জমে গেছে। এই প্রসাদ দিচ্ছি, নিয়ে গিয়ে কানের কাছে জোরে জোরে বলবে যে—মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন, উঠুন প্রসাদ খান।" সেবকরা তখন এসে মহারাজের কানের কাছে জোরে জোরে বললেন, মা আপনার জন্য প্রসাদ পাঠিয়েছেন, উঠুন প্রসাদ খান। কিন্তু কোন কথাই তাঁর কানে গেল না। সেই ধ্যান-স্তিমিত লোচন! চোখ খুললেন না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেবকরা মা-র কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "মা, আমাদের মনে হয় মহারাজ মহাসমাধিতে শরীরত্যাগ করেছেন।" মা বললেন হাসতে হাসতেঃ "না বাবা, কিছুই ভয় নেই। আমি যাচ্ছি।" এই যে এত চিৎকার, সেসব কিছু মহারাজের কানে যাচ্ছে না, 'মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন'—সেকথাও কানে যাচ্ছে না, অথচ মা এসেই যেমন কাঁধে হাতটি দিয়েছেন আর বললেনঃ "বাবা! রাখাল ওঠো!" একেবারে সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমাধি থেকে উঠে তিনি মাকে সামনে দেখেই দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। মা মাথায় হাত দিয়ে বললেনঃ "বড় বেলা হয়ে গেছে। আমি প্রসাদ দিয়েছি তোমার জন্য। ওঠো বাবা, প্রসাদটা খাও।" সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছেলের মতো মহারাজ বললেনঃ "এই যে মা, খাচ্ছি।"

কেউ কেউ মহারাজকে বলতেনঃ "মা-র কাছে গেলে তিনি দীক্ষা দেন, আর আপনি বড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেন।" মহারাজ বলতেনঃ "ওরে, মায়ের শক্তি আর আমার শক্তি কি এক? মায়ের অনন্ত শক্তি! তিনি বিষ হজম করে দিতে পারেন। আমরা একটু দেখেশুনে দিই। ঠাকুরের আদেশ

---

১ পরবর্তী কালে স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস বেটি লেগেট বাড়িটি কেনার জন্য বেলুড় মঠকে টাকা দেন। সেই অর্থে মঠের সম্পত্তি হিসাবে বাড়িটি কেনা হয়। তখন থেকে বেলুড় মঠে বাড়িটির পরিচিতি 'লেগেট হাউস' বলে। শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে সঙ্গিনীসহ একাধিকবার বাস করেছেন।—সম্পাদক

হলে তবে দীক্ষা দিই। মা-র তো অনন্ত শক্তি, তিনি সেসব বিষ হজম করতে পারেন।"

ঠাকুরের মতো মা কখনো কখনো বলতেনঃ "এক-একটি ছেলে মেয়ে আসে, তারা প্রণাম করলে শরীর শীতল হয়ে যায়। আবার এক-একজন এমন আছে যে, তারা প্রণাম করলে পা জ্বালা করে। দুবার-তিনবার পা ধুলে তবে জ্বালা যায়।" তখন আমরা বলতামঃ "তাহলে কাউকেই আপনাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে দেব না।" তাতে তিনি উত্তর দিতেন হাসতে হাসতেঃ "ঐ জন্যই তো আমাদের আসা।"—অর্থাৎ এই পাপী-তাপীর পাপ গ্রহণ করবার জন্যই, উদ্ধার করবার জন্যই তো তাঁরা এসেছেন। বলতেনঃ "ঠাকুর কি শুধু রসগোল্লা খেতে এসেছিলেন? এদের উদ্ধার করবার জন্য তিনি এসেছিলেন। তা না হলে তিনি এলেন কেন? নিত্যধামে আনন্দে থাকতেন। এসেছেন এই জন্যেই তো!" এই ওঁদের করুণা।

আরেকটি ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। সেটিও আমার মাস্টার মশায়ের সেবার ঘটনা। বহু সাধুরা ওঁর বাড়িতে যেতেন, উনি তাঁদের সেবা করতেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন বেলুড় মঠের ম্যানেজার। উনি খুব কড়া মানুষ ছিলেন। পান থেকে চুন খসলে উনি খুব রেগে যেতেন। একদিন এক ব্রহ্মচারীর কোন কাজে ত্রুটি হয়েছে। তখন আমরা গঙ্গার জলে স্নান করতাম, আবার গঙ্গার জলই খেতাম। তখনো কলের জল আসেনি বেলুড় মঠে। দশমীর দিন গঙ্গার জল পরিষ্কার থাকত। সেদিন বড় বড় জালাতে জল ভর্তি করে রাখা হতো। সেই জালার মুখে একটা কাপড় বেঁধে তার ওপরে একটা ফটকিরির ডেলা রাখা হতো। ঐ ফটকিরি জলে মিশে যেত আর তলায় সব কাদা-মাটি জমা হয়ে যেত। ঐ ব্রহ্মচারী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে। যেহেতু গঙ্গাজল খুব ময়লা থাকে, সেজন্য শুধু গামছা পরে অনেকে স্নান করে আসত, আর কাপড়টা থাকত ঘরে। ফিরে এসে কাপড়টা পরে, একটা কুয়ো ছিল, যার জল খাওয়া যেত না, সেই কুয়োর জলে গামছা কেচে নিত। একজন সেই ব্রহ্মচারীকে বলেছে—'যাও, ম্যানেজারের কাছে'

আজ তোমার কপালে দু-পয়সা আছে।" তখনকার দিনে গঙ্গা পার হতে দু-পয়সা লাগত। মহাপুরুষ মহারাজ কারও ওপর রেগে গেলে এই বলে শাস্তি দিতেন—"ওকে দু-পয়সা দিয়ে দাও, ও গঙ্গা পার হয়ে যাক।" অর্থাৎ বাড়ি ফিরে যাক। কারণ, সে এখানে থাকবার যোগ্য নয়। যদি ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুলটা কাঁচি দিয়ে কাটতে গিয়ে কচ করে ডালটা কাটা হয়ে যায় বা খানিকটা ছাল ছিঁড়ে যেত তাহলে মহাপুরুষ মহারাজ বলতেনঃ "তুই এখানে থাকবার যোগ্য নয়। সব যে ঠাকুরের জিনিস, এ বোধ তোর হয়নি।" তখন বলতেনঃ "ওকে দু-পয়সা দিয়ে দে, ও গঙ্গা পেরিয়ে চলে যাক।" আবার বলতেন চুপি চুপিঃ "চারটে পয়সা দিবি। বেটা যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে সে দুটো পয়সা কোথায় পাবে?" যাই হোক, সেই ব্রহ্মচারী "আজ তোমার কপালে দু-পয়সা আছে" শুনেই তো ভয় পেয়ে ঐ গামছা পরেই চম্পট! আর বেলুড় মঠে ঢোকেনি। কোথায় যাবে? ঠিক করল, মায়ের কাছে যাবে। মা তখন জয়রামবাটীতে। এদিকে হাতে তো একটি পয়সাও নেই, আবার রাস্তাও তো জানা নেই। যাই হোক, রাস্তায় জিজ্ঞাসা করে করে অনেক ঘুরে ঘুরে—দু-দিন না খাওয়া দাওয়া—হেঁটে হেঁটে আরামবাগে পৌঁছলেন সন্ধ্যার সময়। আরামবাগে একজন সাধু শ্মশানে থাকতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু নন। তিনি ওঁকে বললেনঃ "ভাই, এখান থেকে তো জয়রামবাটী তের মাইল। এখন সন্ধ্যা হয়েছে, রাত হয়ে যাবে। তুমি রাত্রিটা এখানেই থাকো। আমি কিছু আটা আলু ভিক্ষা করে এনেছি, কয়েকটা রুটি বানাব, খাবে। তোমাকে খুব ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। এখানে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর, কাল ভোরে উঠে চলে যাবে।" ঐ সাধুটি মাকে দর্শন করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "ভাই, মায়ের কাছে যাবে গামছাটা পরে?" তিনি একখানি গেরুয়া কাপড় দিলেন তাকে। অবশ্য কাপড়টি ছিল ময়লা এবং ছেঁড়া। সাধুর কাছে সেটিই ছিল। এদিকে আমি আর হেডমাস্টার মশায় মায়ের কাছে গিয়েছি। মাস্টার মশায় তামাক খেতেন। ওঁর জন্য তামাক সেজে আনার সময় উনি বলতেনঃ "মায়ের উনুন থেকে আগুন আনবি না। জিজ্ঞেস করবেন কে তামাক খাবে।" উনি

লুকিয়ে খেতেন। বলতেনঃ "মামীদের উনুন থেকে আগুন আনবি।" আমি যাচ্ছি আগুন আনতে, দেখি ঐ ব্রহ্মচারীটি দাঁড়িয়ে আছেন মায়ের দরজায়। আমি কলকেটা রেখে, ওঁকে প্রণাম করে, জিজ্ঞেস করলামঃ "আপনি কোথা থেকে আসছেন?" উত্তর দিলেনঃ "বেলুড় মঠ থেকে।" আমি বললামঃ "আরে! বেলুড় মঠ থেকে আসছেন আর এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? যান ভিতরে যান, মা আছেন, কথা বলুন গিয়ে।" উনি বললেনঃ "না, তুমি মায়ের অনুমতি নিয়ে এস।" আমি বললামঃ "আমি জানি, বেলুড় মঠের সাধুদের জন্যে কোন অনুমতি দরকার নেই। চলুন নিয়ে যাচ্ছি।" আমি যেন পাণ্ডা এখানে। সকলকেই নিয়ে যেতাম মায়ের কাছে। উনি বললেনঃ "আমি যাব না। আগে মায়ের অনুমতি নিয়ে এস।" মাকে গিয়ে বললামঃ "মা, বেলুড় মঠ থেকে একজন সন্ন্যাসী[২] এসেছেন। আপনাকে দর্শন করবার অনুমতি চাইছেন।" মা হাসতে হাসতে বললেনঃ "বেলুড় মঠ থেকে ছেলে এসেছে, তা আবার অনুমতির কি দরকার?" আমি বললামঃ "তিনি আসছেন না।" মা বললেনঃ "যাও বাবা, নিয়ে এস।" গিয়ে বললামঃ "মা অনুমতি দিয়েছেন।" আমি ভাবলাম, বেলুড় মঠের সাধুরা কাউকে জিজ্ঞেস করেন না, সোজা মায়ের কাছে চলে যান, মা-ও তাতে কত খুশি হন। ইনি কেন এরকম করলেন? গিয়ে দেখলাম উনি মায়ের সামনে একেবারে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন যে, মহাপুরুষ মহারাজের কাজে কিছু ত্রুটি হয়েছিল বলে মহাপুরুষজী তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন এই ভয়ে মা-র কাছে চলে এসেছেন। মা তখন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেনঃ "বাবা, তোমার কোন ভয় নেই। আমি তারককে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তোমার কোন চিন্তা নেই।" আর আমাদের বললেনঃ "আহা! বাছা আমার কত কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে এসেছে!" আরেকটি কথাও মা বলেছিলেন। বলেছিলেনঃ "কাশী বৃন্দাবন যাওয়া সহজ। আমার কাছে আসা কঠিন।" তখন বুঝেছিলাম—

২ তাঁর বসন গেরুয়া দেখে রামময় মহারাজ তাঁকে 'সন্ন্যাসী'ই ভেবেছিলেন।—**সম্পাদক**

এই পথের কাঠিন্য অর্থাৎ কঠিন পথ। এখন বুঝি, "আমার কাছে আসা"-র মানে তা নয়। যার কপালে আছে, তার হবে, তার ভাগ্য। যাই হোক, তিনি বললেনঃ "তোমার কাপড়টা যে ময়লা এবং ছেঁড়া।" রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। ঐ ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় দেখে আমারও প্রথম সন্দেহ হয়েছিল যে, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু নন। তিনি বললেন, আরামবাগের ঐ সাধু কাপড় দিয়েছেন, তাই পরেছেন। তিনি ভয়ে স্নান করার গামছা পরেই মঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি সন্ন্যাসী না ব্রহ্মচারী?" তিনি বললেনঃ "আমি ব্রহ্মচারী। আমার নাম অক্ষরচৈতন্য।" গম্ভীরানন্দজীর মায়ের জীবনীতে ভুল বেরিয়েছে—'অক্ষরচৈতন্য' হবে, 'অক্ষয়চৈতন্য' নয়। গম্ভীরানন্দজীকে ঘটনাটি আমিই লিখে দিয়েছিলাম আরো অনেক ঘটনার সঙ্গে। কিন্তু ছাপার ভুলে 'অক্ষরচৈতন্য' হয়ে গিয়েছে 'অক্ষয়চৈতন্য'। মা বললেনঃ "কোন ভয় নেই বাবা তোমার। আমি তারককে (স্বামী শিবানন্দ) চিঠি লিখে দিচ্ছি। আহা! বাবা, তুমি এখানে কত কষ্ট করে এসেছ হেঁটে হেঁটে—এখন এখানে কদিন থাক।" মাস্টার মশায় বলে গেলেনঃ "রামময় থাক এখানে। উনি যখন যাবেন তখন আর ওঁকে হেঁটে যেতে হবে না। আমার বাড়িতে রামময় নিয়ে আসবে, আমি টাকা দেব। রামময় নিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। ওঁকে আর হেঁটে হেঁটে ফিরতে হবে না।" মা আমাকে বললেন তাঁর বাক্স খুলে সরু লালপাড় কাপড় দুখানি আর একখানি চাদর ব্রহ্মচারীকে দিতে। উনি সেই কাপড় পরলেন।

আমি মায়ের গণেশের কাজ করতাম—অনেক চিঠি লিখতাম। আমার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। এখন বেলুড় মঠে যে পুঁথিটা ধরে দুর্গাপূজা হয় ওটি আমার হাতের লেখা। পঁয়তাল্লিশ দিন খেটে খেটে আমি ঐ পুঁথিটার একটি একটি করে অক্ষর লিখেছিলাম। যেদিন শেষ হলো, সেদিন মহাপুরুষ মহারাজের হাতে দিলাম। তখন তিনি মঠের প্রেসিডেন্ট। উনি খুলে দেখে বললেনঃ "আরে! হাতের লেখা—এ তো ছাপা একদম!" তখনই সেবককে বললেনঃ "দে, দে, রামময়ের হাত

ভরে সন্দেশ প্রসাদ দিয়ে দে।'' শঙ্কর মহারাজ (স্বামী অপূর্বানন্দ) ছিলেন সেবক। তিনি বললেনঃ ''মশায়, জোড়হাত করুন, মহারাজের আদেশ—আপনাকে হাত ভরে সন্দেশ দিতে হবে।''

আমি চিঠি লিখতাম অনেক। মা আমাকে বললেনঃ ''বাবা, একটি চিঠি লিখে দাও তারককে।'' উনি বলে গেলেন আর আমি লিখে গেলাম। লিখলেনঃ

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন তারক,

ছোট রাজেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে, তাই মঠ থেকে তুমি তাড়িয়ে দেবে বলে ছেলে আমার অনেক কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে আমার কাছে এসেছে। তা বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? আমি তাকে পাঠাচ্ছি। তুমি, বাবা, তাকে কিছু বোলো না।

আমার আশীর্বাদ নিও।

ইতি

মা

এই চিঠি চলে গেল। তখন একদিনে চিঠি যেত। তার উত্তরও এসে গেল। তিনি লিখেছেনঃ

শ্রীচরণকমলেষু,

মা,

আমরা খুঁজছিলাম, ছেলেটা কোথায় গেল চলে। যাই হোক, আপনার কাছে আছে জেনে আমরা খুব নিশ্চিন্ত। আপনি তাকে দয়া করে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে কিছু বলব না। আপনার শ্রীচরণে আমার এবং মঠস্থ সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করছি।

ইতি

সেবকাধম

তারক

চিঠির উত্তর এসে গেল। আমি তাঁকে মাস্টার মশায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। মাস্টার মশায় ওঁকে দেখেছেন, ওঁর জন্য দুখানি জামা তৈরি করে রেখেছেন, দুখানি কাপড় কিনে রেখেছেন। ওঁকে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে আমাকে টাকা দিলেন ওঁকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসবার জন্য। একখানি পোস্টকার্ড আমার নাম ঠিকানা লিখে বলেছিলামঃ "মহাপুরুষ মহারাজ আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন লিখবেন।" উনি বললেনঃ "আচ্ছা লিখব।" উনি লিখেছিলেনঃ "মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করে এসে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে যেমনি ঢুকেছি, উনি খাটে বসে ছিলেন, একেবারে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেটা, তুই আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি!' আরো কত কথা স্নেহভরে বলেছেন। আমাকে খুব ভালবেসেছেন।" এই ভাবে মাকে তাঁরা কত উচ্চ ভাবতেন, কত উচ্চ মান, সম্মান দিতেন! আর এই ব্যাপারে মাস্টার মশায়েরও যথেষ্ট সাধু-সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরকম সাধু-সেবা অনেক করেছেন তিনি।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। একবার চারজন মহিলা গোরুর গাড়ি করে ঘাটালের দিক থেকে জয়রামবাটী এসেছেন। আমার সঙ্গেই তাদের প্রথম দেখা। আমি বললামঃ "আপনারা কি মাকে দর্শন করতে এসেছেন? মায়ের আজ তিনদিন জ্বর।" তখন খুব ম্যালেরিয়া হতো। আমাদেরও হতো, মায়েরও হতো। জিজ্ঞাসা করলামঃ "দীক্ষার কথা নেই তো?" ওঁরা বললেনঃ "সেই আশা নিয়েই তো এসেছিলাম। যাই হোক, এখন শুধু মাকে প্রণাম করব।" আমি বললামঃ "হয় তিনচার দিন থেকে যান, আর ওষুধ খেয়ে জ্বরটা সেরে গেলে মাকে তারপর দীক্ষার কথা বলবেন, না হলে পরে চিঠি লিখে, জেনে যে মা ভাল আছেন, দীক্ষা নেবেন।" এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তাঁরা মাকে গিয়ে বলেছেনঃ "আমাদের বড়ই মন্দ ভাগ্য। এসেছিলাম কৃপা পাব বলে!" আমি তো মায়ের সেবা করি, মায়ের কৃপা পেয়েছি, মা আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন এবং তখনো স্কুলে পড়ি। সে আমার কাছে মায়ের কী বিনয়— পাছে আমি বারণ করি যে, জ্বর গায়ে দীক্ষা হবে না! আমার কাছে বিনয়

করে বলছেনঃ "বাবা, বেটাছেলেদের কথা আলাদা। তারা তো যখন ইচ্ছা তখন চলে যেতে পারে যেখানে সেখানে। মেয়েদের বাবা, ঘর ছেড়ে বেরোনো বড় কঠিন। তাদের নানা কাজ, তাতে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারে না। তা বাবা, আমি স্নান করব না। একটু গঙ্গাজল ছিটে দিয়ে একটু আসনে বসে একটু ভগবানের নাম শুনিয়ে দেওয়া বই তো নয়!" আমি অবাক! পাছে আমি বারণ করি, তার জন্য তাঁর এত বিনয়! তারপর একটি একটি করে ঐ চারজন মহিলাকে দীক্ষা দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন আর সাবু খেলেন। ঐ সময় জয়রামবাটী গ্রামে কারো একটিও লেবু গাছ ছিল না। একটু লেবু দিয়ে সাবু খেতে ভীষণ ভাল লাগে। তাই আমরা অনেক দূরের হাট থেকে লেবু কিনে নিয়ে আসতাম। কোথাও শনি-মঙ্গলবার হাট বসত, কোথাও বৃহস্পতি-রবিবার।

আরেকটি ঘটনা বেলুড় মঠে ঘটেছিল। আমি তখন বেলুড় মঠে গেছি। একটি ছেলে শরৎ মহারাজকে খুব ধরেছে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। শরৎ মহারাজ বলেছেনঃ "আজ তুই আমার কাছে দীক্ষা চাইছিস, আর পরে আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি।" কেন একথা বললেন বুঝলাম না। এর মধ্যে মা জয়রামবাটী থেকে উদ্বোধনে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ছেলেটি মাকে আগে দর্শন করেনি। আর মায়ের চরণ স্পর্শ করতেই তার মাথায় হাত দিয়ে মা খুব আশীর্বাদ করলেন। খুব আনন্দে সে মাকে বলেছে দীক্ষার নেওয়ার কথা। মা বললেনঃ "আচ্ছা, কাল তোমার দীক্ষা হবে।" শরৎ মহারাজ তো সব জানেন। যখন ঐ ছেলেটির দীক্ষা হয়ে গেল, তখন সে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে গেছে। শরৎ মহারাজ বলছেনঃ "দেখ, তুই অনেকদিন ধরে আমাকে দিক্ করছিস—দীক্ষা দিন দীক্ষা দিন করে। ঐ পঞ্জিকাটা নিয়ে আয় তো, তোর একটা দীক্ষার দিন ঠিক করে দিই।" ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলেনি। মহারাজ আবার বলছেনঃ "কই রে! দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আন না পঞ্জিকাটা! তোর একটা দীক্ষার দিন ঠিক করি।" তখনও সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তখন শরৎ মহারাজ বললেনঃ "দেখলি, কেন তোকে বলেছিলাম যে, আজ আমার কাছে দীক্ষা চাইছিস, কাল আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি। আমার

চেয়ে কত বড় আছেন দেখলি তো? আমি তো জানি যে, তোর মায়ের কাছে দীক্ষা হবে।"

মা তো সকলকেই দীক্ষা দিচ্ছেন দেখতাম। কিন্তু আমার বয়সী একটা কালো করে ছেলে, সে কত করে বলছে দীক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু মা বলছেনঃ "তুমি রাখালের কাছে দীক্ষা নাও।" সে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, অথচ মা দীক্ষা দিচ্ছেন না। মা তো কাউকে ফেরান না, কিন্তু কেন ওকে ফেরাচ্ছেন বুঝলাম না। এখন মনে হয় মা ওকে দেখেই বুঝেছিলেন যে, রাখাল মহারাজের সঙ্গে ওর গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হয়ে রয়েছে, এইজন্যই দিলেন না। সেই ছেলেটি মহারাজের কাছে দীক্ষা পেয়েছিল কিনা জানি না। তবে দেখলাম যে, তিনি তাকে দীক্ষা দেননি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। একজন বাগদি ছেলে এসেছিল, মা তাকে দীক্ষা দিতে চাননি। তখন সে বললঃ "ও, বিপদে যখন পড়েছিলে মা, তখন বাগদিকে 'বাবা' বলেছিলে। সে আমারই বাবা।" তখন মা তাকে দীক্ষা দিলেন। এইরকম কদাচিৎ এক-আধদিন হতো। না হলে তিনি সকলকেই দীক্ষা দিতেন। অদ্ভুত ব্যাপার সব।

আমি যখন জয়রামবাটী যেতাম তখন জানতাম অনেকে সাধু হয়েছেন যাঁরা আগে স্বরাজ লাভ করবার জন্য ইংরেজের বিরোধিতা করতেন—মানে রাজদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরে ওসব ছেড়ে দিয়ে সাধু হওয়াতে ব্রিটিশ সরকার আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্দেহ করত। ভাবত যে, এরা দিনের বেলায় গেরুয়া পরে ঘোরে আর রাতে বন্দুক হাতে ইংরেজ মারবার জন্যে বেরোয়। এইজন্যে আমাদের যেকোন আশ্রমে কোন অতিথি এলে একটা খাতায় লিখতে হতো আর রোজ পুলিস এসে নাম ঠিকানা নিয়ে যেত। আমি জয়রামবাটী গেলেও ঐরকম নাম ঠিকানা লিখে দিতাম। ঐ রিপোর্টটা যখন আমাদের থানায় যেত, তখন দারোগা একজন কনস্টেবলকে পাঠাতেন আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার বাড়ির লোক জয়রামবাটী যাই বলে সব বিরক্ত। পাছে সাধু হয়ে যাই, সেজন্য তাঁরাও খুশি নন। ঐ কনস্টেবল আমাকে যেতে যেতে রাস্তায় বলতঃ "তুম পলিটিকাল সাসপেক্ট হো, তুমকো

জেল মে ভর দিয়া যায়গা। তুম ঐসা কাম মত করো।" আমি বলতামঃ "তুমি বুঝবে না। তোমার দারোগাকে বোঝাব।" দারোগাও যেতেই বলতেনঃ "তুমি পলিটিক্স কেন কর, ছেলেমানুষ!" আমি বলতামঃ "মশাই, আমি পলিটিক্স করি না। আমি খবরের কাগজই পড়ি না।" যেদিন 'কথামৃত'তে পড়লাম ঠাকুর প্রসাদ মিত্রকে বলছেনঃ "ঐ খবরের কাগজটি সরাও।"—সেইদিন থেকে খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া। ১৯১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তেষট্টি বছর খবরের কাগজ ছুঁইনি। ওদের বলতামঃ "আমি খবরের কাগজই পড়ি না, আমি কি পলিটিক্স করব?" উনি বলতেনঃ "তুমি বি.এ. পাশ কর, তারপর করবে পলিটিক্স।" আমি বলতামঃ "আমি ওখানে যাই গুরুসেবা করবার জন্য। আর তিনি মেয়েমানুষ, লেখাপড়া জানেন না, তিনি ওসব পলিটিক্স করেন না।" যাই হোক, এইরকম বলতাম, আর ওঁরা বলতেনঃ "আচ্ছা যাও।" ছেড়ে দিতেন। আমি প্রত্যেক শনিবার চলে যেতাম, রবিবার থাকতাম আর সোমবার সকাল বেলা একেবারে স্কুলে চলে আসতাম। একবার হয়েছে কি, সোমবার স্কুলে এসেছি, আর বোধহায় বুধবার বা বৃহস্পতিবার একটা ছুটি ছিল তখন জয়রামবাটী চলে গেছি। এদিকে আমার রিপোর্টটা নিয়ে আমার বাড়িতে ঐ কনস্টেবল গিয়ে আমাকে না পেয়ে বাড়িতে জিজ্ঞেস করেছে। বাড়িতে বলেছে আমি জয়রামবাটী চলে গেছি। সে ভেবেছে আমার খবর না নিয়ে গেলে দারোগা বিরক্ত হবেন, তাই খুঁজে খুঁজে সে জয়রামবাটীতে এসেছে। এখন, কনস্টেবল যখন জয়রামবাটীতে এসেছে, আমি তখন বাড়ি চলে এসেছি। আর মা আমাকে ধরবার জন্য পুলিশ এসেছে দেখে, পরে শুনলাম, তিনি কেঁদেছেন। বলেছেনঃ "আমার শান্ত সুবোধ ছেলে, কারও কখনও অনিষ্ট করে না, পুলিশ কেন তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে?" সিংহবাহিনীর কাছে মানত করেছেন আমার জন্য—"ভালয় ভালয় আমার ছেলে ফিরত আসুক মা সিংহবাহিনী, তোমার আমি পুজো দেব।" আমি যখন পরের শনিবার গেলাম, মায়ের কী আনন্দ আমাকে পেয়ে—যেন হারানো নিধি পেলেন। এত আনন্দ তাঁর! মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছেনঃ "কি হয়েছিল

বাবা, তোমাকে ধরবার জন্য পুলিশ কেন এসেছিল?" আমি বললামঃ "ব্যাটা এখানে এসেছিল বুঝি? মা, আমাকে তো প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে থানায় যেতে হয়। থানা এখন শ্বশুরবাড়ি হয়ে গেছে আমার।" এরপর মা সিংহবাহিনীর পুজো দিলেন, আমাকে চরণামৃত খাওয়ালেন, তবে শান্ত হলেন। আমার হেড মাস্টার মশায় যখন শুনলেন যে মা খুব কেঁদেছেন আমার জন্য, তখন আমাকে বললেনঃ "তুই পুলিশের খাতায় বাড়ির ঠিকানা দিবি না। স্টুডেন্ট ক্লাস এইট, বদনগঞ্জ হাইস্কুল, থানা বদনগঞ্জ—এই ঠিকানা দিবি। বাড়ির ঠিকানা দিবি না।" সেইমতো পরের বার রিপোর্ট চলে এল। দারোগা ছিলেন হরিবাবু। আজকাল দারোগা সব বি.এ., এম.এ. হচ্ছে। তখন সব নন-ম্যাট্রিক ছিল। দারোগা হরিবাবু হেড মাস্টার মশায়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ওঁর ইংরেজীতে চিঠি এলে কি উত্তর দিতে হবে হেড মাস্টার মশাই লিখে দিতেন আর গুরুর মতো শ্রদ্ধা পেতেন। আমার নামে রিপোর্ট আসতেই মাস্টার মশায়ের কাছে আগে গেছেন যে, আপনার একটি ছাত্র, রামময় নাম, তার নামে রিপোর্ট এসেছে। সে নাকি রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। মাস্টার মশায় ওঁকে বলে দিলেনঃ "আমি জানি। ও আমার স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে। খুব সৎ চরিত্র। পড়াশুনোয় খুব ভাল ছেলে। তুমি এইভাবে লিখে দাও।"—মাস্টার মশায়ই লিখে দিলেন—'সে পলিটিক্স করে না। গুরুসেবা করার জন্য যায় এবং তিনি আমারও গুরু। তিনি মেয়েমানুষ। তিনি পলিটিক্স জানেন না।' লিখে দিয়ে মাস্টার মশায় বললেনঃ "এইভাবে প্রতিবার লিখে দেবে।" আমি তখন মাকে বললামঃ "আমাকে আর পুলিশের কাছে যেতে হয় না। মাস্টার মশাই যা লিখে দেন দারোগা তাই লিখে পাঠিয়ে দেন।" মা খুব খুশি হলেন। খুব আনন্দ তখন তাঁর।

আমি মায়ের কাছে যাতায়াত শুরু করার পর প্রথম যেবারে মা কলকাতায় যাচ্ছেন—সেদিন সকাল থেকে খুব খাটছি। সব জিনিসপত্র গুছিয়ে-টুছিয়ে প্যাক-ট্যাক করে মাথায় করে আমোদরের ওপারে নিয়ে যাচ্ছি। নদীতে একহাঁটু জল; হেঁটে পার হতে হতো (তখন আমোদরে ব্রিজ হয়নি; হয়েছে মায়ের সেন্টিনারির সময়)—ওপারে গোরুর গাড়ি

আসত কোয়ালপাড়া থেকে। সব জিনিস-টিনিস পাঠিয়ে দিয়েছি। শরৎ মহারাজও চলে গেলেন। সবার শেষে মা যাবেন। উনি পালকিতে যেতেন। ওপারে গোরুর গাড়িতে ওঠার আগে শরৎ মহারাজের পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছে দিলাম। যোগীন-মা গেলেন, গোলাপ-মা গেলেন—ওঁদেরও পা ধুইয়ে দিলাম। আর সারদা-মঠের যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট ভারতীপ্রাণা—তখন আমাদের সরলাদিদি—ওঁর পা ধুইয়ে দিতে যেতে উনি কিছুতেই নেবেন না। আমি বললামঃ "আরে, আপনি তো মায়ের শিষ্যা, আমিও মায়ের শিষ্য; আপনি তো আমার চেয়ে বড়—কী হয়েছে, পা ধুইয়ে দেব। দিদি তো আপনি!" উনি বললেনঃ "না ভাই, আমি পারব না; তুমি জল দাও, আমি নিজে ধুয়ে নিচ্ছি।"

এইভাবে সব চলে গেলেন। মা যাচ্ছেন, ওঁর পালকির সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। নদীর ধারে যেতে মা বলছেনঃ "বাবা, আর ওপারে যেও না।" (শাস্ত্রেও আছে, 'সলিলান্তং পরিব্রজেৎ'—কাউকে বিদায় দিতে হলে, কোনও জলাশয় সামনে পড়লে তখন আর যাওয়ার দরকার নেই।) এখন, মা চলে যাচ্ছেন, আমার খুব কান্না পাচ্ছে; কিন্তু মায়ের দুঃখ হবে বলে আমি কোনরকম করে চেপে রয়েছি। মা যেমনি বলেছেনঃ "বাবা, কেঁদো না"—ভেউ ভেউ করে আমি কাঁদতে আরম্ভ করেছি। মা আবার পালকি থেকে নামলেন, নেমে আঁচল দিয়ে আমার চোখটোখ মুছিয়ে মুখে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেনঃ "বাবা, কী করব, ম্যালেরিয়ায় ভুগি, শরৎ এসেছে, যেতে হবে। সেখানে গেলে ম্যালেরিয়াটা হয় না। আবার আমি জগদ্ধাত্রীপূজার সময় চলে আসব। বেশ ভাল করে খাবেদাবে, থাকবে।..." এই করে বলার পর আমি চুপ করলাম। মা তখন নদী পার হলেন। জয়রামবাটীতে ফিরে গিয়ে একেবারে উঠানে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে খুব খানিকটা কাঁদলাম। আর জয়রামবাটী ভাল লাগল না; মায়ের ঘর খালি, কেউ নাই—আমি চলে গেলাম ইস্কুলে। সেখান থেকে বাড়ি। আবার শবরীর প্রতীক্ষা—মা আবার কবে জয়রামবাটী আসেন! ❑

শ্রীশ্রীমায়ের কথাকণিকা

স্বামী পুরুষাত্মানন্দ

স্বামী পুরুষাত্মানন্দ (জন্ম ১৮৯৫) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। পূর্বাশ্রম অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর সন্ন্যাসগুরু। হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার কারনানি হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। 'উদ্বোধন'-এ তাঁর দেহত্যাগ-সংবাদে লেখা হয়েছিলঃ ''তাঁহার দেহত্যাগের ঘটনা উদ্দীপনাপূর্ণ। যদিও তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে [তাঁর দেহত্যাগ হয় ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে] হঠাৎ উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। কিছু পরেই বলেন, 'মা, তুমি এসেছ, একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।' এই কথা বলিয়া তিনি নিকটের রোগীদিগকে বলেন, 'ভাই, তোমরা কি জেগে আছ? আমার সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি।' ইহার পর তিনি শুইয়া পড়েন, আর ওঠেন নাই।'' (৬৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৩)—**সম্পাদক**

আমি তখন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনেছিলাম। শোনার পর থেকেই মাকে দেখার খুব আগ্রহ জাগে। বেলুড় মঠে আসি। মা তখন জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটী গিয়ে মায়ের পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলাম একজন বৃদ্ধা মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। একজন বলল, উনিই মা। মাকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যে-মাকে দেখব বলে হবিগঞ্জ থেকে ছুটে এলাম, তাঁর চেহারা তো অতি সাধারণ! গায়ের রঙ মলিন, দেখতেও এমন কিছু নয়। মনের মধ্যে এইসব কথা উঠছে। হঠাৎ শুনলাম মা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেনঃ ''আমার রঙ এমন মলিন ছিল না বাবা। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার কিছুদিন পর 'পঞ্চতপা' করে আমার গায়ের রঙ পুড়ে কালো

হয়ে গেছে।" কথাগুলি বলে মা চুপ করে গেলেন। আমি তো শুনে একেবারে স্তম্ভিত! মনে খুব ভয়ও হলো। মনে মনে মায়ের কাছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলাম। বললামঃ "মা, আমি তোমার সম্বন্ধে এসব ভেবেছি। আমাকে ক্ষমা করো।"

সেবারই মা আমাকে দীক্ষাদান করলেন। দীক্ষার পরে প্রসাদ পেতে বসেছি। আরও অনেকে বসেছেন। সকলের পাতে ভাত, ডাল, তরকারি দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবছিঃ "এত অল্প ভাতে আমার পেটের একটা কোণাও ভরবে না। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।" এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, মা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের খাওয়া দেখছেন। আমার সামনে এসে পরিবেশনকারীকে বললেনঃ "ছেলেকে এত কম ভাত-তরকারি দিয়েছ কেন? ওরা বেশি ভাত খায়, ওকে আরও ভাত-তরকারি দাও। এতে ছেলের পেট ভরবে না।" এবারও আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, মা অন্তর্যামিনী। আমার মনের কোণে যা উঠছে, যা মনের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা করছি সব তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। শুধু এ-দুটি ঘটনা নয়, সেবার জয়রামবাটীতে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে মায়ের অন্তর্যামিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলাম।* ❑

সৌজন্য ঃ **নরেশচন্দ্র চৌধুরী (শিলচর)**। প্রয়াত নরেশবাবুর কন্যা **শিবানী ব্রহ্মচারী (শিলচর)** এই স্মৃতিকণিকাটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।—**সম্পাদক**

* **উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৮, পৃঃ ২৫৪**

মাকে যেমন দেখেছি

স্বামী অব্যক্তানন্দ

আমি তখন কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়ি। বয়স ১৭ বছর (জন্ম ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ)। হস্টেলে থাকি। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীশ্রীমায়ের কথা জানতাম। তিনি তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। একদিন তাঁকে দর্শন করতে জয়রামবাটী গিয়ে উপস্থিত হই। সেসময় জয়রামবাটী যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল। দু-তিনদিন সময় লাগত। জয়রামবাটী গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, মা স্নেহ ও সেবার জীবন্ত মূর্তি। আরো মনে হয়েছিল, মা শারীরিক শ্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করতেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। আমার চা খাওয়ার অভ্যেস বলে মা আমার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুধ সংগ্রহ করতেন। তখন মায়ের শরীর ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি নিজে আমার জন্য এই কাজটি করতেন। শুধু চায়ের জন্য দুধ নয়, মা এ-বাড়ি ও-বাড়ি নিজে গিয়ে খোঁজ করতেন কারো বাড়িতে কোন শাক-সবজি পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেলে আমার জন্য তা কিনে নিয়ে আসতেন। সেসময় জয়রামবাটীতে চা খাওয়ার কোন লোক ছিল না, নিত্য টাটকা শাক-সবজি পাওয়াও কঠিন ছিল।

মায়ের এই রূপ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হস্টেলে ফিরে আসার কয়েকদিন পর হস্টেলের একটি ছাত্র খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমি তার সেবার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিই। সেদিন তার খুব জ্বর, শরীরে খুব ব্যথা। আমি তার হাত-পা টিপে দিচ্ছিলাম এবং মাথায় জলপটি দিচ্ছিলাম। ঐ জ্বরের মধ্যে বন্ধুটি

আমাকে বলেঃ "তুমি ঠিক আমার মায়ের মতো আমার সেবা করছ।" আমার তখন শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে পড়ল। এই সেবার ভাবটি তাঁকে দেখে শিখে এসেছিলাম। তাঁর সেবা দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওটি সাধারণ কাজ নয়, ওটি ছিল আদ্যন্ত একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

অল্প সময়ের জন্য হলেও জয়রামবাটীতে সেবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আমার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, সেবার মা কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন। কলকাতাতেও মাকে পরে দর্শন করেছি। জয়রামবাটী এবং কলকাতা, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, দেখেছি তাঁর ছিল একটি বিশ্বমন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম এবং রক্ষণশীল পরিমণ্ডলে ছিল তাঁর অবস্থান। আবার অতিমাত্রায় রক্ষণশীল নারীরা সর্বদা থাকতেন তাঁর চারপাশে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর মধ্যে কখনো কোন গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতা স্থান পায়নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছিল তাঁর কাছে তুচ্ছ। তাঁর সেই ঔদার্যের কথা সর্বজনবিদিত।

একবার দেখলেও মা কখনো কাউকে ভুলে যেতেন না। আমার সঙ্গে মাত্র সামান্য সময়ের পরিচয়, কিন্তু মা আমাকে ভোলেননি। মা তখন বাগবাজারে উদ্বোধনে শেষ অসুখে পীড়িতা। নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীরা পালা করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকত। তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার বোন। একদিন সে মাকে পাখা করছিল। সে যে আমার বোন সেকথা সে কখনো মাকে বলেনি। মা তাকে বললেনঃ "তুমি তো মনোরঞ্জনের বোন? তাই না?" সে বললঃ "হ্যাঁ।" 'মনোরঞ্জন' আমার পূর্বাশ্রমের নাম। বোনের কাছে পরে একথা আমি শুনেছিলাম। শুনে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, এত ভক্তের মধ্যে মা আমাকে মনে রেখেছেন! জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এখন বুঝি এটি তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল, কারণ তিনি ছিলেন জগজ্জননী এবং অদ্বৈত অনুভূতির চূড়ান্ত শিখরে ছিল তাঁর নিরন্তর অবস্থান। তাঁর কর্মাদর্শ, জীবনাদর্শ এবং ধর্মাদর্শ সবই ঐ অদ্বৈতভূমি থেকে উৎসারিত।

মাকে যতটুকু দেখেছি এবং জীবন-উপান্তে এসে তাঁর সম্পর্কে যে-উপলব্ধি আমার হয়েছে তা হলো এই—মা ছিলেন আদর্শ সেবাযোগিনী। সর্বোচ্চ প্রশান্তির ভূমিতে তাঁর দেহ, মন এবং সত্তা সবসময় অবস্থান করত। তাঁর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস তিনি ব্যয় করেছেন সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই ছিল সমান। সবাই ছিল তাঁর সন্তান। এই মাতৃত্বের ভূমিতেই তিনি অদ্বৈত উপলব্ধিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছিলেন। যখন তাঁকে স্থূল দেহে দর্শন করেছি তখন কতখানিই বা তাঁকে বুঝেছি? কিন্তু জীবনসায়াহ্নে এসে বুঝতে পারছি, অদ্বৈত অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তরে সর্বদা অবস্থান করেও মা কত সহজ এবং অনাড়ম্বর ভাবে সকলের সামনে নিজেকে রাখতেন। কতখানি শক্তির অধিকারিণী হলে এমনটি করা সম্ভব! এই অনুভূতি এবং শক্তি বাহ্যিক কোন তপস্যার দ্বারা অর্জন করতে হয়নি তাঁকে। তিনি তাঁর স্বাভাবিক মাতৃত্বের শক্তিতেই তা লাভ করেছিলেন এবং একটি সন্তানকেও গর্ভে ধারণ না করে হয়ে উঠেছিলেন জগতের সব মানুষের সত্যিকারের জননী। সেই বিশ্বজননীর দর্শন আমি পেয়েছিলাম আমার জীবনের প্রথম পর্বেই। সেটিই আমার জীবনের সবথেকে বড় সৌভাগ্য। ❑

সংগ্রহ ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ত্রয়োদশ পর্ব

মায়ের কথা

অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল

জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজায় অনুকূল মণ্ডলের যাত্রাগানের প্রসঙ্গ স্বামী পরমেশ্বরানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' গ্রন্থে (১৩৭৯ সং, পৃঃ ৭৯) উল্লেখ আছে। তাঁর এই স্মৃতিবিবরণটি তাঁর মধ্যম পুত্র গুণসিন্ধু মণ্ডল ও কনিষ্ঠ পুত্র দেশবন্ধু মণ্ডল গত ৮ জুন ১৯৯৭ অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন।—**সম্পাদক**

আমাদের গ্রাম হুগলী জেলার সন্তোষপুরে। জয়রামবাটী-কামারপুকুর থেকে বেশি দূরে নয়। ঐ অঞ্চলে গ্রামটির পরিচিতি 'বেজো-সন্তোষপুর' বলে। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে বেজো-সন্তোষপুরের যাত্রাদল ভাড়া করতে এসেছিলেন শ্রীশ্রীমার এক ভাই (মেজভাই কালীকুমারবাবু)। তিনি দুরাত্রির জন্য যাত্রাদল বায়না করে গেলেন। ঘটনাটি সম্ভবত ১৩০১ বা ১৩০২ সালের।

আমি নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাদল নিয়ে হাজির হলাম। মোড়লদের খামারে হ্যাজাক টাঙিয়ে যাত্রা শুরু হলো। প্রথম দিনের পালা ছিল 'সীতাহরণ' এবং দ্বিতীয় দিনে 'চণ্ডীদাস'। প্রথম দিনের ঘটনা স্মরণীয়। যাত্রাপালায় আমার ভূমিকা ছিল রাবণের। অভিনয়ে লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডির বাইরে সীতাদেবীকে আসতে হবে এবং ভিক্ষুক বেশে সেই ভিক্ষা গ্রহণ করতে যাবে রাবণ; তারপরই সীতাহরণ পর্ব। এই দৃশ্যের জন্য বেশ কিছু সময় থাকত যাত্রাপালায়। ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দৃশ্যে হাজির হয়েছিল। আমার 'রোল' আসতে ভিক্ষুকবেশে হাজির হলাম আসরে। চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে কেবল দর্শকের মাথা; সবাই টানটান উত্তেজনায়! হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটি মুখের দিকে, মনে হলো যেন সেখানে একটা বড় হ্যাজাক জ্বালা আছে। মাথায়

ঘোমটা দেওয়া অথচ মুখমণ্ডলের সমস্তটাই আমার চোখে স্পষ্ট! আমি দেখতে পেলাম, সেই মুখ আর ছবিতে সীতাদেবীর যে মুখ দেখি, সেই মুখ যেন একই। অভিনয়ের মধ্যেই দেখে নিয়েছিলাম সেখানে কোন আলো আছে কিনা; দেখলাম কোন আলো নেই। চারপাশে আধো অন্ধকার। অনেক স্ত্রীলোকের মধ্যে হঠাৎ ঐ বিশেষ মুখটিই সে-রাত্রেই আমার দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছিল।

পালা শেষ হলো। দর্শকরা সবাই চলে গেল। আমরাও খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেলাম। আমার কিন্তু ঘুম হলো না। রাত্রে আবার বাইরে এলাম। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বারবার ভাবতে লাগলাম, এতদিনের অভিনয়-অভিজ্ঞতায় এমন তো কখনো দেখিনি? একি মনের ভ্রম?

জানতাম, উনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্যরা তাঁকে মা-জ্ঞানে ভক্তি করেন—এই পর্যন্তই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়েও তখন বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুনেছিলাম—কামারপুকুরের গদাধর চাটুজ্জে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীমন্দিরে পুরোহিত হয়ে ঢুকেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়; তখন মন্দিরের খাজাঞ্চী ও অন্যান্য পরিচালকরা তাঁকে সরিয়ে অন্য পুরোহিত নিয়োগ করে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীসাধনা করেছিলেন। আমাদের কুলপুরোহিতের (নকুল ঘটক) বাড়ি কামারপুকুরের লাগোয়া শ্রীপুর গ্রামের ঘটকপাড়ায়। তাঁদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ঐরকম তাচ্ছিল্য ভাবের কথাই শুনেছিলাম। কিন্তু যাত্রাভিনয়কালে যে-দৃশ্য দেখলাম তা আমার পূর্ব ধারণাকে ঝড়ের মতো এলোমেলো করে দিল। আমি ব্যাকুল হয়ে রাত জেগে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন সকাল হবে।

সবে সকাল হয়েছে, পাড়ার ইতস্তত দু-একজন লোক মাঠে প্রাতঃকৃত্য সারতে যাচ্ছে; আমি সোজা দৌড় দিলাম শ্রীশ্রীমার বাড়ির দিকে। সেখানে কেউ ওঠেনি তখন। কাছেই একজন ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেয়ে মায়ের সংবাদ জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ "মা উঠেছেন, তবে এত সকালে কি দর্শন হবে?"

আমি তবু অনুরোধ করলামঃ “একটু দেখুন না, আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। একবার তাঁকে দর্শন না করলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।”

আমাদের এই কথোপকথনকালেই হঠাৎ সেখানে মা এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারী মহারাজ মাকে দেখেই বললেনঃ “মা, ইনি অনুকূল মণ্ডল। এঁরই যাত্রাদল। উনি কাল সারারাত ঘুমোতে পারেননি। তাই ভোর হতে না হতেই ছুটে এসেছেন আপনাকে দর্শন করতে।”

হঠাৎ যেন দেবলোকের কণ্ঠস্বর শুনলামঃ “এস বাবা!”

এই কণ্ঠস্বর আমি জীবনে শুনিনি। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হলো। আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম জানালাম। মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেনঃ “বাবা, খুব ভাল পালা হয়েছে কাল! আজও যাব তোমার পালা দেখতে।”

আমি বললামঃ “হ্যাঁ মা, অবশ্যই যাবেন।”

সেদিন মা বললেনঃ “বাবা, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে যেও।” মায়ের হাত থেকে ঠাকুরের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম। কী মধুর তার স্বাদ! আজও স্মরণে আছে।

এরপরই শুরু হলো আমার মায়ের বাড়িতে যাতায়াত। ক্রমে মায়ের সান্নিধ্যলাভ ও দীক্ষাগ্রহণ। আমি আগে আমাদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম। তথাপি ব্যাকুলতা জাগল ভীষণ—মায়ের কাছে ছুটলাম দীক্ষা নিতে। মা বললেনঃ “বাবা, কুলগুরুর কাছে তো দীক্ষা নিয়েছ; এবার ঠাকুরের কথা পড়, তাঁর কথা ভাব, তাহলেই হবে।”

আমি পুনরায় মাকে নিবেদন জানালামঃ “মা, আপনি দীক্ষা না দিলে আমি মনের দিক থেকে স্থির হতে পারছি না।”

মা তখন বললেনঃ “আচ্ছা বাবা, তুমি কুলগুরুর কাছে অনুমতি নিয়ে এসো; তিনি যদি নিষেধ না করেন তাহলে তোমার দীক্ষা হবে।”

আমি আর বিলম্ব না করে পরদিনই আমাদের কুলগুরুর কাছে অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম।

তারপর আমার জীবনে আরেকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তখন

যাত্রাপালার পোশাক-পরিচ্ছদে এত উজ্জ্বলতা ছিল না। গ্রামাঞ্চলে এত ব্যবস্থারও সুযোগ ছিল না। 'ঘড়াসুর' পালার কাজ ধরেছি। কলকাতা গেলাম পোশাক কিনতে। বয়স কম। কলকাতার এক যাত্রাদলে আমাদের দেশের একজন কাজ করত। কলকাতায় তার কাছে উঠেছিলাম পোশাক কিনব বলে। সেখানে গিয়ে দেখি, তাদের দলেও 'ঘড়াসুর' পালার মহড়া চলছে। তাদের দলে যে ঘড়াসুরের অভিনয় করছিল তার অভিনয় ঠিকমতো হচ্ছিল না। আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললাম— ঘড়াসুরের অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। যাত্রাপার্টির গদিতে এক ব্যক্তি বসেছিলেন, তিনি তখন বলে উঠলেনঃ "ওহে ছোকরা, ঘড়াসুরের অভিনয় যে হচ্ছে না, তুমি বুঝলে কি করে? তুমি এসবের কিছু বোঝো?"

আমি মাথা নিচু করে বললামঃ "যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি ঘড়াসুরের একটু অভিনয় করে দেখাতে পারি।" "দেখাও দেখি"—সেই ভদ্রলোক বললেন।

ঘড়াসুরের পোশাক পরে ঘড়াসুরের অভিনয় করে দেখালাম। গদিতে বসা ভদ্রলোক নেমে এসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেনঃ "বাঃ, সুন্দর হয়েছে! ছোকরা, তোমার নাম কি?"

বললামঃ "অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল। বাড়ি আরামবাগের কাছে বেজো-সন্তোষপুরে।" তিনি তখন বললেনঃ "ম্যানেজারবাবু, ওর গা থেকে আর ঘড়াসুরের পোশাকটা খুলে নিতে হবে না। ওটা ওকে দিয়ে দিন।" আমি বললামঃ "না, না।" তিনি তখন বললেনঃ "ছোকরা, তুমি আমায় চেনো না। আমার নাম দানীবাবু। (দানীবাবু হলেন গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পিতার সমতুল্য না হলেও দানীবাবুও অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন।) যা একবার বলি, তা ফেরাই না।" এই বলেই তিনি গটগট করে চলে গেলেন।

সেদিন আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। মনে হলো অভিনয়-জীবনের বড় পুরস্কার পেলাম। তখন বারবার মনে হতে লাগল— শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদেই এটি সম্ভব হলো।

ঘড়াসুর পালার পোশাক কিনে গ্রামে ফিরে প্রথমেই গেলাম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে জয়রামবাটী। সেখানে মাকে সমস্ত জানালাম। মা খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ঘড়াসুর পালায় খুবই সাফল্যলাভ করেছিলাম। জয়রামবাটীতে মাকেও দেখিয়েছিলাম ঐ পালা। মায়ের কাছে প্রায় প্রতিবছরই জগদ্ধাত্রীপূজায় আমার আসর বাঁধা থাকত। সেখানে সীতাহরণ, চণ্ডীদাস, প্রহ্লাদ, সপ্তরথী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মণবর্জন, ভক্ত হরিদাস, রামপ্রসাদ, জরাসন্ধ—এমন অনেক পালা করেছি; কখনো একরাত্রি, কখনো বা দুরাত্রি। আমার ভাইপো শীতল মণ্ডল (নানু) আমার দলে বাঁশি বাজাত। ঐ অঞ্চলে তার জুড়ি মেলা ভার। কনসার্ট বাজাত মৃত্যুঞ্জয় পাল। অভিনয় করতেন দক্ষ অভিনয়- কুশলীরা। তাঁদের মধ্যে অবিনাশ মুখার্জী, দেবেন ব্যানার্জী, রামশশী ঘোষাল, টুরো ঘোষাল, শচী মণ্ডল, অশ্বিনী ব্যানার্জী, নগেন ডোম, কানাই মল্লিক, জানকী মেদ্দা, মানিক অধিকারী, মদন অধিকারী, কালীপদ ঘোষ প্রমুখ পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা এক-একটা দলের প্রধান শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত ও আশীর্বাদধন্য।

আমার অভিনয়জগতে আসার সার্থকতা হলো মাতৃদর্শন! আমাদের জমিজমা ছিল ভালই। উচালনের এক বড় মহল আমার বাবা পেয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে। তিনি বর্ধমান রাজ এস্টেটে কাজ করতেন। আমাদের ঘোড়া, পালকি সবই ছিল। তবু তাতে মন ভরেনি। অভিনয়জগৎ আমাকে ডেকেছিল। এর জন্য বাড়ির লোকের কাছে কম ভর্ৎসনা শুনতে হয়নি; তখন কি জানতাম যে, এই পথেই পৌঁছে যাব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর কাছে! অভিনয়ের সুবাদেই মাকে পেয়েছিলাম। আমি খুব ছোটবেলায় গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছিলাম। সে-দুঃখ ভিতরে জ্বলন্তই ছিল। যেদিন শ্রীশ্রীমার দর্শন হলো, সেদিন থেকে যেন আমার হারানো মাকে আবার ফিরে পেলাম।

মায়ের কাছে এসেই ঠাকুরকে চিনতে শিখেছি, ভাবতে পেরেছি।

মায়ের ছোঁয়ায় জীবন ধন্য হয়েছে। মা দীক্ষা দিয়ে অন্তরের তীব্র দহনকে শীতল করেছেন। স্ত্রী-পুত্র সকলেই মায়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে।

ঠাকুর ও মায়ের চিন্তা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন চিন্তা নেই। কামারপুকুরে ঠাকুরের ঘরের উঠোন দিয়ে হাঁটতে পারতাম না; মনে হতো এখানে ঠাকুরের পায়ের চিহ্ন ছড়ানো আছে। সেই কারণে ঐ ঘর-দুটির (ঠাকুরের পৈত্রিক বাড়ি-দুটি) ছাঁচা দিয়ে হেঁটে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে যেতাম। কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে কোন লোক যদি আমাদের গ্রামে আসতেন—তা সে ভিখারি হলেও আমি তাঁকে প্রণাম করতাম; কারণ তিনি যে ঠাকুর-মায়ের গ্রামের লোক! বলতামঃ "আপনারা ভাগ্যবান, পুণ্যবান ও কৃতার্থ! শত যুগের তপস্যার ফলেই আপনারা অমন ভাগ্য লাভ করেছেন!" মা-র চরণে প্রার্থনা, তিনি যেমন জয়রামবাটীতে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন, পরকালেও যেন ঠাঁই দেন এই অধম সন্তানকে।* ❑

সংগ্রহ : তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, পৃঃ ৩০৬-৩০৭

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা

অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

মূলঘর গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের খুলনা জেলায়) মামার বাড়িতে পড়াশুনা করে ওখান থেকে অল্পবয়সে পোস্ট অফিসের চাকরি পেয়ে বরিশালে আসি ১৯০৩ সালে। মামার বাড়িতে থাকার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কথা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের কথা শুনতাম। শুনতে খুব ভাল লাগত। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত' পড়তাম। পড়তে ভালবাসতাম। তখন সবে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়েছে, ঠাকুর তো চলেই গেছেন আগে। তাই ভাবতাম, মায়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা নেব, তাঁকে দর্শন করব। ভাবতাম, আমার মনের এই প্রবল ইচ্ছা মা কি পূরণ করবেন?

কয়েকবছর পর ১৯০৯ সালে নানা সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে আমার অফিসের এক সহকর্মী পুলিনবাবুর সঙ্গে কলকাতায় বিডন স্ট্রীটের কাছে আমার সম্পর্কিত ভাই প্রমদাচরণ সেনগুপ্তের বাসায় উঠি। শুনলাম, মা তখন আছেন বাগবাজারে বর্তমান উদ্বোধন লেনের বাড়িতে। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) মায়ের সেবার তত্ত্বাবধান করেন, দর্শনার্থী ও ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

আমরা কলকাতায় নতুন—কাউকে জানি না বা চিনি না। মনে প্রবল ইচ্ছা, মাকে দর্শন করব এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নেব। কলকাতায় আসার পরদিন মাকে দর্শন করতে গেলাম। মনের ইচ্ছা শরৎ মহারাজকে জানাতে তাঁর নির্দেশে মায়ের একজন সেবক আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। সেবক মহারাজ বললেনঃ "মা এখন বিশ্রাম করছেন। কাল সকালে আসুন, আমি মাকে সব বলে রাখব।" আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় থাকি ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে

'মায়ের বাড়ী'-তে হাজির হলাম। সেবক মহারাজ আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন, দেখলাম মা মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। মনে খুব ভয় হচ্ছিল যে, যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন! মাকে নিঃশব্দে প্রণাম করলাম। তখনো মায়ের মাথায় পুরো ঘোমটা।

সেবক মাকে কি যেন বললেন। তারপর মা আস্তে আস্তে তাঁর মুখের ঘোমটা তুলে আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম! কী মধুর সেই দৃষ্টি! মন আনন্দ আর তৃপ্তিতে ভরে গেল।

আমি আবার মাকে প্রণাম করলাম। কিছুক্ষণ পর সেবক এসে আমাকে বললেনঃ "মা আপনাকে দীক্ষা দিতে সম্মতি দিয়েছেন। গঙ্গাস্নান করে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসুন।" আমি বাড়িতে স্নান করেই গিয়েছিলাম। আবার গঙ্গায় স্নান করে ফুল-মিষ্টি নিয়ে 'মায়ের বাড়ী'-তে এলাম। সেইদিনই আমার দীক্ষা হয়ে গেল। শরৎ মহারাজ আমাকে মায়ের একটি ছবি দিলেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন। দু-তিনদিন কলকাতায় থেকে আবার আমার কর্মস্থল বরিশালে ফিরে গেলাম।

বরিশালে এসে মনে খুব জোর পেলাম। স্থানীয় কিছু ভক্তকে যোগাড় করে সেখানে 'রামকৃষ্ণ পাঠচক্র' স্থাপন করলাম। সেখানে প্রতি রবিবার বিকালে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করা হতো, ভজন হতো।

এবার মায়ের অহেতুকী কৃপার একটি ঘটনা বলে আমার স্মৃতিকথার ইতি টানব। মা কল্পতরু। কাতর হয়ে চাইলে তিনি কখনো নিরাশ করেন না, মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। এই প্রসঙ্গে সেই ঘটনাটি বলি। তখন শ্রীশ্রীমায়ের ফটো সহজলভ্য ছিল না। শুধুমাত্র মঠ-মিশনের ঘনিষ্ঠ ও মায়ের দীক্ষিত ভক্তরাই একখানি করে তাঁর ফটো পেতেন। দীক্ষার পর আমি মায়ের একখানি ফটো পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। ফটোখানি খুব গোপনভাবে রাখার নির্দেশ ছিল। সেইভাবে রাখার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অতি গোপনে রাখার ফলে দীক্ষার প্রায় ৬।৭ মাস পর ফটোখানি কোথায় যে রেখেছি তা আর মনে পড়ল না। ফলে ফটোটি আর খুঁজে পেলাম না। খুবই চিন্তিত হয়ে

পড়লাম। শেষে পুলিনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, কলকাতায় গিয়ে পুনরায় আরেকখানি ফটো সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। সুযোগমতো কলকাতায় যাওয়া হলে একদিন উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে সব নিবেদন করা হলো। পুলিনবাবুই মহারাজের কাছে গেলেন, আমি তফাতেই থাকলাম। অপরাধের কথা ভেবে মহারাজের সামনে যাওয়ার সাহস হলো না আমার। পুলিনবাবু সব কথা মহারাজকে ভয়ে ভয়ে বললেন এবং আমার আর্জিটিও জানালেন। শুনে মহারাজ খুব ধমক দিয়ে বললেনঃ "একি কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি পেয়েছ যে, বৈঠকখানা ঘর সাজাতে হবে! যতসব অসাবধান, বেহুঁশ ছেলে!" আরও কি কি সব বললেন! মহারাজের ধমক খেয়ে পুলিনবাবু এক পা এক পা করে পিছিয়ে এসে সেখান থেকে সরে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আমরা বরিশালে ফিরে গেলাম।

এখন কি করা যায়? দুজনে গোপনে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, এখন শ্রীশ্রীমাকে সব জানিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। সেইমতো সমস্ত ঘটনা তাঁকে পত্রে জানিয়ে পরিশেষে প্রার্থনা জানালামঃ "মা, আপনি ব্যবস্থা না করলে ছবি পাওয়ার আর কোন আশা দেখছি না।" যথাকালে তাঁর আশীর্বাদী পত্র এসে পৌঁছাল। তাতে অন্যান্য কথার পর মা লিখেছিলেনঃ "তোমরা ভাবিত হইও না। উদ্বোধনে আসিয়া শরৎকে এই পত্র দেখাইলে ছবি পাইবে।" পত্র পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হলাম। সুযোগমতো পুনরায় কলকাতা গেলাম। সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের 'অক্ষয় কবচ'—তাঁর আশীর্বাদী পত্র। এবারও আগেরবারের মতো নিজে তফাতে থেকে পুলিনবাবুকে শরৎ মহারাজের কাছে পাঠালাম। আমার তখন অল্প বয়স—২৪ বছর। শরৎ মহারাজের বিশাল দেহ ও সুগম্ভীর মূর্তির সম্মুখীন হওয়া ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে সহজ ছিল না। পুলিনবাবুও ভয়ে ভয়ে মহারাজের কাছে এগোলেন। একেবারে কাছে না গিয়ে কিছুটা দূর থেকে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিখানি মহারাজের সামনে রাখলেন। চিঠিখানি পড়ে একটু একটু মাথা দোলাতে দোলাতে মৃদু হেসে মহারাজ বললেনঃ "হুঁ! একেবারে হাইকোর্টে

আপীল করা হয়েছে—হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছে।" বলে গণেন মহারাজকে (ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ) ডেকে বললেনঃ "এই ছোকরা মায়ের যে যে ছবি চায়, দিয়ে দাও।" মায়ের একখানার বেশি ছবি পাওয়ার কথা আমার মনেও আসেনি, কারণ একখানা পেলেই তখন মহা সৌভাগ্য মনে করব। সুতরাং গণেন মহারাজের কাছ থেকে মায়ের একটি ফটো নিয়ে আনন্দে ভাসতে ভাসতে কর্মস্থল বরিশালে ফিরে এলাম। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটির গুরুত্ব বোঝা কঠিন। কারণ, এখন মায়ের ছবি অতি সহজলভ্য—সর্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি ছিল অভাবনীয় এবং স্বাভাবিকভাবেই মহা সৌভাগ্যের। বরিশালে মহানন্দে ফেরার পথে বারংবার একথাই ভাবছিলাম যে, কাতরভাবে আর্জি জানালে মা কারও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না। অভাবিতভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছিলাম। আমার কোন যোগ্যতা না থাকলেও তিনি কৃপা করে আমাকে দীক্ষাদান করেছিলেন। আরও একবার করুণাময়ী মা তাঁর কৃপা দান করে আমাকে কৃতকৃতার্থ করলেন। তাঁর সেই ছবি আজও আমার কাছে রয়েছে। তা-ই আমার আজ সবচেয়ে বড় সম্বল।[১] * ❑

১ লেখকের (১৮৮৫-১৯৬০) এই অপ্রকাশিত এবং স্বহস্তে লিখিত স্মৃতিকণিকাটি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জহর সেনগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ১০১তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৬, পৃঃ ৭১৩-৭১৪

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

চারুবালা সেনগুপ্তা

বাঙলা ১৩০৩ সালে আমার জন্ম। ১৩১৫ সালের ২৫ বৈশাখ আমার বিবাহ হয়। বিবাহের এক মাসের মধ্যেই স্বামী কর্মস্থলে মারা যাওয়ায় আমি বিধবা হই। ১৩২০ সাল পর্যন্ত আমি আমার মা-বাবার কাছে থাকি। এই সময় আমার পরিবারের সকলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুযায়ী আমার পুনর্বার বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। আমি তাঁদের বলিঃ "আমি বিবাহ্ করব না, বিবাহ্ করলে পুনরায় বিধবা হব।" আমি তিনদিন সময় চেয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখি, হাতে বালা পরা এক মহিলা আমাকে বলছেনঃ "বিবাহ্ করবে না। আমার কাছে এস, তোমার কানে বীজমন্ত্র দিলাম।" পরের দিন সকলকেই এই কথা বলি, কিন্তু কেউ এর কোন সদুত্তর দিতে পারে না। আমি আর বিবাহ্ করিনি। একবছর এইভাবে চলার পর হঠাৎ একদিন আমার মায়ের খুল্লতাত এসে উপস্থিত। তিনি ছিলেন সাধুপুরুষ। তিনি আমার কাছে সমস্ত শুনে বাগবাজারে রামকান্ত বসু লেনে আমার দাদু ও জ্যাঠতুতো ভায়েদের কাছে সব জানান।

পরের দিন (১৩২১ সনের বৈশাখ মাস) সকাল সাড়ে আটটার সময় উদ্বোধন অফিসে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাই। গিয়ে দেখি, মা পূজায় বসেছেন। ধীরে ধীরে মায়ের পিছনে গিয়ে বসলাম। পূজাশেষে মা আমায় ডাকলেন। বললেনঃ "তুমি এসেছ!" মৃদু হেসে আবার বললেনঃ "তোমাকে দেখে ও কাছে পেয়ে আমার খুব আনন্দ। আমাকে চিনতে পারছ?"—এই কথা বলে শ্রীশ্রীমা তাঁর হাতের বালা দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্বপ্নের কথা। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

খানিক বাদে মা একথালা প্রসাদ খেতে দিলেন। ভাবছিলাম, এত প্রসাদ কি করে খাব। মা নিজেই বললেনঃ "যাবার সময় বাড়ি নিয়ে যেও।" এই বলে তিনি একটি লেডিকেনি আমার হাতে দিলেন। খাওয়া শেষ হলে মা আবার বললেনঃ "তুমি ফকির, তোমার কাছে ঠাকুর কিছুই চান না। কাল আসার সময় ঠাকুরের জন্য দু-পয়সার ফুল নিয়ে এসো।"

বাড়ি ফিরে এসে দাদুর (মাতামহ) কাছে সব বলি। পরের দিন দাদু একটি মুর্শিদাবাদের গরদ, দু-টাকার মিষ্টি ও দু-টাকা প্রণামী এবং কিছু ফুল এনে দিলেন। পরের দিন যথারীতি মায়ের পূজার শেষে গরদ ও মিষ্টি দেখে মা আমাকে বললেনঃ "এসব কেন এনেছ? তুমি ফকির। ঠাকুর তোমার কাছে কিছুই চান না।" কতক্ষণ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললামঃ "দাদুকে বলব। এবারের মতো তুমি নিয়ে নাও।" মা পূজায় বসলেন। খানিকবাদে স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রটা উচ্চারণ করে বললেনঃ "মনে আছে?" আমি বললামঃ "হ্যাঁ, স্বপ্নে পেয়েছি। কিন্তু আর কিছুই জানি না।" শ্রীশ্রীমা বললেনঃ "এটাই তোমার মন্ত্র। এটা জপ করবে। কাউকে বোলো না, সর্বদা গোপন রাখবে।" মা আমাকে জপবিধি ইত্যাদি দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেনঃ "সর্বদা ঠাকুরকে ডাকবে। ঠাকুরই সব জানবে। যদি তোমার কোন দরকার হয় আমাকে প্রশ্ন কোরো। আমি আছি, তোমার ইষ্ট আছেন এ-জগতে। তোমার আর কেউ নেই।" মা বললেনঃ "তোমার ভেতর বীজ পুঁতে দিয়েছি, গাছ হবেই। পরে আমাকে পলে পলে অনুভব করবে।" মাকে দাদুর দেওয়া দু-টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ "তোমাদের দেখলেই মনে হয় তোমরা আমার। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসবে। পরে সব অনুভব করতে পারবে।"

তাঁকে 'মা' বলে ডাকবার, তাঁর শ্রীচরণতলে বসে উপদেশামৃত লাভ করার সৌভাগ্যের অধিকারিণী আমি হয়েছিলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ। দুঃখ, স্নেহময়ী মাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারিনি। যে-কয়দিন মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় পেয়েছি—দর্শন করেছি, তাতেই মনে হয় তাঁর করুণা অনন্ত অপার। মার কাছে যাওয়ার সময় ভাবতাম অনেক

কথা জিজ্ঞেস করব। কাছে গেলে সব ভুল হয়ে যেত, কিন্তু অন্তর পরিপূর্ণ হতো—কোনই অভাব থাকত না।

মা সাধনভজনের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একদিকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী ছিলেন, অন্যদিকে পাতিব্রত্য ধর্ম তথা গার্হস্থ্য ধর্মের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। ভক্তবৎসলতা এবং সাধনের চরম অবস্থা সন্ন্যাস—উভয়েরই আদর্শ ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তিনি নিজে কত নরনারীকে কৃপাদানে কৃতার্থ করেছেন, অথচ তাঁকে দেখলে মনে হতো, তিনি সরলা, লজ্জাশীলা এক অতি সাধারণ গৃহস্থ কুলবধূ।* ❑

সংগ্রহ ঃ সুধাংশুশেখর সরকার

* উদ্বোধন, ৯৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৪, পৃঃ ৬৭৯

মাতৃস্মৃতি

জয়গোবিন্দ শর্মা

ঠিক মনে নেই, ১৯০১ কি ১৯০২ সালে ঢাকার কাছে গেণ্ডারিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র যোগবিনোদ গোস্বামী সেখানে তখন অবস্থান করছিলেন। আমি দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে আমায় দীক্ষাদান করেন। কিন্তু তদবধি মনে শান্তি পাব ভেবেছি, শান্তি পাইনি। তারও আগে ১৮৯৯ সালে যখন শ্রীহট্টের বেগমপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তখন জীবনে প্রথম সাধুসঙ্গ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য সেই সাধুর নাম মনে নেই। কিন্তু তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগ্রন্থ কিনে পাঠ করার সবিশেষ আগ্রহ হয় এবং তখনি প্রথম তাঁর ফটো সংগ্রহ করি।

১৯১৪ সালে জুন-জুলাই মাসে একদিন কলকাতার কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীর দর্শনে যাই, দর্শনের পর পুরোহিতের বিনা অনুমতিতে মাতৃমূর্তি স্পর্শ করি। এক ক্রুদ্ধ পাণ্ডা আমায় আঘাত করে এবং ঘাড়ে নখ দিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। পরদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে যাই। এই প্রথম দর্শন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা জানালে পর অনুমতি পাই। ওপরে গিয়ে দেখি, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা খাটের ওপর বসে আছেন। তাঁর অনাবৃত পদযুগল যেন দোলায়মান মনে হলো। চরণস্পর্শ না করে প্রণামপূর্বক একটি সিকি মায়ের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর ধীরে ধীরে রাখলাম। সিকিটি যেন লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আপনি নিচে মেঝেতে পড়ে গেল। আমি সসঙ্কোচে কোন কথা না বলে তাঁর চরণস্পর্শ না করে ভূমিতে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলাম।

এর পরদিন আমাদের কাশীধাম রওনা হওয়ার কথা। সঙ্গে আমার গর্ভধারিণী বিধবা জননী, স্ত্রী, পাঁচবছরের কন্যা, প্রায় ১৫ মাসের পুত্র এবং সদ্য নিরুদ্দিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতার বালিকাবধূ। ঠিক হলো, উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে রওনা হব। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী ও দ্রব্য-সহ আমরা সকলে উদ্বোধনে পৌঁছানো মাত্র আমার মা ও অন্যান্যরা ওপরে উঠে গেলেন, আমার ডাক পড়ল না। অনেকক্ষণ গত হওয়ায় ভিতরে অশান্তি বোধ করলাম। তখন আমিও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করব বলে ওপরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পাওয়া গেল। দোতলায় গিয়ে পূর্বদিনের সমস্ত অতৃপ্তি ঘুচে গেল। মায়ের অনাবৃত মুখ। স্নেহাকুল দৃষ্টি। পূর্ব-পরিচিতের মতো মধুর ব্যবহার। জিজ্ঞাসা করলামঃ "আমার ভাইয়ের কি হয়েছে বলুন।" মা বললেনঃ "বোধহয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়েছে।" তারপর দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকলে নেমে এলাম।

পরে আমার স্ত্রীর মুখে আরো অনেক কিছু শুনলাম। তারা যখন ওপরে উঠে মাকে প্রথম দর্শন করল, তখন দেখেছিল একজন বৃদ্ধার মূর্তি। আমি যখন পৌঁছালাম, তখন ঐ মূর্তিই যেন এক প্রৌঢ়া নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমি ওপরে গিয়ে মাকে বৃদ্ধামূর্তিতে দেখিনি। আমার পুত্র কিছুতেই মাকে প্রণাম করতে রাজি হচ্ছিল না। ঘাড় বাঁকিয়ে মাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তার জননী বারংবার জোর করে প্রণাম করানোর চেষ্টা করে। মা বলেনঃ "থাক মা, পায়ের ধুলো নিয়ে ওর মাথায় দাও, তাহলেই হবে।" আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি পুত্রের মাথায় দেওয়ামাত্র সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করতে থাকে, কিছুতেই থামে না। তার মা যত বলে—হয়েছে, থাক; তবু থামে না। অবশেষে শ্রীমা বললেনঃ "থাক হয়েছে।" বলামাত্র ছেলে শান্ত হলো।

তৃতীয়বার মাকে দর্শন করি জয়রামবাটীতে। ১৯১৬ সালে স্বামী সারদানন্দের অনুমতি নিয়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাই জানুয়ারি মাস নাগাদ। ভদ্রলোক যুবা, ব্রাহ্মণ। জয়রামবাটীর নিকটেই তাঁর আপন বসতবাটী। তিনি নিজে মায়ের বাড়ি

পর্যন্ত গেলেন না। আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি মুটে নিয়ে নিজেই মায়ের সমীপে হাজির হলাম। তখন আমার মন অস্থির। দীক্ষা যে নিয়েছিলাম, তা নিরর্থক মনে হচ্ছিল। মাকে সব কথা বললাম। মা কৃপা করে আমাকে পুনর্বার দীক্ষাদান করলেন। এখন আমার মন শান্ত। ছুটাছুটি করে না। সাধু অন্বেষণ করে না। এখন ভাবি, "আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।"

১৯১৮ সালে মাকে চতুর্থবার দর্শন করি। শ্রীশ্রীমা তখন অসুস্থা। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেননি। কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "তুমি আগে একবার এসেছিলে না?" আমি বলেছিলাম ঃ "হ্যাঁ মা, এসেছিলাম।" মনে হলো মায়ের মন থেকে আমি মুছে যাইনি। কারণ, বহু শিষ্যশিষ্যার মধ্যে সকলকে স্মরণ রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর আমি এমন কীর্তিমান নই যে, আমাকে মা বিশেষভাবে মনে রাখবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষার বহু বছর পর জয়রামবাটীতে গিয়েছিলাম নতুন 'মাতৃমন্দির' দেখতে। তখন স্বামী পরমেশ্বরানন্দ আমাকে তালপত্রে মুদ্রিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করতে বলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করে অন্তরে অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম।[১] * ❑

১ জয়গোবিন্দ শর্মার স্মৃতিকথাটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী, উত্তর বিরাটী-নিবাসী **অসিত চক্রবর্তীর** সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে। জয়গোবিন্দ শর্মা ১৯৫৮ সালে পরলোকগমন করেন।—**সম্পাদক**

*** উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৮, পৃঃ ৯৭৮-৯৭৯**

শ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

জ্যোতির্ময়ী বসু

আমার পনের বৎসর বয়সে ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' পড়িয়াও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলিয়া মনের মধ্যে বিশ্বাস আসে নাই। তখন তাঁহাকে 'একজন উচ্চশ্রেণীর সাধু' এইমাত্র বলিয়াই মনে হইতেছিল। একদিন রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলাম—ঠাকুর যদি তুমি সত্যই অবতার হও, তাহা হইলে আজ রাত্রে আমার গর্ভধারিণী মাকে আমি স্বপ্ন দেখিব। সত্যই সেই রাত্রে আমি আমার মাকে স্বপ্ন দেখিলাম এবং সেইসঙ্গে বেলুড় মঠের ঠাকুরঘর, ঠাকুরের শয়নঘর, বারান্দাও স্বপ্নে দেখিয়া দাদাকে (ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ) পত্রে জানাইলাম। বেলুড় মঠ দেখিব বলিয়া দাদাও খুব সন্তুষ্টচিত্তে শ্বশুরবাড়ি হইতে আমাকে আনিয়া বেলুড়ে লইয়া গেলেন। আমি যাইয়া বেলুড় মঠের ঠাকুরঘর প্রভৃতি দেখিয়া হতবাক হইয়া গেলাম। ইতিপূর্বে স্বপ্নে যেখানে যেমন যেমনটি দেখিয়াছিলাম সেসমস্ত ঠিক ঠিক সেইরূপই সেখানে রহিয়াছে তাহাই দেখিলাম।

আমার মনের কামনা ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লইব। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—মঠের ঠাকুরঘরে যেস্থানে চরণামৃতের পঞ্চপাত্র থাকে উহা হইতে ঠাকুর (রামকৃষ্ণদেব) চরণামৃত ও একটি বিল্বপত্র আমায় দিতেছেন। স্বপ্নাবস্থাতেই আমি ঠাকুরকে বলিলাম, আমার বাসনা কি পূর্ণ হইবে? (আমার বাসনা—মায়ের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্তি।) ঠাকুর বলিলেন, হইবে। উক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই। ঐসময়ে

আমার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল—যেমন করিয়াই হউক শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা লইবই। পরে আমি খুঁজিয়া লইয়া ১৩১৬ সালের ৩১ আষাঢ় বিকালে উদ্বোধন-এর বাড়িতে শ্রীমায়ের দর্শন পাই। ৩২ আষাঢ় শ্রীমা আমায় দীক্ষা দিয়া অকূলে কূল দেন। শ্রীমাকে আমার সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলাম। মা আমাকে বিশদভাবে উহা বুঝাইয়া দিলেন—মাত্র পনের বৎসরের একটি মেয়ে একটি মানুষকে অবতার বলিলে (বিশেষত তখন প্রচারও বিশেষ কিছু হয় নাই) সেইসময় অলৌকিক এমন কিছু না দেখিলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিবে কেন?

আমেরিকা হইতে একটি মহিলা উদ্বোধন-এর বাড়িতে ঐসময়ে শ্রীমায়ের নিকট আসিতেন। শ্রীমা এই আমেরিকান মহিলাটিকে 'দেবমাতা' বলিয়া ডাকিতেন। ঐ মহিলাটি প্রত্যহ সকাল ৭টা আন্দাজ শ্রীমায়ের কাছে আসিতেন। আমি মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ মহিলাটি দেখিয়াছিলেন ঠাকুর তাঁহার দুই কাঁধে পা দিয়া দাঁড়াইয়া। উহা দেখিয়াই ঐ দেবমাতা অজ্ঞান হইয়া যান। পরে স্বামীজী ঐ দেশে গেলে তাঁহার নিকট ঠাকুরের ছবি দেখিয়া ঠাকুরকে তিনি চিনিতে পারেন। দেবমাতা কয়েক বৎসর পরে ভারতে আসেন ও ৪৭ নং বোসপাড়া লেনের (বাগবাজার, কলিকাতায়) বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি প্রত্যহ মায়ের ঘরে ধ্যানে বসিতেন, আর তাঁহার দুইটি চোখে ভক্তির আবেশে জলধারা বহিত। সে এক এমনি আশ্চর্য জলধারা যে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

ঐ ভগিনী দেবমাতার সহিত শ্রীমা আমাদের সকলকে লইয়া পাশের ঘরে বসিতেন। রাধু (শ্রীমায়ের ভাইঝি) ভাত খাইয়া স্কুলে যাইবে, তাহাকে মা খাওয়াইয়া দিতেছেন। রাধুর খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজেই এঁটো পরিষ্কার করিতেছেন। আমরা সকলেই বসিয়া দেখিতেছি। আশ্চর্যের বিষয় ঐ বিদেশিনী মেয়ে তীরের মতো উঠিয়া 'মাতাদেবী, মাতাদেবী' বলিয়া মায়ের হস্ত হইতে থালা-বাটি লইয়া ঐ সকড়ির মধ্যেই

বসিয়া পড়িয়া দুই হস্ত দিয়া ঐ এঁটো পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। উহা দেখিয়া নলিনী-দিদি হাসিয়া উঠিলেন। মা নলিনী-দিদিকে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলেন। দেবমাতা কলঘরে বাসন রাখিতে গেলে মা বলিলেনঃ "ঐ মেয়েটি আমাদের ভাষা বোঝে না, তুই যে অমন করে হেসে উঠলি, তাতে ও ভাববে, না জানি কি অন্যায় কাজ করে ফেলেছি! আর সেইসব কথা মনে হলে ও কত কষ্ট পাবে!"

দেবমাতা অনেক পরে তাঁহার বাসস্থানে চলিয়া গেলে আমরাই পুনরায় গোবর-ন্যাতা ও জল দিয়া ঐ ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। তাহার পরে হাসিয়া শ্রীমাকে বলিলাম, ঐ মেয়েটির কাপড়ও যে সব সকড়ি হয়ে গেছে। মাও সেকথা শুনিয়া 'তাইতো সব সকড়ি হয়ে গেল' বলিয়া হাসিলেন।

সর্বধর্মসমন্বয় সাধন ও সেই ভাব প্রচারের জন্য ঠাকুর এযুগে মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। নশ্বর মানবদেহ ত্যাগের পরে ঠাকুর কোন কোন ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের কাহাকেও প্রত্যক্ষ, আবার কাহাকেও স্বপ্নের ভিতর দিয়া দেখা দিয়া বিশ্বাস করাইয়া শ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে আনিয়া দিয়াছেন। শ্রীমাও তাহাদের অন্তরের ধূলা ঝাড়িয়া নিজের অঞ্চলপ্রান্তে তাহাদের ঢাকিয়া লইয়াছেন। সর্বধর্মসমন্বয়কারী ও যুগধর্ম প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের মূলাধার ছিলেন স্বয়ং জগদম্বা সারদারূপে আমাদের মা। যে চরণপ্রান্তে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার সেই চরণপ্রান্তেই আমাদের মতো দুর্ভাগা ও অভাবগ্রস্তা অভাগিনীদের পরম করুণাময়ী শ্রীমা সমান স্নেহে আশ্রয় দিয়াছেন। অযোগ্য, অক্ষম, দীন ভক্তসন্তানদের প্রতি শ্রীমায়ের এই করুণা, স্নেহ, ক্ষমার সহিত আশ্রয়দানের মহিমা অবর্ণনীয় ব্যাপার। শ্রীমায়ের সেই দীনবৎসলতার কথা মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। এইসব কথা লিখিয়া বর্ণনা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। ইহা শুধু

তাঁহারাই জানেন যাঁহারা শ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে তাঁহার আশ্রিত সন্তানরূপে বসিবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। শ্রীমায়ের পরম স্নেহময়ী মূর্তি দর্শন ও তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণে যে অবর্ণনীয় আনন্দের বন্যা সমাগত ব্যক্তিদের অন্তরে বহিয়া যাইত তাহা সকলেরই প্রাণের বস্তু। তাহা প্রত্যেকের মর্মস্থলে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে আনন্দ, সে পবিত্রতাকে মুখে প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমায়ের অভয়পদে আশ্রয়লাভ এবং তাঁহার অহেতুক ও অবিশ্রান্ত করুণার কথা আমি এতকাল ধরিয়া কৃপণের ধনের মতন অন্তরে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এতকাল পরে এই প্রবীণ বয়সে সেইকথা প্রকাশ করিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। এসম্বন্ধে আমি বলিতেছি—আমার ন্যায় অতি সামান্য একজন ব্যক্তিরও শ্রীমায়ের এই পুণ্যস্মৃতির কথা পড়িয়া যদি কাহারও প্রাণে শান্তি ও আশার সঞ্চার করে তাহা হইলে এই স্মৃতিকথা প্রকাশ করা আমি সার্থক মনে করিব।

বহু বৎসর অতীত হইল নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীমা জ্যোতির্ময়ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সান্নিধ্যের সেই পুণ্যস্মৃতি ও অভয়বাণী এক্ষণে আমাদের সান্ত্বনা ও সম্বল। শ্রীমায়ের অপার ও অযাচিত করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে কবিতার আকারে আমার অন্তরের এই প্রার্থনা ভক্তিপূর্ণ প্রণামের সহিত নিবেদন করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

"রামকৃষ্ণ-লীলাময়ি জননি সারদে!
সন্তান-সন্তাপহরা অভয়ে বরদে।
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি হে আনন্দময়ি,
সতত প্রসন্ননেত্রা ক্ষেমঙ্করী অয়ি!
বহুদিন হেরি নাই তোমার মূরতি,
তাই মাগো চিত্ত মোর সকাতর অতি।

তোমার আশ্রয়ে মাতঃ জুড়ায় জীবন
শান্তিধারে করে স্নিগ্ধ তাপদগ্ধ মন।
যখনি গিয়েছি মাতঃ তব পদতলে
প্রাণের সকল ব্যথা গেছে কোথা চলে!
ব্যথিত অভাগা দীন উপেক্ষিত সবে
ডেকেছ সতত কাছে সুমধুর রবে।
সব দোষ ক্ষমা করে দিয়েছ আশ্রয়,
ঘুচায়ে অন্তরগ্লানি করেছ নির্ভয়।
কত যে করুণা তব অগাধ অপার,
কভু নাহি হেরি কোথা তুলনা তাহার।
তোমার শ্রীপাদপদ্মে দিনু পুষ্পাঞ্জলি,
ধুয়ে দাও অন্তরের মলিনতা-ধূলি।
দাও ভক্তি অনুরাগ শান্তি পবিত্রতা,
মুক্তি দাও, শান্তি দাও, হে জগৎমাতা।"* ❑

* বিশ্ববাণী, ১৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬১, পৃঃ ২০৭-২০৯

মায়ের কথা

দ্বিজবর মুখোপাধ্যায়

আমি তখন দিল্লীতে একটি ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। সেখানে আমাদের একটি ভক্তগোষ্ঠী ছিল। তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা আলোচনা হতো। মায়ের কথাও শুনেছিলাম, কিন্তু দেখিনি। মায়ের নাম জানতাম। একরাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। মাঝখানে মা বসে রয়েছেন, তাঁর একপাশে বসে আছেন মা দুর্গা, অন্যপাশে মা কালী। দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেছি বিছানায়। আমাদের গৃহদেবতা নারায়ণ, নাম—রাজরাজেশ্বর। তাঁকে স্মরণ করে, প্রণাম করে আবার শুয়েছি। ঘুমিয়ে পড়েছি, আবার স্বপ্ন দেখছি, মায়ের একপাশে মা জগদ্ধাত্রী, অন্যপাশে মা কালী। মা বললেনঃ "আমি সারদা।" এবার আর ভয় হলো না, কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেল। আর ঘুম হলো না। মাকে দর্শন করার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভাবছি কিভাবে কোথায় মায়ের দর্শন পাব। তখন রাস্তাঘাট বেশিরভাগ হাঁটাপথ ছিল। পুজোর ছুটিতে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সঙ্গে উদ্বোধনে দেখা করলাম। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "মা কোথায় আছেন?" মহারাজ বললেনঃ "জয়রামবাটীতে।" জয়রামবাটী গেলাম বর্ধমান হয়ে। বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর হেঁটে আরামবাগ হয়ে জয়রামবাটী। সেখানে পৌঁছে শুনলাম মা রাধু-দিকে নিয়ে কোয়ালপাড়ায় রয়েছেন। সেরাত্রি জয়রামবাটীতে থাকলাম। পরদিন একজন মহারাজ সঙ্গে একটি লোক দিলেন, সে কিছুদূর গিয়ে আমাকে কোয়ালপাড়ার রাস্তা দেখিয়ে দেবে। লোকটি কিছু পথ এসে কোয়ালপাড়ার রাস্তা দেখিয়ে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে দেখি একটা পুকুরে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে আছে। দেখে খুব

ইচ্ছে হলো, মায়ের চরণপূজার জন্য কিছু পদ্মফুল তুলে নিয়ে যাই। তুলতে গিয়ে জামাকাপড় সব ভিজে গেল। ভিজে কাপড়ে উঠে আবার হাঁটা শুরু করলাম। যখন কোয়ালপাড়া পৌঁছালাম তখন ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেছে। আশ্রমে গিয়ে শুনলাম, মা তখন পূজার ঘরে। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ আমাকে দেখে বললেনঃ "আপনি কি দিল্লী থেকে আসছেন? মাকে দর্শন করতে? দীক্ষা নিতে?" আমি অবাক হয়ে বললামঃ "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে তা জানলেন?" তিনি বললেনঃ "মা বলেছেন। আপনার হাতে যে পদ্মফুল থাকবে তাও মা বলে দিয়েছেন।" শুনে আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। ব্রহ্মচারী বললেনঃ "মা বলেছেন, পুজো শেষ হলে আজই আপনাকে তিনি দীক্ষা দেবেন।" আমি তখন স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ পর ব্রহ্মচারী বললেনঃ "মা আপনাকে ডাকছেন।" পূজার ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার পরে মাকে দেখেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখছি মা আমার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বলছেনঃ "ওঠ বাবা, এই তো আমি! আহা বাছা, কত দূর থেকে কত কষ্ট করে হেঁটে এসেছে!" আমি উঠে বসলাম। আমার চোখ তখন জলে ঝাপসা। সামনে মা বসে রয়েছেন—স্বপ্নে-দেখা সেই মূর্তি! মা সস্নেহে মৃদু হেসে বললেনঃ "কি বাবা, মিলছে, স্বপ্নে যা দেখেছিলে? এবার তোমাকে আমি দীক্ষা দেব।" আসন পাতা ছিল, সেটি দেখিয়ে বললেনঃ "এখানে বস।" দীক্ষা হয়ে গেল। মা বললেনঃ "তুমি যে পদ্মফুল এনেছিলে, সেগুলি কোথায়?" আমি বললামঃ "ব্রহ্মচারী মহারাজকে দিয়েছি।" মা ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন পদ্মফুলগুলি নিয়ে আসতে। ব্রহ্মচারী আনলে মা ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেনঃ "ওঁর পায়ে অঞ্জলি দাও। উনিই তোমার ইষ্ট, উনিই তোমার গুরু।" আমি পদ্মফুলগুলি নিয়ে মায়ের পায়ে দেব ভাবছিলাম। অন্তর্যামিণী মা আমার মনের কথা জেনে তক্ষুণি বলে উঠলেনঃ "আগে ঠাকুরের পায়ে দাও, পরে আমার পায়ে দেবে।" মা যেমন বললেন তেমনিভাবে সব করলাম। যেন যন্ত্রের মতো সব করছিলাম। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে উঠতে মা বললেনঃ

"যেমন দেখিয়ে দিয়েছি, সেভাবে কিছুক্ষণ এখন জপ-ধ্যান কর।" কিছুক্ষণ পর আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মা তাঁর কাছে বলতে বললেন। শুনে (নিজেকে দেখিয়ে) মা বললেনঃ "এই দেহ থাকতে কারো কাছে এসব কথা বলবে না।"

মায়ের কথা এত মিষ্টি যে, এখনো সেই মধুর স্বর কানে লেগে রয়েছে।

পরে যখন আবার মাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম, সঙ্গে আমার স্ত্রী (প্রভাবতী) ছিলেন। জয়রামবাটীতে মাকে আমার স্ত্রীর দীক্ষার কথা বলতে মা বলেছিলেনঃ "বাবা, ওকে আমি দীক্ষা দেব না। ওর গুরু শরৎ। কলকাতায় গিয়ে শরৎকে বোলো। শরৎ মহারাজকে কলকাতায় গিয়ে বলেছিলাম। মহারাজ শুনে চুপ করে ছিলেন। পরে অবশ্য শরৎ মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।* ❑

* লেখকের স্বহস্তলিখিত এই স্মৃতিকথাটি আমরা পেয়েছি ঘাটাল নিবাসী মায়া ভট্টাচার্যের সৌজন্যে। লেখক পরবর্তী কালে বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং মুক্তারহাট চিন্তামণি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩২ ইস্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ ইস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামজীবনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম প্রধান সেবক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (রামময় মহারাজ) বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র ছিলেন।—সম্পাদক

মায়ের কথা

নিবারণী দাসী

নিবারণী দাসী জয়রামবাটী-নিবাসী সদ্গোপ বংশের এক নিঃসন্তান বিধবা। তিনি মায়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। ১৯৭০ সালে প্রায় ৯২ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। মায়ের সেবা করেছেন বলে তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি মায়ের ভোগের বাসন মেজেছেন। সাধুদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি প্রাণের আকুতিতেই মায়ের সেবা হিসাবে ঐ কাজ করতেন। ১৯৬৫ সালে আদ্রা থানার (পুরুলিয়া) ও. সি. দেবদাস মুখোপাধ্যায় জয়রামবাটীতে তাঁর কাছে মায়ের কথা শোনেন এবং সেই মাতৃস্মৃতি তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন। ১৯৯২ সালে প্রয়াত দেবদাস মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে স্মৃতিকথাটি সংগৃহীত হয়েছে।

স্বামী ঈশানানন্দ-কৃত 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে 'নিবু-ঝি'-র উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রঃ পৃঃ ৪৯)। 'নিবু-ঝি'-ই নিবারণী দাসী।

মায়ের কথা বলার কি ক্ষমতা আছে আমার? তখন কি আমরা কিছু বুঝতাম? আমরা প্রথমে বলতাম 'বামুনদিদি'। আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তখন আমার বয়স বেশি নয়; চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে। আমার স্বামী বাড়ুইয়ের কাজ করত। ঘর ছাইতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে শয্যাশায়ী ছিল বহুদিন। দিন চলে না। সে একদিন বলল ঃ "বামুনদিদিকে গিয়ে একটু বল না, যদি কিছু দেন বা কিছু একটা সুরাহা করেন।" তখন তো এখনকার মতো অবস্থা নয়, জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে দু-চারজন সাধু-ব্রহ্মচারী থাকত। আমি তো মায়ের কাছে এসে কান্নাকাটি করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "বাছা, বিপদ তো সংসারী লোকেদের জন্যই; মুষড়ে পড়লে হবে? তোমার স্বামী এখন অসুস্থ—তুমি এদিক-ওদিক কাজ করে তাকে সারিয়ে তোলো। সে সুস্থ হলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি তাঁকে বললুমঃ "বামুনদিদি, তুমি আশীর্বাদ করে দাও; ও যেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।"

মা বললেনঃ "ওগো, আমার আশীর্বাদে কি হবে? ঠাকুরই সব। ঠাকুরকে ভাল করে জানাও, তাহলেই সব হবে।"

মা আমাকে গুড়-মুড়ি দিয়ে বললেনঃ "বৌ, এগুলো নিয়ে যা, ওকে দিবি—তুইও খাবি।" আর একটা কাপড় দিয়ে বললেনঃ "এই কাপড়টা নে। ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরতে নেই।"

তারপর থেকে আমি মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসতাম। মা তখন তাঁর মা-ভাইদের সঙ্গেই থাকতেন। একসময় তাঁদের বাড়িতে যে-মেয়েটি কাজ করত সে চলে গেলে মা বললেনঃ "নিবু, শশী চলে গেছে। তুই কাজ করবি?" আমি মায়ের কথামতো থেকে গেলাম তাঁদের কাছে।

মায়ের সঙ্গে কত কাজ করেছি, তবু পোড়া কপাল, তাঁকে এতটুকু বুঝতে পারিনি। আমরা মাকে 'বামুনদিদি' বলেই চিনেছিলুম। তিনি ধরা দেননি এতটুকু। আমাদের মতোই গোয়ালশালায় গোবর পরিষ্কার করতেন, ঢেঁকিশালে ঢেঁকিতে পাত দিতেন, ঘরে ন্যাতা দিতেন, কখনো গোরুকে জাব (খড়) দিয়ে আসতেন। আবার নিজেই রান্নাবান্না করে ভক্তদের বসিয়ে খাওয়াতেন। প্রথম প্রথম তাঁকে 'বামুনদিদি' বলতাম। পরে যখন তাঁর ভক্ত-শিষ্যরা তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন, তখন আমিও তাঁকে 'মা' ডাকতে শুরু করি।

পরে মায়ের সংসার বড় হতে লাগল। মায়ের তখন আর ভাইদের বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন মায়ের 'নতুন বাড়ি' হলো। আমিও তখন মায়ের কাছেই থেকে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কত কাজ করেছি। তাঁর সঙ্গে আনাজ কুটেছি, তেঁতুল কেটে বীজ ছাড়িয়েছি। মা বুড়ো বয়সেও অনেক কাজ করতেন। কখনো চুপ করে বসে থাকতেন না। তিনি কাউকে কোন কাজ করতে দুবার বলতেন না। একবার বলায় কেউ কাজ না করলে তিনি নিজে উঠে গিয়ে সেটা সেরে আসতেন। তখন একেবারেই বুঝতে পারিনি যে, মা আমাদের সত্যিকারের দেবী। পিছনের দিনগুলো ভেবে কী আপশোস যে হয় এখন!

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। মায়ের ভাইদের গোরু ছিল। বাগান ছিল। তাহলে কি হবে, মাকেই সব দেখতে হতো। মায়ের ভাইয়েরা অত করিৎকর্মা ছিল না। কেবল ঝগড়া করত নিজেদের মধ্যে। তবে তারা মাকে খুব ভয় করত। একবার একটা মাটির চাঙড় পড়ে গোরুর পাতনা (ডাবা) ফেটে গিয়েছিল। রাখাল এসে জানালঃ "পাতনা ফেটে গেছে— জল থাকবে না, তাড়াতাড়ি কিনে আনতে বলো। নইলে ঐ পাতনায় জল ঢালা যাবে না।" তখন বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ ছিল না। মা আমাকে বললেনঃ "নিবু, পাতনাটা নামিয়ে নিয়ে আয়, আমিই সেরে দিচ্ছি।"

আমি বললামঃ "ওসব কি মেয়েমানুষের কাজ?"

আমার কথা শুনে মা বললেনঃ "তোকে যা বলছি তা কর; পাতনাটা নামিয়ে রেখে পুকুর থেকে একটু কাদা নিয়ে আয়।" আর কোন কথা না বলে আমি পুকুর থেকে কাদা এনে দিলুম।

দেখলাম, পাতনাটা আড়াআড়ি ভেঙে গেছে। কিছুতেই ঠিক করা যাবে না। আমি বললামঃ "ও পাতনা ফেলে দিতে হবে। কাদায় কি থাকে?" মা আমার কথায় কান দিলেন না। বললেনঃ "আরেকটু কাদা আন তো দেখি।" আমি আবার ঘাট থেকে কাদা আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, গোটা পাতনাটা সারানো হয়ে গেছে।

আমি কাদা এনে বললামঃ "এ কি গো! তুমি তো ঠিক করেই ফেললে! তা এর মধ্যেই হয়ে গেল? কি করে সারালে?"

মা হেসে শুধু বললেনঃ "তুই যে বলেছিলি ও হবেনি। এবার দেখ!" আমি তো দেখে অবাক।

কত ভক্ত-শিষ্য যে আসত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, তার ইয়ত্তা নেই। কোন কোন দিন বলতেনঃ "নিবু, পা-টা ধুয়ে দে তো, কেমন যেন জ্বালা করছে। যতসব পাপ করবে আর এখানে এসে ঢেলে দেবে। মরে গেলাম রে, মরে গেলাম।" তখন মায়ের পায়ের বাতটাও বেড়েছিল। বাতের ব্যথায় উপকারী বলে গাঁয়ের বাইরে থেকে আকন্দপাতা এনে উনুনের ঝিকের পাশে রেখে সেগুলো গরম করতাম। তারপর সেই

পাতাগুলো হাঁটুর ওপর চাপিয়ে দিতাম। তাতে তাঁর বাতের ব্যথা কিছুটা কমত।

এখন ভাবি, চিনতে যদিও পারিনি, তবে তাঁর সেবা করতে তো পেরেছি। তিনিই সেবা করিয়ে নিয়েছেন। তাঁর চরণ স্মরণ করেই বসে আছি, কবে তিনি ডেকে নেবেন। আর তার জন্যই এই মরণকালেও হাঁপাতে হাঁপাতে একবার তাঁকে দেখতে আসি আর তাঁর ভোগের বাসনটা মেজে দিতে আসি। আগের মহারাজরা তো আমায় দেখেছেন বহু বছর ধরে। এখনকার মহারাজরাও আমাকে খুব ভালবাসেন, আমাকে আসতে মানা করেন। বলেনঃ "বুড়ি মা, হোঁচট খেয়ে কোথায় পড়ে যাবে! আর কিছু করতে হবে না।" কিন্তু মন যে মানে না। ভাবি, চোখ থাকতে মাকে চিনতে পারিনি, প্রাণ থাকতে তাঁর এইটুকু সেবা করে জীবন সার্থক করি। তাঁকে ছুঁয়েছি! অনেক সময় ঝাঁজ দেখিয়ে বলেছি—"আর হবেনি। এই তো করে দিলুম।" আজ সেসব ভেবে কী কষ্ট হয় তা কি করে বোঝাব! * ❑

সংগ্রহ ঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* উদ্বোধন, ১০২তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৭, পৃঃ ৮৩৯-৮৪০

মায়ের স্পর্শধন্যা আমি

নীলিমা বসু

বাগবাজারের উদ্বোধন বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শ্রীশ্রীমা পূজায় বসেছেন। এক শিশুকন্যা ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। অবাক বিস্ময়ে সে দেখছে—ঘরের ঠাকুর, ফুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য—সুসজ্জিত পূজা-উপচার। তার সেই নিঃশব্দ প্রবেশ আর বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মায়ের পূজায় ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে সেবিকাদ্বয় তাড়াতাড়ি শিশুটিকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন দেখে মা বললেনঃ "ওকে নিয়ে যেও না, আমার কাছে আনো।" মায়ের কথায় একজন সেবিকা শিশুটিকে তুলে নিয়ে তাঁর হাঁটুর ওপরে আলতো ভাবে ধরলেন। মা তাঁর নিজের দুই পদ্মহস্ত দিয়ে শিশুর হাত দুখানি জড়ো করে বললেনঃ "পুজো করবে? পুজো করবে? বলো, 'নমো, নমো'।" ইতিমধ্যে শিশুর গর্ভধারিণী শচীবালা দেবী যিনি রাঁচী থেকে বাগবাজারে এসেছেন মায়ের শ্রীচরণ দর্শনের আশায়, শঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছেন নিজের চঞ্চল কন্যাটিকে দেখতে—না জানি ঠাকুরঘরে ঢুকে মাকে কিভাবে বিব্রত করছে সে! ঘরে প্রবেশ করে মেয়েকে সরিয়ে নিতে গিয়ে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। এ কী আশ্চর্য স্বর্গীয় দৃশ্য!

শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শধন্যা সেই বালিকা আমি। আমার বাবা মায়ের প্রিয় সন্তান 'বীরভক্ত' (মহারাজদের দেওয়া নাম) 'রাঁচী'র সুরেন (সুরেন্দ্রকান্ত) সরকার। ❏

মায়ের কথা

পঞ্চানন দাস

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য সাতবেড়িয়ার (সাতবেড়ে) লালমোহন দাস ওরফে লালু জেলের পুত্র পঞ্চানন দাসের (জন্ম : ১৯০৪ সাল) সঙ্গে ৩০.১২.১৯৯৮ অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতি এই স্মৃতিকথাটি। জয়রামবাটী থেকে সাতবেড়িয়ার দূরত্ব ৪ কিলোমিটার।—**সম্পাদক**

আমার বয়স তখন খুব অল্প। অল্প হলেও একেবারে ছোট নই—বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। বাবা-মায়ের সঙ্গে যেতাম জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ি। আমার বাবা লালমোহন দাস—মায়ের জীবনীতে [স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত] 'লালু' বলে লেখা আছে।[১] বাবা জেলের ছেলে। মাছধরা আর চাষবাসই আমাদের জাতব্যবসা। তবে বাবার আরেকটা বড় গুণ ছিল, ত' হলো বাউল গান করা। সেটা মায়ের আশীর্বাদেই বোধহয় অত ভালমতো হয়েছিল। বাবা তো লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু খুব সুন্দর বাউল গান করতেন। গান বাঁধতেও পারতেন। বাবার ওপর মায়ের অসীম কৃপা ছিল। আমরাও ভাগ্যবান। মাকে দেখেছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দু-একজন শিষ্যকেও দেখেছি। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) যখন এখানে এসেছিলেন দেখেছিলাম। মাস্টারমশাইকেও দেখেছি।

মায়ের বাড়ি (জয়রামবাটী) জগদ্ধাত্রীপূজায় আমাদের খুব আনন্দ হতো। আমাদের বাড়ির সব লোকের নিমন্ত্রণ থাকত। বাবা, মা, আমি—আমরা সবাই পূজার কদিন মায়ের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। বাবা মহারাজদের হুকুমমতো জিনিস আনা, চাঁদোয়া খাটানো, বাঁশ পোঁতা, ঘর মেরামত করা—সব কাজ করত। পূজার সময় অনেক বাসন জমত,

---

১ দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০১, পৃঃ ২২১

প্রচুর ভক্তও আসত আর তারা প্রসাদ নিত। আমার মা ও অন্য আরও সব মেয়েরা বাসন মাজার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঘর-দোয়ার নিকানো, উঠান ঝাঁট দেওয়া—এইসব কাজে মা থাকতেন। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো ছোটখাটো ফাই-ফরমাস খাটতাম। মায়ের বাড়ি খাবার দিয়ে আসা, খড় এনে দেওয়া, কাঠ বয়ে দেওয়া—এমন ছোটখাটো কাজ ছিল আমার। মা তখন মহারাজদের বলতেনঃ "বাবা, লালুর ঐ ছোট ছেলেটাকেও তোমরা কাজে লাগালে!" তারপর বলতেনঃ "ভাল, ঠাকুরের কাজে থাক। ঠাকুরই সুস্থ রাখবেন, দীর্ঘজীবী করবেন।" খুব সামান্য ঘটনা হলেও মায়ের সেই আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ৯৬ বছর (জুলাই ২০০০) বয়সে এখনো আমি শয্যাশায়ী হইনি।

মা যে আমাদের সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী তা তখন না বুঝলেও এখন অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারি। আমাদের তো মানবচক্ষু, সে-দেবতাকে চিনব কেমন করে? তখন মাকে দেখে ভাবতাম, মাকে বাবা 'পিসিমা' বলেন কেন? একবার বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিলামঃ "আচ্ছা বাবা, আমরা তো বাগদি-জেলে, আর মা তো বামুনদের। তোমার পিসিমা হলেন কি করে?" বাবা বলতেনঃ "ওরে, উনি শুধু আমার পিসিমা নন, জগতের পিসিমা, জগতের দিদিমা, জগতের মা। উনি যে সাক্ষাৎ দেবী! ওঁর আবার জাত-বিচার! দেখিসনি, কোন বামুনঘরের বিধবারা কি এই ডোম-বাগদিদের ঢুকতে দেয় তাদের ঘরে? পিসিমার ঘরে তো আমরা হামেশাই যাই। মাছ দিয়ে আসি, গাই (গোরু) দুয়ে দিয়ে আসি। হাট থেকে আনাজপত্র এনে দিই। পিসিমার মুখে কখনো কি দুই-দুই দেখেছিস? মানুষশরীরে ওসব থাকে, দেবশরীরে ওসব থাকে না।"

বাবা অনেকবার মাকে বিশেষ রূপে দেখেছেন। আমি তখন ছোট ছেলে। মায়ের সঙ্গে তেমন কথা কি কইব; সত্যি কথা বলতে কি, তখন বাবার সঙ্গে যেতাম খাবার লোভে। আমি গেলেই মা আমার হাতে হয় নারকেল নাড়ু, নাহলে মুড়কির নাড়ু, নয়তো ছোলা পাটালি—এরকম টুকিটাকি কিছু না কিছু দিতেনই। তারই লোভে যেতাম। আর মায়ের বাড়ির বিড়াল সম্পর্কেও একটা দুর্বলতা ছিল। সেই বিড়ালগুলো নিয়ে

খেলা করতাম। হলদির শান্তিও (শান্তিরাম দাস)[২] ছিল আমার বয়সী, সেও আসত মায়ের বাড়িতে। তার বাবা মায়ের পালকি-বেহারা ছিল। সেই সুবাদে তারাও মায়ের বাড়ি যেত।

মাকে আমার বহুবার দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। বাবা মায়ের বিষয়ে কখনো কখনো কোন কিছু বললেও আমাদের কাছে তার গুরুত্ব ছিল না সেদিন। তবে দুটো ঘটনার কথা বারবার মনে আসে।

প্রথমটা হলো—মায়ের প্রসাদ খাওয়া। একদিন মায়ের বাড়ি গেছি, সেদিন কোন উৎসবের দিন নয়, কিন্তু বহু লোক হাজির হয়েছে। গরমকাল। এমন সময় দেখি, একজন ভক্ত হাজির হলেন মায়ের বাড়িতে। তাঁর হাতে একথোকা লিচু। আমাদের এদিকে লিচু হয় না। আমার খুব লিচু খেতে ইচ্ছা হলো। লজ্জায় কাউকে কিছু না বলে মনে মনে মাকেই জানালাম: "মা, যদি মনের কথা বুঝতে পার তবে আমাকে প্রসাদে লিচু দিও।" তারপর আর সে-কথা মনে নেই। পূজা শেষ হলো। প্রসাদ বিতরণ হলো, প্রসাদ পাওয়া হলো। আমার কাজও নেই, অবসরও নেই। লোকেদের সঙ্গে বসে প্রসাদ নিয়েছিলাম মনে আছে। তারপর বিকালে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছি। বাবা তাঁর 'পিসিমা'-র সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পিসিমা ঘর থেকে বললেন: "লালু, তোর ছেলেকে একবার ডাক তো, ওর জন্য একটু প্রসাদ রেখেছি।" কী আশ্চর্য! আমার হাতে মা প্রসাদী ফল দিলেন—পাঁচটা লিচু! হাতে প্রসাদ পেতেই আমার সকালের কথা মনে পড়ল। একথা আমি বাড়ি ফিরে আমার বাবা-মাকে বলেছিলাম। আমার মনের কথা মা শুনতে পেয়েছিলেন।

আরেকটা কথা মনে পড়ে। আমার গর্ভধারিণী মায়ের মুখে শুনেছি। আমার একবার টাইফয়েড হয়। বাবা বহুদিন বাড়িতে ছিলেন না, দূর গ্রামে বাউল গাইতে গিয়েছিলেন। খুব জ্বর, প্রায় মাসখানেক ধরে ভুগছি। বাঁচার আশা সবাই ছেড়েই দিয়েছে। তখন ভাল ডাক্তার তেমন ছিল না, যা হয় কবিরাজী ওষুধ। একদিন আমি জ্বরের ঘোরে দেখছি, আমার মায়ের মতো

২ শান্তিরাম দাসের মাতৃস্মৃতি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'-র ৩য় খণ্ডের (২য় প্রকাশ) ৬৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

একজন মেয়েলোক ঘরে ঢুকে আমাকে বলছেঃ "পঞ্চু, হাঁ কর তো।" আমি হাঁ করলাম। আমায় কি যেন খাইয়ে দিয়ে গেল। তার পরেই গা-টা জ্বলে উঠল। আমি 'মা মা' বলে চিৎকার করে উঠলাম। তখন আমার মা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি হয়েছে?" আমি বললামঃ "তুমি কি খাওয়ালে? গা-টা জ্বলে যাচ্ছে।" মা বললেনঃ "কই, আমি তো কিছু খাওয়াইনি!" আমি বললামঃ "এইমাত্র তো খাইয়ে বেরিয়ে গেলে।" মা ভাবলেন, আমি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছি। একটু পরে অবশ্য জ্বালাটা কমে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখছি, মায়ের মতো দেখতে সেই মেয়েলোকটি ঘরে এসে ঢুকল। আমায় জিজ্ঞাসা করলঃ "বাছা, খুব কষ্ট হলো? কিন্তু বাবা, ওটা না খাওয়ালে যে তুই সারবি নে।" দেখি, সে-মেয়ে তো আমার গর্ভধারিণী নন, বাবার 'পিসিমা'—আমাদের মা! আমি বিহ্বল হয়ে আবার ডাকতে লাগলাম 'মা, মা'!

ঘুম ভেঙে গেল। আমার গর্ভধারিণী মা ছুটে এলেন। রেগে গিয়ে বলতে লাগলেনঃ "কি এত ভুল বকছিস?" বাবা তখন এসে গেছেন বাইরে থেকে। বাবাও ছুটে এলেন। আমি বিছানায় উঠে বসে বললামঃ "বাবা, তোমার পিসিমা আমাকে কি খাইয়ে দিয়ে গেল, তাতে প্রথমটা একটু গা-টা জ্বলে উঠল, পরে দেখি মাথাটা হালকা হালকা।" বাবা বললেনঃ "বলিস কি! যাক, আর ভয় নেই, এবার সেরে যাবি।" মা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন।

বাস্তবিক তারপরেই জ্বর ছেড়ে গেল। সেই বড় রোগ, আর কোন বড় রোগে পড়িনি। মা যে মহাপ্রসাদ খাইয়েছিলেন! মা বড় দয়াময়ী। তাঁর কৃপার কথা কী বলব! মা কলকাতায় দেহ রাখলেন। এ-সংবাদ জয়রামবাটীতে যখন এল, তখন পাড়ায় পাড়ায় কী কান্না! সাতবেড়ে, হলদি, জিবটে, শিহড়, কোয়ালপাড়া—সব জায়গায় ছোট-বড় সব জাতের মানুষই কেঁদেছিল মায়ের শোকে। বাবা তিনদিন ভাত না খেয়ে মায়ের ঘরেই পড়েছিলেন। এখন পথ চেয়ে আছি, মা কবে ডাক দিয়ে নিয়ে যাবেন পরপারে।* ❑

* উদ্বোধন, ১০২তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃঃ ৩৯০-৩৯১

মাতৃসাহচর্য

পাঁচুদাসী মুখোপাধ্যায়

আমার পিতৃকুল ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব। আমার বাবা ছিলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। সিমলাতে তাঁরই অফিসে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ গৃহী পার্ষদ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ চাকরি করতেন। একদিন বাবা পূর্ণবাবুকে রহস্যের ছলে বলেনঃ "আপনাদের ঠাকুর তো চলে গেছেন, এখন কি করবেন?" পূর্ণবাবু তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তিনি গেছেন কোথায়!" বাবার কাছে এই কথাটি কতবার শুনেছি। কিন্তু বাবা যখন বলতেন তখন তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাত। কারণ, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, বা বলা যায়, তিনি দেখা করতে যাননি।

আমার স্বামী হরিদাস মুখোপাধ্যায়। আমরা তখন বৌবাজার অঞ্চলে থাকি। আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক মুখার্জি পরিবার। সেই পরিবারের এক যুবক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের[১] আমার স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেসময় আমার এবং স্বামীর খুব দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বেলুড় মঠের খুব যোগাযোগ ছিল বলে জানতাম। স্বামী একদিন সুরেন্দ্রনাথকে আমাদের

---

১) স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হয় স্বামী নির্বেদানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম-এর (বর্তমানে বেলঘরিয়ায় স্থানান্তরিত) স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা। যেহেতু ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সঙ্ঘে যোগদান করেন, লেখিকা ও তাঁর স্বামীকে নিয়ে তাঁর বলরাম মন্দিরে আসার ঘটনা ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আগের ঘটনা —সম্পাদক

দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। শুনে সুরেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, আমাদের তা নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না। সুরেন্দ্রনাথ একদিন আমাদের দুজনকে বলরাম মন্দিরে নিয়ে গেলেন। বলরাম মন্দিরে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অবস্থান করছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে উঠলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে আমাদের দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছার কথা জানালেন। সদানন্দময় মহাপুরুষ সস্নেহে বললেনঃ "দীক্ষা নেবে? সে তো খুব ভাল কথা! উদ্বোধনে মা রয়েছেন। মায়ের কাছে যাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর।" আমি মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর সব সঙ্কোচ কাটিয়ে সাহস করে তাঁকে বললামঃ "তাহলে সব ব্যবস্থা আপনাকেই করে দিতে হবে মহারাজ।" আমার সেই আবেদনে মহারাজ কি দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু অন্তর্যামী মহাপুরুষ নির্মল আনন্দে হেসে উঠলেন। এত পবিত্র আনন্দময় হাসি আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সেই হাসিতে সমস্ত ঘরটি যেন অমৃতময় হয়ে উঠল। আমার মনে হলো, হাসি তো নয়, এ যেন আনন্দের ঝর্ণাধারা। তিনি বললেনঃ "তোমাদের কোন চিন্তা নেই। মায়ের কাছে গিয়ে আমার কথা বোলো। আমিও মাকে প্রণাম করতে গিয়ে বলে দেব।" উদ্বোধনে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে এবং মহারাজের কথা বলতে মা কৃপা করে সম্মতি দিলেন। একদিন শ্রীশ্রীমা আমাদের দীক্ষাদান করলেন। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য সৌভাগ্যে ধন্য হলাম আমরা। দীক্ষার পর প্রসাদ পেয়ে মাকে প্রণাম করে সর্বাঙ্গে যেন জগজ্জননীর পদধূলির পুণ্য রেণু মেখে বাড়িতে ফিরে এলাম আমরা। তারপর থেকে উদ্বোধনে আমরা দুজনেই যাতায়াত শুরু করলাম এবং মায়ের স্নেহ-সান্নিধ্যের অমৃতসুধায় সিঞ্চিত হতে লাগলাম। মাকে প্রণাম করে স্বামী নিচের ঘরে স্বামী সারদানন্দের কাছে বসে থাকতেন। তিনি ধর্মতলার একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর ছিল বিশেষ

আগ্রহ। স্বামী সারদানন্দ গম্ভীরাত্মা মহাপুরুষ, কিন্তু তিনি সঙ্গীত নিয়ে গভীর আলোচনা করতেন আমার স্বামীর সঙ্গে। গান্ধার এবং খাম্বাজ নিয়ে দুজনের আলোচনা চলত। কখনো বা আলোচনা হতো একতাল এবং চৌতালের মাত্রাগত সাদৃশ্য এবং চালের ফারাক নিয়ে। মহারাজ যেন মুহূর্তে এক তরুণের সমবয়স্ক হয়ে যেতেন এবং তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতেন। আবার তার ফাঁকে ফাঁকেই চলত ঠাকুর-স্বামীজীর কথা। এদিকে ওপরে আমি থাকতাম মায়ের কাছে। মায়ের খুঁটিনাটি সেবার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যেতাম আমি।

একবার মায়ের জন্মতিথির দিন কিছু টাটকা কলমি শাক আর একটি নরুণপাড় ধুতি নিয়ে উদ্বোধনের উদ্দেশে ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হলাম আমরা। ছেলেদের সঙ্গে স্বামী মাকে প্রণাম করে নিচে চলে গেলেন। আমি প্রণাম করার সময় কলমি শাকের পুঁটলি এবং ধুতিটি মায়ের পায়ের কাছে রাখলাম। মনে বড় ইচ্ছা, মা যদি আজ ধুতিটি পরেন। মা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "পুঁটলিতে কি এনেছ?" আমি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললামঃ "একটু কলমী শাক।" শুনে মা আহ্লাদে আটখানা। অন্তর্যামিণী বললেনঃ "তোমার কাপড়টি আজ পরব।" শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না। মায়ের কত সন্তান, কত ভক্ত তাঁর জন্মতিথিতে কত মূল্যবান কাপড়ই না এনেছিলেন। কিন্তু মা দয়া করে গরিব শিক্ষকের স্ত্রীর দেওয়া সেই সাধারণ কাপড়টি সেদিন পরেছিলেন। সেদিন প্রসাদ পাওয়ার সময় দেখলাম মা খুব আনন্দ করে আমাদের আনা কলমি শাক খাচ্ছেন।

কত কথা মনে পড়ছে এবং কত ঘটনা। আবার স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রে ঝাপসাও হয়ে এসেছে। মায়ের দেহ চিতাগ্নিতে দেওয়ার আগে বেলুড় মঠে শায়িত ছিল ভক্তদের প্রণামের জন্য। আমার এবং আমার স্বামীর কাছে তখন জগৎ অন্ধকার। স্বামীকে বললামঃ "মা চলে গেলেন, তাঁর কোন চিহ্নই তো আমাদের কাছে থাকল না।" স্বামী তখন গঙ্গা থেকে

একটু মাটি এনে মায়ের চরণে ছুঁইয়ে আমার হাতে দিলেন। মায়ের পদস্পর্শপূত সেই মহার্ঘ মৃত্তিকা আমাদের বাড়িতে একটি কৌটায় আজও সংরক্ষিত রয়েছে।* ❑

* বর্তমান স্মৃতিকথাটি লেখিকার কনিষ্ঠ পুত্র **গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের** (বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪) সৌজন্যে পাওয়া গেছে। লেখিকার জন্ম ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ৮২ বছর বয়সে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জানিয়েছেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লেখিকা বলেছিলেন ঃ "ওরে, সাতু এসেছে, মা এসেছেন। তোরা দেখতে পাচ্ছিস না? আমাকে নিতে এসেছেন। আমি চললাম।"—এই বলেই তিনি অন্তিম নিদ্রায় চলে গেলেন। 'সাতু' অর্থাৎ সাতু মহারাজ—স্বামী বীতশোকানন্দ—লেখিকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর কামারপুকুরে তিনি দেহত্যাগ করেন।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ

প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৯১১ সাল থেকে পড়াশোনার জন্য পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) নোয়াখালি জেলার চণ্ডীপুর গ্রাম থেকে শহরে এসে থাকতে হতো। সেই সময় আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন ভোরবেলা বাড়ির কাছে রাস্তা দিয়ে ভক্তিসঙ্গীত গাইতে গাইতে একটি মিছিল যাচ্ছিল। ভক্তিগীতি, স্তবস্তোত্রের প্রতি আমার চিরদিনই আগ্রহ। সেই মিছিল দেখে এবং গান শুনে আকৃষ্ট হলাম। গানটি ছিল—'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন'। সেই মিছিলের লোকদের সঙ্গে কখন যে হাঁটতে শুরু করেছি জানি না। চলতে চলতে সেই মিছিল শেষ হলো নোয়াখালি টাউনের পূর্বাঞ্চলে 'কালীতারা' নামক স্থানে এক বাগানবাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বড় ছবিতে প্রচুর ফুলের মালা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।

সারাদিন সেই বাগানবাড়িতেই বসে রইলাম। গান, ভজন, পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি শুনলাম ও তারপর প্রসাদ পেলাম। ঐ প্রথম আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি দর্শন করি। সেদিন থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মায়।

একবার ছুটিতে গ্রামে এসে দেখলাম যদু মজুমদার (স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য) ও আরো একজন শিক্ষক সেখানে একটি আশ্রম করেছেন। সেই আশ্রমে বিকেলবেলা স্কুল-পড়ুয়া অনেক ছেলেই আসত। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার পুরনো বন্ধু। সেখানে ভজনাদি হতো এবং আমিও যোগ দিতাম। আশ্রমের অবস্থা খুবই অসচ্ছল এবং সেখানকার

লাইব্রেরির অবস্থাও খুবই খারাপ ছিল। দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে ঐ আশ্রমের উন্নতির জন্য অর্থসংকুলান করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং আমরা যারা অল্পবয়সী, তারা বিভিন্ন জমিতে পাট নিড়িয়ে সেই অর্থ আশ্রমে দান করতাম। আশ্রমের পুকুর কাটার কাজও আমাদেরই করতে হয়েছিল। গ্রীষ্মের দিনে সেই কাজ করা অসাধ্য, তাই রাত্রি জেগে ঐ কাজ করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা হলো নতুন আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ছাড়া এই অসাধ্যসাধন অসম্ভব ছিল। তাঁর কাজ তিনি করিয়ে নিয়েছেন। ঐ আশ্রমে ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত আমার এক পুরনো বন্ধু নিশি গুহ। তাঁকে দেখে আমারও শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার প্রবল আগ্রহ জাগে। তিনি উৎসাহ দিলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম—জানি না কবে এই মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশাল কলেজে আই. এ. পড়তে গেলাম। সেখানে একদিন দেখলাম স্বামীজীর শিষ্য পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজের নেতৃত্বে মঠ থেকে একদল সাধু উপস্থিত হয়েছেন। বিকেলে সেখানে ভক্ত-সমাগম হতো। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো। ক্রমে জানলাম কেউ শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত, কেউ স্বামী শিবানন্দ অর্থাৎ মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত। আরও জানলাম যে, বি. এম. স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে ঠাকুরের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি অবিবাহিত ও ঠাকুরের পরম ভক্ত। প্রায় প্রতি রবিবার আমি সেখানে পাঠ, ভজন ইত্যাদি শুনতে যেতাম। সেসব শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ অনুভব করলাম। জ্ঞান মহারাজ সেখানে থাকাকালীন ঐ আশ্রমের ছেলেদের গান গাইতে বলতেন। আমাকেও একদিন বললেনঃ "তুমি গান গাইতে পার?" আমি বললামঃ "তেমন তো পারি না, তবে গাইছি।" গাইলাম—'চরণ দুটি চাই মা, চরণ দুটি চাই।' গান শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। এই বরিশালে থাকাকালীন নিশি গুহের পরামর্শে আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান করি। শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে তিনি অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হলো। সেখানে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন আশ্রম এবং বেলুড় মঠ দর্শন করে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী (তখন ঠিকানা ছিল ১নং মুখার্জী লেন। পরে ঐ রাস্তার নাম হয় উদ্বোধন লেন।) গেলাম। সেখানে পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ছিলেন। তাঁকে 'মায়ের দ্বারী' বলা হতো। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রথমে তাঁর অনুমতি নিতে হতো। তাঁকে প্রণাম করে আমার মনোবাসনা জানালাম। তিনি বললেনঃ ''তুমি এসেছ বহু দূর থেকে, কিন্তু শ্রীশ্রীমা অসুস্থ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছেন। এখনও তাঁর চিকিৎসা চলছে। কাউকে দীক্ষা তো দূরের কথা, দর্শন পর্যন্ত করতে দিই না। তুমি চিঠিতে যোগাযোগ রেখো। শ্রীশ্রীমা সুস্থ হলে আমি জানাব।'' সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ''তুমি আমার সঙ্গেও চিঠিতে যোগাযোগ রেখো। শ্রীশ্রীমা সুস্থ হলে আমি তোমায় জানাব।'' এই বলে তিনি অনেক উৎসাহ প্রদান করলেন। তারপর বরিশালে ফিরে এলাম। ঐ বছরই সম্ভবত পুজোর কিছু আগে রাসবিহারী মহারাজের চিঠি পেলাম। তিনি আসতে অনুমতি দিলেন। কলেজ ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কলকাতায় রওনা হলাম। শিয়ালদহে নেমে পায়ে হেঁটেই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি গেলাম, কারণ কলকাতার পথঘাট আমার একেবারেই অচেনা। যানবাহন বলতে শুধু ট্রাম ও ঘোড়ার গাড়ি চলত। পৌঁছাতে রাত্রি হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে আহার করে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেই শুয়ে রইলাম। পরদিন সকালে পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ আমাকে ওপরে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে আমার বাসনা জানালাম। শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞেস করলেনঃ ''তোমার দেশ কোথায় গা?''

আমি বললামঃ ''আমার দেশ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায়। বরিশাল কলেজে পড়ি।''

শ্রীশ্রীমা বললেনঃ ''অত দূর থেকে এসেছ? তা তোমাদের কুলগুরু নেই গা?''

আমি বললামঃ "হ্যাঁ মা, আছে। তবে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, আমি আপনার কাছ থেকেই দীক্ষা নেব।"

শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা কি শাক্ত?"

আমি বললামঃ "হ্যাঁ মা, আমরা শাক্ত।"

শ্রীশ্রীমা বললেনঃ "যাও, গঙ্গায় স্নান করে এসো। আমি ঠাকুরপুজো সেরে নিই।"

আমি গঙ্গায় স্নান করে রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে দীক্ষার জিনিস, ফুল, ফল ইত্যাদি কিনে ওপরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। দেখলাম, শ্রীশ্রীমা একটি আসনে বসে আছেন ও সামনে আরেকটি আসন পাতা আছে। ঠাকুরকে প্রণাম করে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলাম ও নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। তিনি আমায় দীক্ষা দিলেন ও আমার ইহকাল-পরকালের সমস্ত ভার নিলেন। তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় পেলাম। পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে আমার এই মনস্কামনা পূর্ণ হলো। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নানা কথা হলো এবং কিছু প্রাণের কথা বললাম। শ্রীশ্রীমা বললেনঃ "ঠাকুরই সব, উনিই সব, ওঁকেই ডাকবে, প্রার্থনা করবে। কোন ভাবনা নেই।" তারপর নিচে নেমে এলাম। নিয়ম অনুযায়ী পুরুষ ভক্তদের নিচে ও স্ত্রী ভক্তদের ওপরে প্রসাদ দেওয়া হতো। মা স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে আহার করার সময় আমাকে তাঁর প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেনঃ "যে নতুন ছেলেটি আজ এখানে এসেছে ও দীক্ষা নিয়েছে, তাকে দাও।" প্রসাদ পেয়ে আমি কৃতার্থ বোধ করলাম। শুধু তা-ই নয়, শ্রীশ্রীমায়ের পরম করুণাময়ী রূপ এবং পরম স্নেহমাখা কণ্ঠ প্রথম দর্শনেই আমার হৃদয়ের অতল স্পর্শ করেছিল। এ যেন বিশ্বপ্লাবী স্নেহ-ভালবাসার অমৃতধারায় অবগাহন। দীক্ষান্তে নিজের মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করলাম। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে চিঠিতে মনের ভাব আদান-প্রদান করতাম। শ্রীশ্রীমা চিঠিতে আমাকে 'বাবাজীবন' সম্বোধন করতেন। এই অপার করুণাময়ী বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করা মানে পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া।

যিনি জগজ্জননী মহামায়া—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী মহাশক্তি—তিনিই মা সারদারূপে দেহধারণ করে এই জগতে এসেছেন। তাঁর কৃপালাভ করা মানে মানবজীবন ধন্য হওয়া। * ❑

[এই স্মৃতিকথাটি ক্যাসেট-বন্দী করেন প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র মৃণালকান্তি চক্রবর্তী (স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের শিষ্য)। ক্যাসেট থেকে অনুলিখন করেন প্রকাশবাবুর পৌত্র পার্থসারথি চক্রবর্তী।]

* নিবোধত, ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০০, পৃঃ ১৫৬-১৫৮

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাকণা

প্রমোদকুমার সেন

আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই এবং চার বোন। আমি ছিলাম সকলের বড়। আমার পরের ভাই ছিল শচীন (শচীন্দ্রকুমার সেন)। সে ছিল আমার থেকে এক বছরের ছোট। আমার জন্ম ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে, শচীনের জন্ম ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। ১৪ বছর বয়সে সে অরবিন্দ ঘোষের বিপ্লবী সংগঠনে যোগদান করে। মানিকতলা বোমার আসামী হিসেবে সে কারারুদ্ধ হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে) সে সোজা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে হাজির হয় উদ্বোধনে এবং সঙ্ঘে যোগ দিতে চায়। তার সঙ্গে ছিলেন মানিকতলা বোমা মামলার আরেক বিখ্যাত আসামী দেবব্রত বসু। শচীনের বয়স তখন মাত্র ১৬ বছর। তাদের স্বদেশী করার কথা এবং মানিকতলা বোমা মামলার আসামীরূপে কারাগার বাসের কথা শ্রীশ্রীমা তাদের কাছ থেকে শোনেন। সেসময় স্বদেশীদের সঙ্ঘে আশ্রয় দেওয়া, বিশেষত জেলফেরত বোমার আসামীদের আশ্রয় দেওয়া সঙ্ঘের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু সব জেনেশুনেও মা সস্নেহে তাদের তাঁর কাছে আশ্রয় দান করেন এবং দুজনকেই দীক্ষা দান করেন। ঐ সময়ে তাঁরা সঙ্ঘে যোগদান করেন। সঙ্ঘে যোগদানের দুবছর পর (১৯১১ খ্রীস্টাব্দে) স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাদের সন্ন্যাস দান করেন। শচীনের নাম হয় স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং দেবব্রত বসুর নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। বিখ্যাত বিপ্লবী মাখনলাল সেন ছিলেন আমার নিজের কাকা—বাবার (দেবেন্দ্রনাথ সেন) আপন ভাই। তিনিও ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। এন্ট্রান্স পাশের পর আমি তখন উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজে পড়ছি। শচীন আমাকে একদিন মায়ের কাছে আসতে বলে। সে বলেঃ ''তুই-ও এখানে

চলে আয়। বড় শান্তির জায়গা।" কিছুদিন পরে (১৯১০ খ্রীস্টাব্দে) মায়ের কাছে গেলে মা আমাকেও সাদরে গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর (১৯১১ খ্রীস্টাব্দে) আমাকে দীক্ষাদান করেন। দীক্ষার পর মায়ের বাড়ীতে আমিও রয়ে গেলাম ব্রহ্মচারী হিসাবে। সেসময় মা দয়া করে আমাকে তাঁর সেবাধিকারও দিয়েছিলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কয়েকজন সাধু ও ভক্তকে নিয়ে কাশী যান। সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যান। সেসময় কাশীতে শ্রীশ্রীমাও ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেন। আমার নাম হয় ব্রহ্মচারী প্রসাদচৈতন্য। শচীন তখন আলমোড়ায়।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে আমাকে কাশী থেকে উদ্বোধনে পাঠানো হয়। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মা তখন উদ্বোধনেই রয়েছেন। আবার মায়ের সেবার সুযোগ পেলাম। কয়েকমাস পর মা জয়রামবাটী চলে গেলেন। সেই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে একবার জয়রামবাটী পাঠান। আমার সঙ্গে তিনি এবং শরৎ মহারাজ মায়ের জন্য অনেক জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলেন। যখন জয়রামবাটী পৌঁছাই তখন আমাকে পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে মা নিজে হাতপাখা নিয়ে আমাকে হাওয়া করতে থাকেন। যে-ক'দিন জয়রামবাটীতে ছিলাম মা নিজের হাতে আমাকে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। একদিন বারান্দায় মায়ের কাছে বসে আছি, কথায় কথায় যুদ্ধের কথা উঠল। মা বললেনঃ "ঠাকুর এসেছিলেন যে! অবতাররা এলে এমনিই হয়। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, মহম্মদ—সকলের সময় কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে।" কদিন পর কলকাতা ফিরে এলাম। জয়রামবাটীতে যেন মাকে উদ্বোধনের থেকেও আরো বেশি আপন করে পেয়েছিলাম। দেখতাম জয়রামবাটীতে মা অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, খোলামেলা। জয়রামবাটীতে মায়ের যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তা কোনদিন ভুলতে পারব না। উদ্বোধনেও মায়ের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি, কিন্তু জয়রামবাটীর মা যেন একেবারে ঘরের মা-টি। উদ্বোধনে মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকতেন সবসময়। জয়রামবাটীতে অমন থাকতেন

না। জয়রামবাটী যে মায়ের বাপের বাড়ি, সেখানকার মেয়ে তিনি। তাই জয়রামবাটীতে তিনি থাকতেন অত স্বচ্ছন্দ। ফলে লাভ হতো ভক্তদের।

কিছুদিন পর ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আলমোড়া থেকে চিকিৎসার জন্য শচীন এল উদ্বোধনে। সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তার অসুস্থতার মূলে ছিল তার ওপর কারাগারে অবর্ণনীয় অত্যাচার। শচীনের সেবার ভার মা আমার ওপর দিয়েছিলেন। আমাকে সাহায্য করত আরো দুজন ব্রহ্মচারী। যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও শচীনকে বাঁচানো গেল না। সে চলে গেল কয়েকমাস পর ১৯ জুলাই। অন্তিম শয্যায় শচীন শুধুই 'মা, মা' বলে ডাকত আর কাঁদত। মা তখন আমাদের গর্ভধারিণীকে (মহামায়া) আনতে পাঠালেন। তিনি এসে শচীনের মাথার কাছে বসে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। শচীন তাঁকে দেখল, কিন্তু তার কান্না থামল না। সে 'মা, মা' বলে কেঁদেই চলল। খবর পেয়ে মা এসে দাঁড়ালেন শচীনের মাথার পাশে। সস্নেহে মাথায় হাত রেখে তার পাশে বসলেন তিনি। মাকে দেখে শচীনের কান্না থামল। সে উঠে মায়ের চরণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। সেই আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে তার তখন শুধুই 'মা, মা' ডাক। অল্পক্ষণ পরেই 'মা, মা' বলতে বলতেই সে সজ্ঞানে দিব্যধামে যাত্রা করল। আমার গর্ভধারিণী তখন হাপুস নয়নে কাঁদছেন। মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "তুমি কেঁদো না। ও ছিল ফুলের মতো পবিত্র। শাপভ্রষ্ট কোন যোগীপুরুষ। ওর মতো ছেলেকে গর্ভে ধারণ করেছিলে তুমি। তুমি মহা ভাগ্যবতী। শচীন মহা ভাগ্যবান। আমি দেখলাম স্বয়ং ঠাকুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন।" শচীনের দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মা দোতলায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। শচীনের মৃত্যুতে মা খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। কয়েকমাস আগে (২০ এপ্রিল ১৯১৮) দেবব্রত মহারাজও উদ্বোধনেই দেহত্যাগ করেন। দেবব্রত মহারাজের মৃত্যুতেও মা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে ভুবনেশ্বর মঠে নিয়ে আসেন। মায়ের যখন মহাপ্রয়াণ হয় আমি তখন ভুবনেশ্বরে।

মহারাজও তখন সেখানে। ফলে মাকে আর দর্শন করতে পারিনি। শচীনের অকালমৃত্যুর পর মায়ের দেহান্তের মর্মান্তিক সংবাদ আমার হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে গেল। শুনেছিলাম, আমার কাকা মাখনলাল সেন অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মায়ের ভাগবতী তনু কাঁধে করে বাগবাজার থেকে বরানগর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বরানগর থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে মায়ের দেহ বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়ার সময়েও তিনি মায়ের দেহ বহন করেছিলেন। বেলুড় মঠে মায়ের দেহ চিতাগ্নিতে সমর্পণের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে আসি। কয়েকদিন পরেই আমি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। আমার গর্ভধারিণী খবর পেয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে মহারাজের কাছে কান্নাকাটি শুরু করেন। মহারাজকে তিনি বলেনঃ "আমার এক ছেলে হারিয়েছি, আরেক ছেলেও চলে যাবে!" মহারাজের অনুমতি নিয়ে তিনি আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন সুস্থ করে তোলার জন্য। আমার তখন ৩০ বছর বয়স (জানুয়ারি ১৯২২)। অদৃষ্টবশে মঠে ফিরে যাওয়া আমার আর হয়নি। কিন্তু মঠকে আমি ভুলিনি, মহারাজদের ভুলিনি, মাকেও ভুলতে পারিনি। আমার জীবন জুড়ে তাঁরাই শুধু রয়েছেন। জানি, জীবন যখন শেষ হবে তখন করুণাময়ী মা টেনে নেবেন তাঁরই কোলে।* ❑

* বর্তমান স্মৃতিকথাটি লেখকের কনিষ্ঠা কন্যা রমা রায়চৌধুরীর ([illegible] রোড, বালি, হাওড়া) সৌজন্যে পাওয়া গেছে। শ্রীমতী রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে প্রমোদকুমার সেনের সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে জপরত অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমতী রায়চৌধুরী আরো জানিয়েছেন, মৃত্যুর মাসখানেক আগে প্রমোদকুমার সেন ঠাকুরের দর্শনলাভ করেছিলেন।—সম্পাদক

মমতাময়ী মা

বিন্দুবাসিনী দেবী

জয়রামবাটীর সন্নিকটস্থ জিবটা গ্রামের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর উল্লেখ আছে স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' (৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৪১৭) গ্রন্থে। বিন্দুবাসিনী দেবী ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর পৌত্র কৃষ্ণচরণ রায়ের সৌজন্যে অধ্যাপক ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ বিন্দুবাসিনী দেবীর এই স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ করেন।—**সম্পাদক**

মা ছিলেন মমতাময়ী। তাঁর যে কত বড় অন্তর, তা কথায় কি করে বলব? কথাতে কি তা বোঝানো যায়? বুঝতে হয় মনে! তবু সবাই যখন ধরে, দু-একটা কথা না বলে থাকতে পারি না। কী ভালই না বাসতেন! মা আমায় ডাকতেন 'বৌমা' বলে। মায়ের কথা বলার আগে সেসময়ের কথা একটু বলি—কেমন করে আমরা (জিবটার রায় পরিবার) মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় পেলাম।

আমি পাড়াগাঁয়ের সেকেলে মানুষ, তার ওপর জমিদারবাড়ির বৌ! তখন জমিদারবাড়ির বৌ-দের বাইরে বেরনোর কোন অনুমতিই ছিল না। বাপের বাড়ি যাওয়াই ছিল বিরাট ঘটনা! বাপের বাড়ি থেকে লোক এসে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে যেত; তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনে পাঁজি দেখে সময়-ক্ষণ মিলিয়ে শুভমুহূর্তে পালকিতে চেপে বাপের বাড়ি যাত্রা করা হতো। সঙ্গে থাকত পাইক ও বরকন্দাজ।

তখন ঠাকুরতলায় যাত্রা, কীর্তন, কবিগান, বাউল, রামায়ণ ও ভাগবত পাঠ—আরও কত সব হতো; আমাদের জন্য অর্থাৎ জমিদারবাড়ির মেয়েদের জন্য থাকত দালানের এক পাশে সরু বাখারির জালের পর্দা দিয়ে ঘেরা জায়গা। ঐ ঘেরা জায়গায় বসে নানা অনুষ্ঠান

দেখাই ছিল আমাদের নিয়ম। তাতে ভাল দেখতে পেতাম না সব অনুষ্ঠান। কিন্তু কিছু বলারও উপায় ছিল না। তবে জমিদারবাড়ির পুরুষ-মানুষদের ব্যাপার আলাদা। জিবটার জমিদারদের মহাল ছিল নারায়ণপুর, সাতবেড়ে, হলদি, জয়রামবাটী, দেশড়া—এমন বহু মৌজায়। সব গ্রামেই বারোয়ারি পূজা হতো। সেই পূজায় মেলা, গান, যাত্রা লেগেই থাকত। রাত্রে ১০-১১টার সময় যাত্রাপালা শুরু হতো। তাতে নিয়ম ছিল—জমিদারবাবুর পালকি না আসা পর্যন্ত গান আরম্ভ করা যাবে না। যদি কোন গাঁয়ের মোড়ল জমিদারের মত না নিয়ে বা জমিদারের হাজির হওয়ার আগেই গান শুরু করত, তাহলে জমিদারের নায়েব সে-গান মাঝপথে থামিয়ে দিত। জমিদারের পাইক-লেঠেলরা গান ভণ্ডুলও করেছে অনেক সময়। ভিন গাঁয়ে অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আমাদের।

জিবটা জয়রামবাটীর খুবই কাছের গ্রাম। জয়রামবাটী গ্রামের নানা ঝামেলাতেও যেমন জমিদারদের হাজির হতে হতো, তেমনই ঐ গ্রামের কোন উৎসব-অনুষ্ঠান ঘটলে রায়বাবুদের উপস্থিতি ব্যতীত তা শুরুই হতো না। আমি জয়রামবাটীর কাউকেই চিনতাম না, পরে যখন মায়ের দর্শন হলো, তখন সবাইকে চিনতে লাগলাম।

আমার শ্বশুরমশাই খুব রাসভারি লোক ছিলেন। যেমন চেহারা, তেমনই মেজাজ। তিনি নানা গ্রামে সালিশি করতে যেতেন। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতে যেতেন। শুনেছি, আমার স্বামী (শম্ভুচন্দ্র রায়) প্রথম প্রথম মায়ের ব্যাপারে অত আগ্রহী ছিলেন না। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে ওঁর খুব ভাবান্তর এসেছিল। কোন কাজে মন দিতে পারছিলেন না। সদাই যেন মনমরা—আপনভোলা। এর ওপর তাঁর স্ত্রী এক শিশুকন্যা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যদি না শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সেইসময় তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তিনি হয়তো সংসার ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন।

শুনেছি, সেসময়ই তাঁর সঙ্গে পূজনীয়া গৌরী-মার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিবটার শিবমন্দিরে এসেছিলেন। তখন জিবটার রায়পুকুরে খুব পদ্মফুল হতো। গৌরী-মা মায়ের বাড়ির পূজার জন্য রায়পুকুর থেকে পদ্মফুল

নিতে এসেছিলেন জিবটায়। তখনি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গৌরী-মার কাছেই তিনি মায়ের মহিমা বিশেষ করে শুনেছিলেন। গৌরী-মাই তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে তাঁর মনে সব অশান্তি দূর হবে এবং তিনি এক নতুন মানুষে পরিণত হতে পারবেন। জমিদারবাড়ির রক্তে অত বিনয় নেই; কিন্তু কেন জানি না, আমার স্বামী গৌরী-মার কথা বিশ্বাস করেই মার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। পরে আমি যখন ওঁকে দেখেছি, তখন ওঁর মুখে মা ছাড়া কোন কথাই নেই। সব কথাতেই মায়ের প্রসঙ্গ, মায়ের উপদেশ ও নির্দেশ!

জিবটার জমিদারির শরিক ছিল অনেক। তারা সবাই যে মায়ের ভক্ত ছিল তা নয়; উলটে তারা অনেকসময় মাকে কষ্টও দিয়েছে। মায়ের কাছে জাতপাত কিছু ছিল না। হাড়ি, ডোম, বাগদী, মুচি, মুসলমান সবাই আসত। একবার জগদ্ধাত্রীপূজায় লোক খাওয়ানোর সময় ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরিবেশন না করানোয় জমিদার ও গ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণরা খুব অশান্তি করেছিল। মাকে কয়েকবার তার জন্য জরিমানা দিতে হয়েছে। অবশ্য পরে আমার স্বামী যখন জমিদারির দায়িত্বে এলেন, তখন মা যা বলতেন, তাই করতেন।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই উনি আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়ির বৌ পালকি করে মাকে দেখতে গেছি, তা দেখতে গ্রামের বহু লোক এসে জুটেছিল। তাতে আমার খুব লজ্জা হয়েছিল। মাকে দেখতে যাব, তা আবার পালকি করে! আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, আমি হেঁটে মাকে দেখতে যাব। উনি তখন বললেনঃ "তা কি করে হবে? জমিদারবাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো হেঁটে অন্য গ্রামে যায় না। যদি একান্তই হেঁটে মাকে দর্শন করতে চাও, তাহলে তোমাকে কলকাতা যেতে হবে।" তাই মায়ের সঙ্গে আমার বেশিরভাগ সময়ই সাক্ষাৎ হয়েছে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে। মা জয়রামবাটীতে আছেন জেনেও তাঁর কাছে বেশি যাওয়ার সুযোগ পাইনি। সে-দুঃখ মনে আছেই।

আমার বিয়ের আগেই আমার স্বামী মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে মায়ের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করেছি; একদিন আমার স্বামী বললেনঃ "এবার দীক্ষা নেওয়ার সময় হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পার দীক্ষা নিয়ে নাও।" তারপরই মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম। খুব সখ হলো মাকে সোনার অঙ্গুরী দিয়ে প্রণাম করব। দীক্ষার দিন মাকে বললামঃ "মা, একটা আবদার করব, আপনাকে সে-দাবি মেটাতে হবে।"

মা শান্ত স্বরে বললেনঃ "কী বৌমা?" বললামঃ "মা, আপনার জন্য এই আংটিটা করিয়েছি। এটা আপনাকে পরে থাকতে হবে। এটা আমার সখ।" মা বললেনঃ "আচ্ছা বৌমা, তাই হবে। তা এসব করতে গেলে কেন?" আমি বললামঃ "না মা, আপনি অমত করলে আমরা দুজনেই খুব কষ্ট পাব। আমাদের অনেকদিনের বাসনা।"

আরেকটি বিশেষ ঘটনা আমার মনে আছে। আমার বিয়ের অনেকদিন পরেও সন্তান হয়নি। জ্ঞাতিরা সমালোচনা করত। বাড়ির দোল-দুর্গোৎসবে কোন কাজ করতে দিত না আমায়। বলাবলি করত—আমার সন্তান হয়নি, তাই ঠাকুর-দেবতার কাজ আমি করতে পারব না! এই কথাটা যখন নিজের কানে শুনলাম তখন যে কী কষ্ট হয়েছিল তা আর কী বলব! স্বামীকে বললাম আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে যেতে।

মা তখন বাগবাজারে—উদ্বোধনে। আমি বাগবাজার গেলাম মাকে দর্শন করতে। প্রথমদিন কিছু বলতে পারলাম না। দ্বিতীয়দিন গিয়ে মাকে একা পেয়ে আমার মনের দুঃখ সব জানালাম। মা আমাকে শান্ত করে ঘরের ভিতর থেকে একটি গোপালের মূর্তি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেনঃ "বৌমা, তোমাকে এই গোপালকে দিলাম, তুমি পূজা করো।" মায়ের হাত থেকে গোপাল পেয়ে কী আনন্দই না হয়েছিল! এর পরেই আমাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

আগেই বলেছি, আমার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর এক কন্যা ছিল। তার নাম সরোজবাসিনী। আমরা 'সরোজ' বলে ডাকতাম। তার বিয়ে হয়েছিল কোয়ালপাড়ার নফরচন্দ্র কোলের পুত্র ভূতনাথ কোলের সঙ্গে।

তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ছিল। কলকাতার বেলেঘাটায় তাদের ব্যবসা ছিল, আবার বাড়িও ছিল। সংসারের ঝামেলায় একসময় সরোজের মন অশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। জিবটায় এসে আমাকে জানালে আমি তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাই। মা তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেও মায়ের খুব স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রায়ই সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে হাজির হতো।

তখনকার জমিদারবাড়ি মানেই লোকলশকর, পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল-দারোয়ান, দাঙ্গা-মামলা—এসব নিয়েই জমিদাররা মশগুল থাকত। জিবটার জমিদাররাও তার থেকে ভিন্ন নয়। তবে সৌভাগ্য এই যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছে। আমরা নিজেরাই তার প্রমাণ। আমার স্বামীর এক ভাইপো সজনীকান্ত রায়ও (উমেশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র) মায়ের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। তিনি জয়রামবাটীতে ওষুধ দিতেন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি মারা গেলে তাঁর বড় ভাই রজনীকান্ত রায় মায়ের বাড়ির দাতব্য চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি স্বপ্নে মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে মায়ের কোন প্রয়োজন থাকলে তিনি লোক দিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে পাঠাতেন। উনি মায়ের ডাক পেলে সব কাজ ফেলে মায়ের কাছে ছুটতেন। তখন রায়বাড়ির জমিদারি সেরেস্তায় গোমস্তা ছিলেন প্রমথ কোঙার। তিনি শিক্ষিত ও ধীরস্থির প্রকৃতির ছিলেন। মায়ের কাছে যখন কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সন্তান থাকতেন না, অথচ কোন চিঠিপত্র এসেছে তার জবাব দিতে হবে, মা সেকথা আমার স্বামীকে জানালে তিনি আমাদের গোমস্তাবাবুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দু-একদিন অন্তর মায়ের বাড়ি গিয়ে কোন কাজ আছে কিনা খোঁজ করতে। গোমস্তাবাবু যতদিন জমিদারিতে কাজ করেছেন, ততদিন ঐ দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তিনিও মায়ের বিশেষ অনুগত সন্তান ছিলেন।

জিবটার রায়বাড়িতে ও আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা কথায় বলে শেষ করা যাবে না। শুনেছি, বহু আগে ঠাকুর এ-পথ দিয়ে শিহড় যেতে আমাদের শিবমন্দির-চত্বরে বসেছিলেন। অন্যান্য মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করেছিলেন। তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু ঐভাবে তাঁর আশীর্বাদ আমাদের পরিবারে এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই আশীর্বাদের জোরেই মা আমাদের কোলে ঠাঁই দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। মায়ের স্পর্শ পেয়েছি, অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছি। মা সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সবসময়ই আমাদের তাঁর কোলে তুলে নিতে ব্যস্ত হতেন। তা না হলে আমাদের মতো বদ্ধজীবেরা কী করে তাঁর পাদপদ্ম ছোঁয়ার অধিকারী হই! জয় মা! * ❑

সংগ্রহ ঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০৭, পৃঃ ১১৬-১১৭

মায়ের কথা

মন্দাকিনী দেবী

স্মৃতিটি 'নবাসনের বউ' নামে মায়ের জীবনীতে প্রসিদ্ধা মায়ের এক সেবিকার। তাঁর প্রকৃত নাম—মন্দাকিনী রায়।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমাকে তো আগে কখনো দেখিনি এবং তাঁর প্রসঙ্গে কিছুই জানতাম না। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে স্বামী মারা যান। তারপর আমি শ্বশুরবাড়ি (নবাসন) থেকে বাপের বাড়ি মথুরায় আমার মায়ের কাছে চলে আসি। কিছুদিন পর আবার আমার মায়ের সঙ্গে নবাসনে শ্বশুরের ভিটেয় আসি। শ্বশুরবাড়িতে থাকতে অসুবিধা হবে বেশ বুঝতে পারছিলাম। আবার বাপের বাড়িতে যে থাকব তাতেও মন সায় দিচ্ছিল না। কারণ, তাদের অবস্থাও তো ভাল নয়। নবাসনে চাটুজ্যে গিন্নির কাছে আমরা প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনি এবং তাঁরই সঙ্গে একদিন আমার মা ও আমি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করি। প্রণাম করে উঠতেই মা বলতে শুরু করলেনঃ "তা মা, চিন্তার কী আছে? আমি তো আছি। ওখানে থাকতে অসুবিধা হলে আমার কাছে চলে আসবে।" মায়ের মুখ থেকে ঐ কথা শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আমি মাকে কোন কথাই বলিনি। অথচ মা আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন জেনে অবাক হয়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনের মাস-দুয়েকের মধ্যেই তাঁর অসুখের কথা শুনলাম। শুনলাম, তিনি কোয়ালপাড়ায় আছেন। আমার মা কৌতুকবালা তখন আমার কাছে নবাসনেই আছেন। শ্রীমায়ের শরীর খারাপের সংবাদ শুনে মায়ে-ঝিয়ে কোয়ালপাড়া যাই। সেখানে

শ্রীশ্রীমায়ের শরীরের অবস্থা দেখে আমার মা (গর্ভধারিণী) বললেনঃ "মন্দা, তুই মায়ের কাছে কয়েকদিন থেকে যা, এখানে লোক-যাতায়াত বেশি, একা গিন্নিমা (কেদারবাবুর মা) কি করে সব সামলাবেন?" আমার মায়ের কথা শুনতে পেয়ে বিছানা থেকে শ্রীমা বললেনঃ "বউমা, তোমার মা যা বলছেন তাই-ই কর মা।" আমার আর কিছুই বলার থাকল না। তাঁর আদেশ মতো তাঁর কাছে থেকে গেলাম। মা কৃপা করে সেদিন থেকেই তাঁর চরণে ঠাঁই দিলেন। কয়েকদিন পর মা অসুখ থেকে সেরে উঠলেন। আমার চিন্তা হলো—এরপর মা বলবেন না তো, "বউমা, এবার শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে এস।" মাঝে মাঝে নিজের থেকেও ইচ্ছা হতো মাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করিঃ "মা, এবার কি আমি নবাসনে ফিরে যাব?" কিন্তু যতবারই বলতে গেছি ততবারই মা অন্য কথা বলে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন মা বললেনঃ "বউমা, একবার তোমার মায়ের কাছে মোথরো (মথুরা) ঘুরে এস। বউরা (ভাইদের স্ত্রীরা) তো রয়েছে। ফিরে আসবে যখন, নবাসনেও একটা রাত কাটিয়ে এস।" মায়ের কথামতো কদিন ঘুরে এলাম। আমি যখন মায়ের কাছে থাকতাম, তখন মাঝে মাঝে আমার গর্ভধারিণীও মায়ের কাছে এসে থাকতেন। মা তাঁকে কাপড় ইত্যাদি দিতেন। তাঁর অসুখের সময় মা তাঁকে কোয়ালপাড়ায় এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শরীর সারার পর শরৎ মহারাজ যখন মাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন স্থির হলো তখন মায়ের সঙ্গে তাঁর ভাইঝিরাও যাবে শোনা গেল। কিন্তু আমাকে কি মা নিয়ে যাবেন? আমার তো যাবার ইচ্ছা খুব। এরকম যখন ভাবছি, মা-ই বললেনঃ "ও বউ, তুমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। তুমি সঙ্গে না গেলে আমি কি করে এই কুঁচো-কাঁচাদের সামলাব? আমার শরীর তো দেখছ!" মায়ের কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। বুঝলুম, মা আমাদের অন্তরের সব কথাই জেনে বসে আছেন! কলকাতায় মায়ের কাপড়-চোপড় কেচে

দেওয়া, মায়ের স্নানের জল গরম করে দেওয়া, নখ কেটে দেওয়া, ইত্যাদি অনেক কাজই করতুম। মায়ের কাছে থাকতে থাকতে যেন মায়ের ভাইঝিদের একজন হয়ে গিয়েছিলুম। নলিনীর সঙ্গে যদিও মাঝে মাঝে খুব ঝগড়া হতো, আবার ভাবও হয়ে যেত।

আমার মায়ের দীক্ষা অভাবনীয়ভাবে হয়। তিনি একবার জয়রামবাটী এসেছেন। সারাদিন থেকে বিকেলে বাড়ি ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে গ্রামের আরো দু-একজন এসেছিলেন। হঠাৎ শ্রীমা মাকে বলে উঠলেনঃ "তুমি হাত-পাটা ধুয়ে একবার আমার ঘরে এস।" আমার গর্ভধারিণী কিছু না বুঝেই মায়ের কথামতো ঘরে ঢুকলেন। মা তাঁর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর কানে মহামন্ত্র দান করলেন। শ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে একটি টাকা নিবেদন করে মা বললেনঃ "জীবনের বড় আশা তুমি মিটিয়ে দিলে মা।" বাস্তবিক, সেই মুহূর্তে মা যদি আমার গর্ভধারিণীকে দীক্ষা না দিতেন, তাহলে তাঁর আর দীক্ষা হতোই না। কারণ, এরপরই তিনি অসুস্থ হন এবং মারা যান।

আমার দীক্ষাও ঐরকম। সেবার (১৯১৯ সাল) পুজোর সময় মা জয়রামবাটীতে আছেন। মহাষ্টমীর দিন সকালে মায়ের চরণে ভক্তেরা এসে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। মা আমাকে এমন সব কাজ দিয়েছেন যাতে আমি তাঁর কাছাকাছি থাকি। হঠাৎ একসময় লোকজন সরিয়ে দিয়ে আমাকে বলে উঠলেনঃ "বউ, তাড়াতাড়ি এস তো একবার।" আমি ছুটে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর পাশের আসনে বসতে বললেন। আমি তাঁর কাছে বসলে তিনি আমায় ইষ্টমন্ত্র দান করলেন। দীক্ষার জন্য কোন তাগিদ আমার ছিল না। মা-ই সময় বুঝে কৃপা করে মহামন্ত্র দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলেন।[১] ❑

সংগ্রহঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১ দীর্ঘ আড়াই বছর মায়ের সেবিকারূপে নন্দা বা নন্দাকিনী (নবাসনের বউ)

মায়ের কাছে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর তিনি কোয়ালপাড়ায় কেদারবাবুর (স্বামী কেশবানন্দ) সহধর্মিণীর নিকট অবস্থান করতেন। সেখানেই মায়ের নাম স্মরণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে 'নবাসনের বউ' (পৃঃ ২২৯), ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রী সারদা দেবী' গ্রন্থে 'সেবিকা' (পৃঃ ৯১), স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে 'নবাসনের বউদি' (পৃঃ ৮৭), স্বামী পরমেশ্বরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' গ্রন্থে 'মান্দা' (পৃঃ ৫৬) নামে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নবাসন (জে. এল. নং-৭৪) মৌজার সি. এস. পড়চা রেকর্ডে মন্দাকিনীর পরিচিতি হিসাবে উল্লেখ আছেঃ—মন্দাকিনী বাগদিনি এবং স্বামী সীতারাম বাগদি (দাগ নং—১৯০৮; খতিয়ান নং—৪১৯; পুস্তক নং—২; পৃঃ ৪৫৮)।—**সম্পাদক**

• তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নবাসন নিবাসী পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ করেছেন।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণা

মুকুলমালা দেবী

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতির সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। আমি অতি সামান্য একজন নারী। শ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমি কি লিখব? তাঁকে আমি কতটুকুই বা জানি? তাঁর অপার মহত্ত্বকে এক কণামাত্র জানবারও শক্তি আমার নেই। শ্রীশ্রীমাকে মাত্র কয়েকবার দর্শন করবার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে কোনই যোগ্যতা আমার নেই। অহেতুক স্নেহের অপার সাগর শ্রীমা। অযাচিত হয়ে তিনি আমাকে তাঁর অজস্র স্নেহ বারবার দান করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই দেবদুর্লভ সান্নিধ্যলাভের মধ্যে যে কী গভীর মহিমা আছে, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। শুধু শ্রীমায়ের সেই স্নেহকরুণামাখা আনন্দময়ী মূর্তি ভেবে, তাঁর অযাচিত স্নেহ ও করুণা স্মরণ করে আমার হৃদয় কি এক অজানা আনন্দে আজও পূর্ণ হয়ে যায়। চোখ দুটি হয়ে ওঠে অশ্রুসিক্ত।

আমার পরিচয়—শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত প্রিয় সন্তান, বরানগর নিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার মাতামহ। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের একমাত্র কন্যা প্রতিভাদেবীই আমার জননী। আমার দিদিমা কিরণশশী দেবী শেষবয়সে আবার বাবার কাছেই থাকতেন। দিদিমা মাঝে মাঝে বাগবাজারে 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতে যেতেন ও দু-একদিন সেখানে শ্রীমায়ের কাছে থাকতেন। দিদিমা যখন বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে যেতেন তখন আমার বয়স খুবই কম, একেবারে শিশু বললেই হয়। তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। আমার সেই অতি ছেলেবেলায় দিদিমা আমাকে একদিন বাগবাজারে 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতে নিয়ে গিছলেন। সেই শিশু অবস্থাতেই আমি আমার আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি।

আমি যখন শ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি তখন সেটা কোন সাল আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি, উদ্বোধন-এর বাড়ি তখন দু-তিন বছর আগে তৈরি হয়েছে আর শ্রীমা সেখানে ঐসময় থেকে বাস করছেন।

শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের যে-স্মৃতি আমার মনে আছে সে-সম্বন্ধে আমার যতটুকু মনে পড়ে তা এখানে বলছি।

আমার যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন একদিন আমাদের বাড়িতে ভীষণ বায়না ধরে আমি ক্রমাগত কাঁদতে থাকি। ক্রমাগত তিনদিন ধরে সেই কান্নার জের আর যেন শেষ হতে চায় না! বাড়ির সকলেই তাতে মহা ভাবনায় পড়লেন। অভিভাবকদের মনে হলো আমার বোধহয় কোন শক্ত অসুখ হয়েছে। ডাক্তার, রোজা—সবাইকে একে একে ডাকানো হলো। কিন্তু তাতে কোনই ফল হলো না। তাঁরা কেউই আমার সেই কান্না থামাতে পারলেন না। জানিনা মনে মনে কি ভেবে দিদিমা আমাকে শেষকালে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এলেন। আমি শ্রীমায়ের কোলে উঠে ও তাঁর মুখের পান খেয়ে তাঁর শান্তিময় কোলে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ কোথায় গেল আমার কান্না! এক মুহূর্তে তখনি সেরে গেল আমার সেই 'শক্ত অসুখ'। দিদিমার মুখে এ-সম্বন্ধে পরে শুনেছি—শ্রীমা তাঁকে বলেছিলেনঃ "আমার কাছে ও আসবে বলে কেঁদেছে। অসুখ নয় কিছু।" সেদিন ওখানে খিচুড়ি প্রসাদ পেয়েছিলাম। দিদিমার সঙ্গে দুদিন ধরে শ্রীমায়ের কাছে থেকে তারপরে বাড়িতে চলে আসি।

এরপর মাঝে মাঝে আমি দিদিমার সঙ্গে শ্রীমায়ের কাছে যেতুম। তখন আমি খুব অল্পবয়সের মেয়ে। ধর্ম সম্বন্ধে জানবার কী ইচ্ছাই বা তখন সেই বয়সে থাকতে পারে? শ্রীমাকে দেখতে যাই, কিন্তু খাবারের দিকেই তখন লোভ বেশি। শ্রীমায়ের কথা (উপদেশ) সেই ছোট মেয়ে কি শুনবে? মনে আছে ঐসময়ে শ্রীমা একদিন পুজোয় বসেছেন। পুজোর ঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়ে আমি বসে আছি কিন্তু আমার দৃষ্টি ফল-মিষ্টির (পুজোর নৈবেদ্যর) দিকে। হঠাৎ শ্রীমা উঠে এসে আমার হাতে কিছু ফল ও বাতাসা দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেনঃ 'ঠাকুরের

আগেই খেলি?" তারপর থেকে শ্রীমা যখনই আমাকে খাবার দিয়েছেন, তখনই অমনি মাকে আমি বলেছিঃ "তোমার ঠাকুর খেয়েছে তো?"

আগেই বলেছি আমার বয়স তখন খুবই অল্প। আদবকায়দা সে বয়সে অত জানতুম না। শ্রীমায়ের সঙ্গে কথা কইবার সময়ে তাঁকে 'তুমি' বলেই আমি সম্বোধন করতুম। শ্রীমাকে এইরকম 'তুমি' বলতুম শুনে অনেকে আমাকে তখন বারণ করতেন। অনেকে সাবধান করে দিতেন, পাছে আমার কোন অমঙ্গল হয়। শ্রীমা তাঁদের ঐ আপত্তির কথা শুনে যেতেন। তারপরে হাসিমাখা মুখে তাঁদের বলতেনঃ "পরে আর (তুমি) বলবে না।" (অর্থাৎ, বয়স বেশি হলে তখন আর আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবে না।)

এরপরে দু-তিন বছর কেটে গেছে। তখন একটু বড় হয়েছি। একটু-আধটু জ্ঞানবোধও হয়েছে। সেইসময়ে শ্রীমা আমাকে একটি বিষয়ে সাবধান করে দিতেন। এবিষয়ে মা আমাকে বলতেনঃ "রাণু! (আমার ডাক নাম) তুমি কারো কাছে কিছু আশা করো না। কারুর কাছে কিছু চেয়ো না। কারুর কাছে কিছুই পাবে না, শুধু মনোকষ্টই পাবে।" সেই ছেলেবেলায় শোনা মায়ের সেই কথার সত্যতা আজ এই পরিণত বয়সে সারাজীবনের কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছি ও পারছি। এই সংসারে এপর্যন্ত কারুর কাছ থেকে যখনই কিছু চেয়েছি, তা মোটেই পাইনি। আজও যদি কারুর কাছ থেকে কিছু চাই তবে তা পাই না। তাতে শুধু মনোকষ্টই সার হয়। সেই চাওয়া সংসারের দরকারে কোন জিনিসপত্রই শুধু নয়, সে শুধু একটু স্নেহ-ভালবাসা। এই সামান্য একটু স্নেহ-ভালবাসাও এই সংসারে কারুর কাছে চাইলে পাওয়া যায় না! সত্যিই, এই সংসারে সবচেয়ে বেশি অভাব ঠিকমতন স্নেহ-ভালবাসার। সারা জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দেখেছি, সংসারে কেউই প্রাণখুলে ভালবাসতে পারে না। ভালবেসেছিলেন শুধু শ্রীমা। শ্রীমা তাঁর সমস্ত ভালবাসা একেবারে উজোড় করে ঢেলে দিতেন। তাই এখন শ্রীমায়ের ওপর আমার অভিমান হয়। অভিমান করে তাঁর উদ্দেশে বলিঃ 'তুমি কি ইচ্ছে করলে এটি আমায় ঠিক করে দিতে পারতে না?" আশা ছেড়ে দেওয়া কি সহজ

কথা? জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তাই এখনো এই পরীক্ষা দিচ্ছি।

এইবার এল আমার দীক্ষার শুভক্ষণ। তখন আমার বয়স নয় বছর। ঐসময়ে একদিন বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছে গেছি। শ্রীমায়ের ঘরের দেওয়ালে ঠাকুর-দেবতাদের কতকগুলো ছবি টাঙানো ছিল। মা আমাকে একে একে সেই ছবিগুলি দেখালেন। তারপরে সেইসব দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এঁদের মধ্যে কে ভাল বলো?" আমি মহাদেবের ছবি দেখিয়ে মাকে বলেছিলুমঃ "এই-ই (এই দেবতাটি) ভাল।" মা সেইদিনই আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। সেইদিনই মায়ের কাছে আমার দীক্ষা হলো। মা আমাকে তাঁর অভয় কোলে আশ্রয় দিলেন।

১৩২১ সাল। আমার তখন দশ বছর বয়স। সেই অল্পবয়সেই আমার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলো। সেই থেকে আর মায়ের কাছে আসতে পাইনি। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল ভারি কঠিন জায়গা। বাড়ির বউদের সেখানে খুব সঙ্কোচের মধ্যে থাকতে হতো। বউদের কোনকিছুই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পছন্দ করতেন না। সব ব্যাপারেই বউদের ওপর তাঁদের কড়া পাহারা। তখনকার দিনে আমার শ্বশুরবাড়ির সেই ভীষণ স্থান ও পরিবেশকে বলা যায়, সে যেন একেবারে জেলখানা। বাগবাজার থেকে আমার শ্বশুরবাড়ি অনেক দূরের জায়গা। ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ শ্রীমা এই পৃথিবীর লীলা শেষ করে দিব্যধামে চলে গেলেন। সেসময়ে শ্রীমাকে শেষ দেখবার সুযোগও আমার হলো না! শ্বশুরবাড়ি থেকে এসব মোটেই হওয়ার জো নেই। সেই দূর স্থান থেকেই আমি শ্রীমায়ের দেহরক্ষার খবর পেলুম। তখন আমার প্রাণে যে কত ব্যথা, তা আর কাকে বলব? সে দুঃখ, সে ব্যথা জানেন শুধু অন্তর্যামী। সমস্ত প্রাণকে ব্যথায় নিঙড়ে ফেলে দুই চোখ দিয়ে নীরবে ঝরে পড়ল চোখের জল। আজও প্রাণ অস্থির হয়। 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতে মায়ের ঘরটিতে গেলে মনে হয়—মা বসুন আবার সেই আগেকার মতন করে, আমি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাকে না দেখতে পেয়ে কি যে কষ্ট হয় তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। জানি শ্রীমা সর্বক্ষণই আমাদের কাছে

কাছে আছেন, তিনি কখনো আমাদের ভুলে যেতে পারেন না। তবুও সমস্ত প্রাণ চায়, তিনি আবার আমাদের সামনে তেমনি করে আসুন। দুই চোখ মেলে প্রাণ ভরে আবার তাঁর সেই করুণামাখা আনন্দময়ী মূর্তি দেখি।

শ্রীমায়ের যাঁরা কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান, ঠাকুরের সাক্ষাৎ দয়া যাঁরা পেয়েছেন সেইসব ভক্তদের কাছে আমার এই প্রার্থনা—শ্রীমায়ের অভয় কোল যেন আমি শেষ সময়ে পাই। আমি মায়ের 'চরণ' বুঝি না। কারণ, তাঁর কাছে আমি যখনই যতটুকু সময়েই গেছি মা আমাকে দুহাত বাড়িয়ে হাসিমাখা মুখে ডেকেছেন—'আয়'। আমি ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে পড়েছি। কী করুণা, কত দয়া, কত স্নেহ তাঁর! মা! মা! দয়াময়ী মা! সত্যিই মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমি কেমন যেন হয়ে যাই! নিজেকে আর সামলাতে পারি না!

আজ খালি এই কথাই বারবার মনে হচ্ছে এত কাছে কাছে মাকে পেয়েও কেন তাঁকে আরও বেশি আপন করে নিইনি? কেন তাঁকে আরও ভাল করে পাওয়ার চেষ্টা করলুম না? কী অজ্ঞান আমি! হায়, এত কাছে কাছে পেয়েও তাঁকে হেলায় হারিয়েছি!

শ্রীমায়ের সম্বন্ধে সবকথা বলা যায় না। যা একান্তভাবে ভক্তির সঙ্গে অন্তরের গোপনে লুকিয়ে রাখবার জিনিস, তাকে বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয়। সেই পরম পবিত্র সম্পদ চিরদিন আমার অন্তরে গোপন হয়েই থাকুক। এখানে শুধু একটি কথা বলেই আমি শেষ করি।

সেই ছেলেবেলায় একদিন বাগবাজারে মায়ের কাছে বসে আছি। একথা সেকথা কইতে কইতে মা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আমায় কতখানি ভালবাস?" আমি আমার ছোট্ট দুখানি হাতের সীমা শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে বলেছিলুমঃ "এ-ত-খা-নি।" মা সেইকথা শুনে আদর করে আমাকে বলেছিলেনঃ "ঐরকম সবাইকে ভালবেসো। কারুর জন্যে তোমার ভালবাসা যেন কখনো এর চেয়ে একটুও কম না হয়।"* ❑

* **বিশ্ববাণী, ১৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬২, পৃঃ ৩৮৫-৩৮৮**

মাতৃসান্নিধ্যের কিছু স্মৃতি

মেনকা মুখোপাধ্যায়

আমাদের বংশে কুলগুরু ছিলেন। আমার স্বামী কুলগুরুরই কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি, আমার দেওর (ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) এবং আমার ভাজ (সুহাসিনী মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত। আমার দেওরের এক বন্ধুও (পুণ্ডরীক বসু) মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ছিল। সেসময় আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে থাকতাম। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা হলেও আমার স্বামী ঠাকুর ও মায়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রতিদিন রাত্রে সব দরজায় তালা দিয়ে "ঠাকুর রক্ষা কোরো" বলে শুতে যেতেন। এটাই হয়ে গিয়েছে আমাদের বাড়ির বরাবরের ধারা। আমি মাঝে মাঝে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে মায়ের কাছে যেতাম। সাধারণত দুপুরের দিকেই যেতাম। আমার সঙ্গে কখনো থাকত আমার বড় মেয়ে [সাধনা (চট্টোপাধ্যায়)], কখনো থাকত আমার ছোট ছেলে (গুরুপ্রসাদ)। একদিন কিছু মিষ্টি নিয়ে 'মায়ের বাড়ী'তে গেছি। সেদিন একটু সকাল সকাল গিয়েছিলাম। আমরা যখন 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছেছি তখন দেখলাম মা বেলুড় মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। মাকে প্রণাম করে বললামঃ "মা, আপনি তো এখন বেলুড় মঠে যাচ্ছেন, তাহলে আমার এই মিষ্টিটি প্রসাদ করে দিয়ে যান।" মা হাসিমুখে মিষ্টির বাক্সটি খুলে জিভ দিয়ে একটি মিষ্টি স্পর্শ করে বাক্সটি আমার হাতে ফেরত দিলেন। সেদিন আমার পাশে আমার বড় মেয়ে ছিল। মা চলে যাওয়ার পরে সে আমাকে বললঃ "দেখেছ, মায়ের জিভটা যেন মা কালীর জিভের মতো লাগল!"

আর একদিন 'মায়ের বাড়ী' গেছি, সঙ্গে আমার ছোট ছেলে। তখন তার বয়স সাত-আট বছর হবে। আমি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কথা বলছি,

আর ছেলে পাশে খেলা করছে। তখন সকলের দুপুরের প্রসাদ পাওয়া শেষ। মা পা ছড়িয়ে মেঝেয় বসে রয়েছেন। কি কথা হয়েছিল এখন আর মনে নেই; কিন্তু আমার ছেলেকে বড় হয়েও বলতে শুনেছি, তার স্মৃতিতে মায়ের ঐ পা-ছড়িয়ে-বসার ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। মা কে, মা কি, তা বোঝার ক্ষমতা তো তখন তার ছিল না। কিন্তু বড় হয়েও যখন মায়ের ঐ পা-ছড়িয়ে-বসার ছবিটি তার মনে জীবন্ত হয়ে আছে, আমার বিশ্বাস, আজীবন অমনি উজ্জ্বল হয়েই তা থাকবে তার কাছে। আমিও অনেক কথাই এখন ভুলে গেছি, পরে আরও ভুলে যাব, কিন্তু ছেলের কাছে জীবন্ত হয়ে থাকা মায়ের ঐ ছবিটি সব সময় আমার চোখের সামনেও ভাসে। এখনও ভাসছে। সেই স্নেহমাখা হাসিভরা অপূর্ব মুখখানি! ঐ মুখই আমার জীবনের ধ্রুবতারা। ঐ চিন্ময়ী মূর্তিই আমার পরম আশ্রয়। ঐ ছবিই আমার জীবনের সম্বল।* ❑

* এই স্মৃতিকথাটি লেখিকার কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (গাঙ্গুলীপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০০২) সৌজন্যে পাওয়া গেছে।—সম্পাদক

মাতৃবন্দনা

রাসবিহারী গোস্বামী

এই স্মৃতিকথাটি মায়ের শিষ্য ও ভক্ত আরামবাগ-নিবাসী ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু রাসবিহারী গোস্বামীর। তাঁর নিবাস আরামবাগের নিকটবর্তী বসন্তপুর গ্রামে। তিনি আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। শ্রীশ্রীমার দর্শনধন্য এবং স্বামী সারদানন্দজীর দীক্ষিত রাসবিহারী গোস্বামী ১৯৩৮ সালে ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পর তাঁর অপ্রকাশিত মাতৃস্মৃতিটি গত ৮ জুন ১৯৯৮ উদ্ধার করেছেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
—সম্পাদক

পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শনলাভের সুযোগ হয়েছিল বাগবাজারে। তখন আমি কলকাতায় থাকি। সংস্কৃত কলেজে পড়ি। আমার বন্ধু প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ও তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছিল। তার কাছেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর কথা শুনি। তার সঙ্গেই বাগবাজারে মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। দ্বিতীয়বার, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে দর্শনলাভের সুযোগ হয়েছিল জয়রামবাটীতে এবং সেই দর্শনেও আমার ডাক্তার-বন্ধু প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গী, সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে ছিল। সে-দর্শনের সঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে এবং সেটি আমার জীবনে ঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ কৃপা বলেই মনে করি।

সেবার দর্শন দুর্গাপূজার সময়। সাধারণত পূজার সময় বাইরে কোথাও থাকি না; বাইরে থাকতে ইচ্ছাও হয় না। পূজার কয়দিন সকালে গ্রামের দুর্গামণ্ডপে চণ্ডীপাঠে ব্যস্ত থাকতে হয়। গ্রাম ষোলআনার যেমন এতে আগ্রহ, আমি নিজেও এই কাজে ব্রতী হতে পেরে খুব খুশি হই। সেবছরও যথারীতি পূজার ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন পূজামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ

করি। সপ্তমী পূজার দিন সর্বক্ষণ পূজামণ্ডপে অতি ব্যস্ততায় থাকি। পূজা সারা হলে ঘরে ফিরি। সেই রাত্রে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখি। দেখি যে, গ্রামের দেবীপ্রতিমায় সন্ধিক্ষণের পূজায় পুরোহিতের আসনে বসে দেবীবন্দনায় নিয়োজিত হয়েছি। পূজা সেরে দেবীকে আরতি করতে উঠলাম। একে একে সমস্ত উপচার দিয়ে দেবীকে আরতি করলাম। সেই আরতির মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ হচ্ছিল। শেষে চামর দিয়ে দেবীকে আরতি করলাম; তখনো চামরব্যজনে রত, হঠাৎ কানে এক ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল; দর্শকদের মধ্যে কে যেন বলছেঃ "ও পণ্ডিতমশাই, দেবীকে বস্ত্র দিয়ে আরতি করলেন না? এ কী কাণ্ড!" আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এ কী মহাভ্রান্তি ঘটেছে! আমি আর স্মরণ করতে পারলাম না যে, বস্ত্র দিয়ে আরতি করেছিলাম কিনা। অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল। সে-রাত্রে আর ঘুমোতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, চণ্ডীপাঠে কি কিছু ত্রুটি হয়েছে? নইলে এমন স্বপ্নই বা কেন দেখলাম? এমন সময় মনে পড়ল বন্ধুবর প্রভাকরের কথা। কয়েকদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে সে বলেছিল যে, সে জয়রামবাটী গিয়েছিল মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করতে। সে বলেছিল, শরীর ভাল না থাকায় মা এবছর কলকাতা যাননি। পূজায় জয়রামবাটীতেই আছেন। আমার মনে হলো, আগামীকাল শুভ সন্ধিক্ষণের মহাপূজা। ঐ বিশেষ মুহূর্তে মাতাঠাকুরানীকে দর্শন করে যদি প্রণাম নিবেদন করি, তাহলে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভ্রান্তি ঘটলেও তার মাফ হয়ে যাবে। সন্ধিপূজায় মৃন্ময়ীমূর্তি দর্শন অপেক্ষা চিন্ময়ীমূর্তি দর্শনই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হতে লাগল।

সকালে উঠেই আরামবাগ যাত্রা করলাম। আমাদের বাড়ি আরামবাগের নিকটেই। প্রভাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালাম। সেই সঙ্গে আমার মাতৃদর্শনের অভিলাষও ব্যক্ত করলাম। মাতৃদর্শনে জয়রামবাটী যাত্রায় তাকে সঙ্গী হতে অনুরোধ জানালাম। সে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাল। কিছুক্ষণ পর আমি আরামবাগ থেকে মাতাঠাকুরানীর জন্য একটি লালপাড় শাড়ি, কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে

প্রভাকরের নিকট হাজির হলাম। তারপর দুজনে ঝুমঝুমি (দ্বারকেশ্বর) নদী পেরিয়ে কালীপুরে এসে একটি গোরুর গাড়ি ভাড়া করে জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা দিলাম। আমরা দুপুর দেড়টা-দুটো নাগাদ জয়রামবাটী পৌঁছালাম। জয়রামবাটীতে আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দ)। তিনি প্রভাকরের খুব পরিচিত। আমাদের হাতে নতুন কাপড়, ফল, মিষ্টি দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেনঃ "ভায়া, ভালই করেছ। আজ খুব ভাল দিন। শুভক্ষণেই এসেছ! সন্ধিপূজায় জীবন্ত মহামায়াকেই আরাধনা করবে।" এই বলেই তিনি আমাদের কাছ থেকে কাপড়, ফল ইত্যাদি নিয়ে রেখে এলেন। ফিরে এসে বললেনঃ "একটু ধৈর্য ধরো! সন্ধিপূজার আরও একটু বাকি। আমরা ঠিক সময় মায়ের চরণ বন্দনা করব।"

বরদা মহারাজের কথায় যারপরনাই খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। পরে মহারাজের কাছে জানতে পারলাম যে, জয়রামবাটীতে তখন কোনো দুর্গাপূজা হয় না। দুর্গাপূজা হয় জিবটা, শিহড়, কামারপুকুর, আনুড়, কোতুলপুরে। সেবছর জয়রামবাটীতে মায়ের সেবায় নিযুক্ত মহারাজদের ইচ্ছা হয়েছিল দুর্গাপূজার দিনগুলিতে মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার। কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) তাঁদের নিষেধ করেছিলেন, কারণ মায়ের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। সকলের অনুরোধে তিনি বলেছিলেন, সন্ধিপূজার মুহূর্তে মা-র পায়ে পদ্মফুল দিয়ে প্রণাম জানাতে। বরদা মহারাজের খুব সখ ছিল নানা উপচারে সন্ধিপূজার সময় মায়ের পূজা করার। সেইমতো তিনি পূজার সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মাকে সে-ব্যাপারে কিছু জানাননি।

সে-বছর সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত ছিল বিকাল তিন ঘটিকায়। সেবকগণ সুযোগ খুঁজছিলেন, কিভাবে তাঁরা মাকে ফাঁকা পাবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ। সারা দুপুর ধরে তাঁরা লাল ও সাদা পদ্ম তুলে এনে জমা করে রেখেছেন। কামারপুকুর থেকে মা-র পছন্দমতো মিষ্টি আনানো হয়েছে। চন্দন, বেলপাতা—সবই যোগাড় করা হয়েছে। আমের শাখা ও কলসও মহারাজ আনিয়েছেন। ছিল না কেবল একটি নতুন বস্ত্র। যাঁকে সে-দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখনও এসে পৌঁছাননি। কাপড়টি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছানোর জন্য তিনি খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। সেই কারণে আমাদের আগমন ও হাতে নতুন বস্ত্র দেখে তিনি খুবই উৎফুল্ল হলেন।

যাই হোক, সমস্ত ব্যাপার জেনে ভাবলাম, মাতাঠাকুরানী কৃপা করেই মহামুহূর্তে নিজের কাছে টেনে এনেছেন। সেই মহামুহূর্ত এসে গেল। মাতাঠাকুরানীর সেবকবৃন্দ ও আমরা মিলে সাত-আটজনের মতো ছিলাম। মাতাঠাকুরানী তাঁর ঘরের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। বরদা মহারাজ ফুলের ঝুড়ি নিয়ে আগে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে কিশোরী মহারাজ ও অন্যান্যরা। আমি শেষে ঢুকলাম। বরদা মহারাজ মাতাঠাকুরানীর সামনে ফুল, চন্দন, বেলপাতা, কাপড়, ফল, মিষ্টি দুটি থালায় সাজালেন। এক ব্রহ্মচারী প্রদীপ জ্বালালেন ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব দেখতে লাগলাম। মা-র ঘরটি মুহূর্তে যেন পূজামণ্ডপের রূপ নিল, আর তাঁর তক্তপোশ হয়ে উঠল দেবীর পূজাবেদি। সেখানে বসে রয়েছেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহামায়া! আমার কাপড়খানি নৈবেদ্যের থালায় দেখতে পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে হলো। এরপর বরদা মহারাজ কিশোরী মহারাজকে অনুরোধ করলেন মা-র চরণবন্দনা শুরু করতে। শুরু হলো লাল পদ্মফুল দিয়ে। একে একে আমরা সকলে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলাম। মাতাঠাকুরানী সহাস্যবদনে আমাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে আশীর্বাদ জানালেন। তখন তাঁর যে-মূর্তি দেখেছিলাম তা ভোলার নয়। তাঁকে তখন আর মানবী বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী মহামায়া ভাবসমাহিতা হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মহাভাব প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। মনে হলো, বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এ-দৃশ্য দর্শনের সুযোগ পেলাম। মাতাঠাকুরানীর মহাভাবের সেই স্মরণীয় মুহূর্তে সকল সেবক ও অন্যান্য ভক্তগণ দেবীবন্দনা শুরু করলেন।

স্তব ও প্রণাম সম্পূর্ণ হলে জগজ্জননী চোখ খুললেন এবং বললেন: "আরও ফুল আনো; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, হরিপ্রসন্ন, গঙ্গাধর, কালী, মাস্টারমশায়, যোগেন, গোলাপ—এদের নাম করে করে ফুল

দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেমেয়েরা যে যেখানে আছে, সকলের হয়ে ফুল দাও।"

তখন বরদা মহারাজ দুহাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে ফুল দিতে থাকলেন মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণে। তিনি হাতজোড় করে ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেনঃ "ঠাকুর, সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হোক। তুমি সকলকে দেখো!"

সেদিনের স্মৃতি এবং মাতাঠাকুরানীর সেই মূর্তি আমার মনে এখনও অমলিন। তাঁর কথাগুলি আমার কানে এখনও বাজছে। * ❑

সংগ্রহ ঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* উদ্বোধন, ১০৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৪০৭, পৃঃ ১৬৭-১৬৮

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়

লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ

১৯০৬ সালের কথা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার অধীন মহিষাদল রাজ স্কুলে তখন এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। ফাইনাল পরীক্ষার আগেই সেটলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পাই। চাকরির প্রথম কাজ ছিল পাঁশকুড়া থানার অধীন আলুগ্রাম মৌজায়। কথা ছিল সেখানকার কাজ শেষ হলে আমাদের টিম দাঁতন যাবে। সেই অনুসারে টিমের সঙ্গে দাঁতনে এসেছি। রাত্রিতে তাঁবুতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে আছি। একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম ঃ

দেখলাম ঠাকুর (আগেই ঠাকুরের কথা শুনেছিলাম। তাঁর ছবিও দেখেছিলাম।) আমার ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় ঘোমটা-দেওয়া একজন মহিলার পায়ে ফেলে দিলেন। ঘোমটা দেওয়া, কিন্তু মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাঁকে প্রণাম করে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, দেখলাম—ছবিতে দেখা মা জানকী! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, ঠাকুর বললেন ঃ "এই তোর মা।" স্বপ্নটি খুব স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। মায়ের পা এবং পায়ের আঙুলগুলি স্পষ্ট দেখেছিলাম। মায়ের ঘর, ঘরের আশেপাশে যা আছে তা-ও স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। মায়ের পায়ের একটি আঙুলে একটি তামার আংটি পরা ছিল। প্রণাম করার সময় ঐ আংটিতে আমার হাত লেগেছিল। মাকে যে-রূপে দেখেছিলাম সেটিই আমার ইষ্টমূর্তি। সেই চিন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেসময় তিনি আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সেসব কথা অতি গুহ্য কথা বলে এখানে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। স্বপ্ন ভাঙলে তাকিয়ে দেখি তখনো বেশ অন্ধকার। চারটে বাজতে মিনিট বিশেক বাকি। আর বিছানায় থাকতে ইচ্ছে হলো না। বিছানা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরে

বেরিয়ে পড়লাম। ফিরে এসে সামান্য জলযোগ করেই অফিসে গিয়ে আমার সেদিনের নির্ধারিত কাজ শেষ করে উপরওয়ালাকে কয়েকদিনের ছুটির জন্য আবেদন জানালাম। তাতে তিনি আমার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ "এই সবে কাজ শুরু হয়েছে, এখন ছুটি হবে না।" শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা দুটো নাগাদ যখন অফিসে গেছি, দেখছি সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা বলল, আমার সারা শরীর নাকি হলদে হয়ে গিয়েছে। আমার উপরওয়ালার কাছেও সেই খবর গেল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে দেখে তিনিও অবাক হয়ে বললেনঃ "ছেলেমানুষ, বাড়ির জন্যে মন খারাপ হয়ে তোমার শরীর এরকম হয়েছে। ঠিক আছে, তোমাকে কদিন ছুটি দিচ্ছি। তুমি এখন বাড়ি যাও।" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে সন্ধ্যার ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে আসি এবং এক হোমিওপ্যাথকে দেখাই। তিনি বলেন, জন্ডিস নয়, ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার ফলে লিভার সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আমাকে নাক্সভমিকা ২০০ দিলেন এবং কিভাবে কখন খেতে হবে তা বলে দিলেন। বললেন, দু-এক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। দু-চার দিনে সত্যিই ঠিক হয়ে গেলও।

এদিকে আমি স্বপ্নদৃষ্ট জায়গাটি সম্পর্কে নানাভাবে খোঁজ নিয়ে চলেছি। কিন্তু কোনভাবেই কোন খোঁজ না পেয়ে একদিন তমলুক থেকে স্টীমারে ঘাটাল আসি। ঐ সময়ে তমলুক থেকে ঘাটাল স্টীমার চলত। ঘাটালে নেমে লোকেদের কাছে কিছু খোঁজখবর করলাম। একজন আমাকে বললেনঃ "কামারপুকুরে যান। সেখানে গেলে আপনি খোঁজ পেতে পারেন।" শুনেই আমি হাঁটতে শুরু করলাম। রাত আটটা নাগাদ একটি গ্রামে এসে একটি দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। দোকানদার তখন দোকান বন্ধ করছিল। আমি তাকে এখানে রাত্রিতে থাকবার একটু জায়গা এবং খাবার কোথাও পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার জানালঃ "না।" ঠিক সেই সময় পিছনের ঘর থেকে একজন বয়স্ক

ভদ্রমহিলা এসে বললেনঃ "খাবার পাওয়া যাবে এবং রাত্রিতে থাকার জায়গাও হবে।" বয়স্ক ভদ্রমহিলা সম্ভবত দোকানদারের মা। তিনি আমাকে বাড়ির ভিতরে আসতে বললেন এবং গরম লুচি এবং তরকারি খাওয়ালেন। পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং হাঁটতে হাঁটতে বেলা বারোটা নাগাদ কামারপুকুরে এসে পৌঁছাই। লোকেদের জিজ্ঞেস করায় তারা আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে দেয় এবং সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে বলে। বাড়ির সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকে আমার স্বপ্নের বৃত্তান্তের কিছুটা অংশ জানালে তিনি বললেনঃ "ঠিক জায়গাতেই এসেছ। এখন স্নান করে খাওয়াদাওয়া কর, বিকালে খুড়ি-মার কাছে যাবে।" 'খুড়ি-মা' কে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেনঃ "আমার খুড়ি। আমি ঠাকুরের ভাইপো।" তখন বুঝলাম উনি হচ্ছেন ঠাকুরের ভাইপো রামলাল-দাদা এবং 'খুড়ি-মা' মানে ঠাকুরের স্ত্রী—সারদাদেবী! তা হলে, ঠাকুর আমাকে তাঁর পায়েই ফেলে দিয়েছিলেন স্বপ্নে? তিনিই আমার স্বপ্নে দেখা ইষ্টমূর্তি!

খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম। হালদার পুকুরে স্নান সেরে রামলাল-দাদার বাড়িতে খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ি। বেলা তিনটে নাগাদ রামলাল-দাদা আমাকে ডেকে তোলেন এবং বলেনঃ "আমি শিহড় যাচ্ছি। জয়রামবাটীর পাশ দিয়ে শিহড়ে যাওয়ার রাস্তা। যাওয়ার পথে তোমাকে জয়রামবাটীর রাস্তা দেখিয়ে দেব।" বিকেল চারটে নাগাদ রামলাল-দাদার সঙ্গে বের হলাম। কিছু পথ যাওয়ার পর রামলাল-দাদা আমাকে জয়রামবাটীর রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার আগেই জয়রামবাটীতে ঢুকলাম। কিছুটা যেতেই স্বপ্নে দেখা সেই মাটির ঘর, খড়ের চাল দেখতে পেলাম। খুব আনন্দ হলো। এক ফাঁকে একটি ঘরের ভিতরে চোখ পড়ল। স্বপ্নে দেখেছিলাম মায়ের ঘরের এক কোণে অনেক আলু ঢালা আছে। এখানে তা-ও দেখলাম। কিন্তু স্বপ্নে দেখা সেই মাতৃমূর্তি কোথায়? মায়ের বাড়িতে (মায়ের পুরনো বাড়ি) ঢুকে দেখলাম তিনজন লোক বারান্দায় বসে। পরে জানলাম, তাঁরা মায়ের তিন ভাই। তাঁদের সঙ্গে আলাপ

পরিচয় হলো। একসময় খাওয়ার ডাক এল। মামাদের সঙ্গে খেতে বসলাম। যিনি পরিবেশন করছিলেন তিনি আমার নাম ধরে ডেকে মাছ খেতে বললেন। আমার নাম ধরে ডাকায় অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্বপ্নে দেখা সেই মুখ! আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পাতে হাত রয়েছে, কিন্তু হাত মুখে দেব কী, আমি শুধু অবাক হয়ে স্বপ্নে দেখা সেই মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি। মা বললেনঃ "কি হলো বাবা, খাও।" সেসময় আমি কিছুদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। মাছে গন্ধ লাগত, খেতে পারতাম না। পাতে মা যে মাছ পরিবেশন করেছেন, সেটি মাছের টক। ছোট কুচো চিংড়ি, বড়ি ও মুলোর গাঢ় টক। "মাছ খাও" মা আবার বলাতে মাছে হাত দিয়ে সামান্য মুখে দিয়েছি, মনে হলো যেন অমৃত! সমস্ত টকটুকুই খেয়ে ফেললাম। তখনো আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। ভাবছি, মা কি করে আমার নাম জানলেন! যে-মাছ খেতে আমার ঘেন্না লাগত, সেই মাছের স্বাদ এমন অমৃতস্বাদ হয়ে উঠল কেমন করে?

যাই হোক, মুখ-হাত ধুয়ে মামাদের কাছে বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। কৌতূহলের বশে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলামঃ "পরিবেশন করছিলেন যিনি, তিনি কে?" মামারা বললেনঃ "তিনিই 'মা'—আমাদের দিদি।" মামাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় কাছে এসে আমার নাম ধরে ডেকে মা বললেনঃ "এই দুধটুকু খেয়ে নাও।" দেখলাম তাঁর হাতে জামবাটি ভর্তি দুধ। আমি নিতে ইতস্তত করছি দেখে মা বললেনঃ "আজ দুধ বেশি নেই। সকলের হবে না। তুমি খাও।" দুধ খাওয়া শেষ হলে বললেনঃ "এখন মাড়েতে গিয়ে শোবে।" 'মাড়' অর্থাৎ সিংহবাহিনীর মন্দিরের আটচালা। মামাদের মধ্যে একজন সিংহবাহিনীর আটচালা আমাকে দেখিয়ে দিলেন। ফিরে আসার সময় বলে দিলেন পরদিন সকাল আটটার মধ্যে যেন জলখাবার খাওয়ার জন্য মায়ের বাড়িতে চলে আসি।

রাত্রে খুব ভাল ঘুমোলাম। ভোরে উঠে প্রাতকৃত্যাদি সেরে আটটার

আগেই মায়ের বাড়িতে পৌঁছালাম। আটটা নাগাদ মামাদের সঙ্গে জলখাবার খেয়ে বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছি। নটা নাগাদ মামারা কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি মায়ের কাছে গিয়ে বসলাম। মা বারান্দার একপাশে বসে কুটনো কুটছিলেন। মাথায় ঘোমটা ছিল না। মাকে প্রণাম করে উঠতে মা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমার বাড়ি কোথায়?" আমি বললামঃ "তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানার কুমারসাড়া গ্রামে।" মা বললেনঃ "না, তুমি জান না, তোমাদের আদিবাড়ি মুর্শিদাবাদ। তোমাদের আদিপুরুষ গদাধর সিংহ। তিনি জমিদার ছিলেন।"[১] পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই রাস্তায় মেজমামার (কালীমামা) সঙ্গে দেখা। তিনি বললেনঃ "দিদি বলে দিয়েছে কিছু না খেয়ে স্নান করে সঙ্গে কিছু ফুল নিয়ে দিদির কাছে যেতে।" মামার কথামতো মায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখি মা পুজো করছেন। ঘরে একটি আসন পাতা। আমাকে ইঙ্গিতে সেই আসনে বসতে বললেন। পুজো শেষ হলে আমার গায়ে গঙ্গাজলের ছিটে দিলেন এবং ফুলগুলিতেও গঙ্গাজলের ছিটে দিলেন। তারপর আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন। স্বপ্নে যে-মন্ত্র পেয়েছিলাম, সেই মন্ত্র! মন আনন্দে ভরে গেল। দীক্ষার পর তাঁর সামনেই কিছুক্ষণ জপ করতে বললেন। জপ শেষ হলে আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন এবং বললেনঃ "মন্ত্র আমি দিলাম বটে, কিন্তু গুরু আমি নই। তোমার গুরু ঠাকুর, ইষ্টও তিনি।" যে ফুলগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি মার পায়ে দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেনঃ "ভক্তিলাভ হোক।" তারিখটি মনে নেই, তবে সেটি ছিল ১৯০৬ সালের মাঘ মাসের ভৈমী একাদশী তিথি। সেদিন আমার আগে আর একজনকে মা মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন। তাঁর নাম সিন্ধুনাথ পাণ্ডা।

---

১) বিষয়টি সম্বন্ধে আমি আগে কিছু জানতাম না। মায়ের কাছে শুনে তখন তাই অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বাড়িতে এসে বাবার কাছে শুনেছিলাম মা যা বলেছেন সেটাই ঠিক। আমাদের পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন ছিল মুর্শিদাবাদে এবং আমাদের আদিপুরুষের নাম গদাধর সিংহ।

পরদিন বাড়ি যাওয়ার কথা মাকে জানালে মা বললেনঃ "তোমার শরীরটা ভাল নয়। আরও দিনকয়েক এখানে থাক।" তিন-চার দিন পর আবার বাড়ি ফেরার কথা বলতে মা কোয়ালপাড়া হয়ে বিষ্ণুপুর যাওয়ার কথা বললেন। কোয়ালপাড়ায় কেদার মহারাজকে চিঠি লিখে দিলেন দু-একদিন আমাকে কোয়ালপাড়ায় রাখতে এবং সেখান থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে।

মায়ের স্নেহ, ভালবাসা, আদর-যত্নের কোন তুলনা হয় না। নিজের গর্ভধারিণীর অকালমৃত্যুতে তাঁর স্নেহ পাওয়া ভাগ্যে ঘটেনি। গর্ভধারিণীর স্নেহ কেমন তা বোঝার অভিজ্ঞতাও আমার হয়নি। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যে ভালবাসা ও স্নেহের আস্বাদ পেয়েছিলাম তাতে আমার দেহ-প্রাণ-মন ভরে গিয়েছিল। আজও সেই স্নেহ-ভালবাসায় ভরপুর হয়ে আছি। জয়রামবাটী থেকে বিদায়ের দিন প্রণাম করে রুদ্ধকণ্ঠে যখন বললামঃ "মা, কিভাবে জীবন কাটাব?" মা বললেনঃ "যেমনটি আছ সেভাবেই থাকবে। কোন ভয় নেই বাবা, আমি মা থাকতে ভয় কি? আমি তোমাদের চিরকালের মা। রোজ 'কথামৃত' পড়বে। সেখানেই কেমনভাবে জীবন কাটাবে তার সব উত্তর পাবে।" আমি বললামঃ "কথামৃত কি?" মা বললেনঃ "ঠাকুরের কথা। মাস্টারের লেখা।" আমি বললামঃ "মাস্টার কে?" মা বললেনঃ "ঠাকুরের এক গৃহী ছেলে—হেডমাস্টার। কলকাতায় থাকে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এখন পর্যন্ত 'কথামৃত'-এর দুই খণ্ড বেরিয়েছে, আরো কয়েক খণ্ড বের হবে। কলকাতায় যাবে, মাস্টারের সঙ্গ করবে। বেলুড়ে যাবে, সেখানে মঠে ঠাকুরের ছেলেরা রয়েছে, তাদের সঙ্গ করবে। রাখাল এবং বাবুরামের সঙ্গ করবে।" রাখাল এবং বাবুরাম কে, জিজ্ঞাসা করায় মা বললেনঃ "রাখাল হলো মঠের অধ্যক্ষ, ঠাকুরের মানসপুত্র। বাবুরাম ঠাকুরের আরেক ত্যাগী ছেলে, মঠের মা—প্রেমের মূর্তি। ওদের দর্শন করলে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" বাড়ি ফিরে এসে মায়ের কথা সেভাবে কাউকে বলিনি, তবে একজন আত্মীয়কে বলায় তিনি মাকে দর্শন করতে

জয়রামবাটী যান এবং মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯১১ সালে কোয়ালপাড়ায় তিনি মঠে যোগ দেন। ১৯১৬ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তাঁর সন্ন্যাস হয়, নাম হয়—স্বামী ধর্মানন্দ।

যাই হোক, যা বলছিলাম। বিদায়ের সময় মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আমার চোখ দিয়েও জল পড়ছিল। মা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন। কিছুদূর আসার পরে আমি মাকে বললামঃ "মা, আপনি আর আসবেন না।" আমি পুনরায় মাকে প্রণাম করে কোয়ালপাড়ার পথে রওনা হলাম। মা তখন হাপুস নয়নে কাঁদছেন। করুণা যেন চোখের জল হয়ে ঝরছে। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখি মা তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝতে পারছিলাম, মা তখনো কেঁদে চলেছেন। আরও বেশ কিছুটা আসার পরে আবার পিছন ফিরে দেখি মা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবছা দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সেই দৃশ্য ভুলবার নয়। এখনো ভুলতে পারিনি।

দিনকয়েক পর বেলুড় মঠে রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করে মায়ের কথা জানালে তাঁরা খুবই খুশি হন এবং বলেনঃ "তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে—নিজেদের লোক। দিনকতক মঠবাস কর।" রাজা মহারাজের খুবই কৃপা পেয়েছিলাম ঐ সময়। অধিকাংশ সময় তাঁকে অন্তর্মুখীন দেখতাম। বসে আছেন, কিন্তু মন যেন কোন্ অনন্তের রাজ্যে হারিয়ে গেছে। সাধু-ব্রহ্মচারী-ভক্তরা তাঁর পদপ্রান্তে বসে থাকতেন। কারো মুখে কোন কথা নেই, কিন্তু সকলের মন এক পবিত্র আনন্দে পূর্ণ হয়ে আছে। তাঁর কৃপায় ঐ সময়ে যে-ক'দিন মঠবাস করেছি সে-ক'দিন আমারও ঐসব মুহূর্তে তাঁর পদপ্রান্তে বসার সৌভাগ্য হয়েছে। সে যে কী দিব্যানন্দ তা মুখে বলা যায় না। তাঁর সামান্য সেবার সৌভাগ্যও তিনি দয়া করে আমাকে দিয়েছিলেন।

বাবুরাম মহারাজেরও খুব ভালবাসা পেয়েছি। তাঁর ভালবাসা একবার যে পেয়েছে সে কখনো তা ভুলতে পারবে না। এই পৃথিবীর ভালবাসা তা নয়, স্বর্গীয় ভালবাসা, যে-ভালবাসার আস্বাদ মায়ের কাছে

থেকে বুঝেছিলাম। বাবুরাম মহারাজের ভালবাসা সত্যিই অসাধারণ, কিন্তু মায়ের ভালবাসা অসাধারণের চেয়েও অসাধারণ। বাবুরাম মহারাজের ঠাকুরপুজো একটা দেখবার জিনিস ছিল। তাঁর গায়ের রঙ ছিল চাঁপা ফুলের মতো। হাতের চেটো এবং পায়ের তলা ছিল হালকা গোলাপী রঙের। দু-তিনদিন মঠে থাকার পর যখন বাড়ি ফেরার কথা বললাম, বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ "এই তো এলি, এখন কিছুদিন থাক না।" চার-পাঁচদিন পরে আবার যখন বললাম, তখন আবারও ঐ কথা। এইভাবে বেশ কিছুদিন মঠবাস হয়ে গেল। সেই সময় ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব পড়েছিল। বাবুরাম মহারাজ আমাকে উৎসবে মিষ্টির ভাঁড়ারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উৎসবের দিন ভাত, লুচি, খিচুড়ি, সবজি, মিষ্টি প্রসাদের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল।

দীক্ষার পর মাকে বেশ কয়েকবার দর্শন করেছি। যতবার তাঁকে দেখেছি ততবারই তাঁর কাছে যাওয়ার আগে ভেবেছি, তিনি দেবী—জগজ্জননী, মানবী নন। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে গেছি তখন তাঁকে 'মা' ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। সেসময় জয়রামবাটী যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল, তবুও মাকে দর্শনের জন্য প্রাণটা এমন ব্যাকুল হতো যে, বছরে অন্তত তিনবার জয়রামবাটী যেতাম। যাওয়ার সময় মোহিনী মিলের একজোড়া নরুন-পাড় ধুতি, কিছু ফল এবং সামান্য মিষ্টি সঙ্গে নিতাম। প্রণাম করার সময় ওগুলি দিয়ে কখনো দু-টাকা কখনো বা চারটাকা প্রণামী দিতাম। একবার প্রণাম করার সময় মনে মনে ভাবছিলাম, আমি যে-ধুতি মাকে দিই তা কি আর মা পরেন, হয়তো অপরকে দিয়ে দেন। প্রণাম করে উঠতেই মা বললেনঃ "স্নান করে এস, বাবা।" স্নান করে এসে পুনরায় মাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলাম মা একটি নতুন ধুতি পরে বসে আছেন। প্রণাম করে উঠলে মা সস্নেহে বললেনঃ "এই দেখ বাবা, তোমার আনা ধুতি পরেছি কিনা।" আমি মায়ের পরা ধুতিটি হাত দিয়ে কিছু সময় ধরে দেখে বললামঃ "হ্যাঁ মা, এই ধুতিই আমি এনেছি।" বলতে বলতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। মা সস্নেহে বললেনঃ "বাবা, তোমাদের

দেওয়া ধুতিই তো আমি ব্যবহার করি।" আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কাকে প্রণাম করছি আমি! ইনি তো সত্যিই সাক্ষাৎ অন্তর্যামিণী জগজ্জননী! যে-ক'দিন জয়রামবাটী ছিলাম রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে মা নিজের হাতে দুটি পান দিতেন। একটি তখনই খেতাম, অপরটি বিশ্রাম করে হাত-মুখ ধুয়ে খেতাম। একদিন দ্বিতীয় পানটি খাচ্ছি, এমন সময় ভিতরের ঘর থেকে মা আমাকে ডাকলেন। মায়ের ডাক শুনে ভাবছিলাম মুখের পানটি ফেলে মায়ের কাছে যাব। সঙ্গে সঙ্গে মা বললেনঃ "পান শুদ্ধ জিনিস, খেতে খেতেই এস।" এভাবেই মা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। বুঝতাম তিনি দেবী, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা ভুলে যেতাম এবং তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে কখনো কোন সঙ্কোচ হতো না। এখন বুঝি, তিনি দয়া করে আমার সঙ্গে অমন সহজ ব্যবহার করতেন। আমিও যে করতে পারতাম, সেটিও তাঁর দয়া।

কয়েকবার বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তেও মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। সেখানে শরৎ মহারাজ স্বয়ং মায়ের দেখাশুনা করতেন, এছাড়া মায়ের সেবক এবং সেবিকারাও ছিলেন। ফলে সেখানে দর্শন ও আলাপাদির অনেক বিধি-নিষেধ থাকত। যখন তখন গিয়ে জয়রামবাটীর মতো মাকে দর্শনের এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ সেখানে ছিল না। উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করে আসার সময় মা বলতেনঃ "বলরাম মন্দিরে রাখাল আছে, লাটু আছে। ওদের প্রণাম করে যেও। গিরিশবাবুকেও প্রণাম করে যেও।" কখনো কখনো বলতেন মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে যেতে। গিরিশবাবু অত্যন্ত দরাজ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে গেলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। তাঁর বাড়িতে খাওয়ার সময় দেখেছি, কমপক্ষে দু-তিন রকমের মাছ থাকত। তাঁদের ভালবাসা ছিল প্রাণের ভালবাসা। এই ভালবাসার আলাদা ঘরানা—'রামকৃষ্ণ-সারদা ঘরানা'। যেমন বাবুরাম মহারাজের, তেমনি গিরিশবাবুর, তেমনি মাস্টার মশাইয়ের, তেমনি বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবুর। 'মায়ের বাড়ী'তে তো প্রসাদ না পেয়ে আসার কোন উপায় ছিল না। বলরাম

মন্দিরে গেলেও একই ব্যাপার, গিরিশবাবুর কাছে গেলেও তিনি না খাইয়ে ছাড়তেন না।

একবার উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করে প্রণামী, ফল-মিষ্টি ও ধুতিজোড়া দিলে মা বললেনঃ "তুমি তো সবই এখানে দাও, শরৎকে কিছু দাও কি?" উত্তরে 'না' বলায় মা বলেছিলেনঃ "এখানে একটু কিছু দিলেই হবে, কিন্তু শরৎকে কিছু দেবে।" তারপর থেকে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করে দশটাকা প্রণামী দিতাম। মাকে প্রণামী দিতাম দু-টাকা, কখনো বা চারটাকা, তার বেশি কখনো দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। শরৎ মহারাজের স্নেহ পাওয়ার সৌভাগ্য মায়ের সূবাদেই হয়েছিল। তাঁকে যত দেখেছি তত মুগ্ধ হয়েছি। আর, তাঁর হৃদয়ের কথা কি বলব! তাঁর ব্যবহারের মধ্যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবসময় অনুভব করেছি। মনে হতো—'বাবা, যেন হিমালয়! সামনে যায় কার সাধ্যি!' কিন্তু সাহস করে গেলেই মনে হতো বড় আপনার জন। বাবার মতো। বস্তুত, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল একাধারে কঠোর এবং কোমল। মায়ের শেষ অসুখের সময় যখন ভক্তদের জন্যে তাঁর কঠিন আদেশ ছিল 'মাকে নিচ থেকেই প্রণাম করা'র, সেসময় ভক্তেরা সব চলে গেলে শরৎ মহারাজ আমাকে সস্নেহে বলতেনঃ "ওপরে গিয়ে মাকে দূর থেকে প্রণাম করে এস, কিন্তু একটিও কথা বলবে না মায়ের সঙ্গে।" ঐ সময়েও যতবার গেছি শরৎ মহারাজ কোন বারই প্রসাদ না নিয়ে আসতে দেননি। একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে শরৎ মহারাজের নির্দেশমতো মাকে ওপরে প্রণাম করতে গেছি। দেখি মা মেঝেতে বিছানায় শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। দূর থেকে প্রণাম করে উঠে দেখছি, মায়ের দৃষ্টি আমার দিকে। তাঁর চোখে অপার করুণার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি আজও ভুলতে পারিনি। আমি কোন কথা বলিনি, মা-ও কোন কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর ঐ করুণাদৃষ্টিই বলে দিচ্ছিল আমার জন্যে মা দিচ্ছেন চিরকালের জন্য অভয় আশ্বাস। সেই দর্শনই স্থূল শরীরে মাকে আমার শেষ দর্শন এবং সেই প্রণামই স্থূল শরীরে মাকে আমার শেষ প্রণাম। সেই রাত্রিতেই মা দেহরক্ষা করেছিলেন। সেদিন দুপুরেও মাকে

দর্শনের পর শরৎ মহারাজের আদেশে প্রসাদ পেয়েছিলাম। শেষ অসুখের সময় ভুগে ভুগে মায়ের গায়ের রঙ মলিন হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে মহাসমাধিতে শায়িত মায়ের চরণে প্রণাম করার সময় ফুলে ফুলে ঢাকা মায়ের ভাগবতী তনু দর্শন করলাম। মুখখানি ছিল অনাবৃত, দেখলাম মায়ের অসুখে-ভোগা মলিন বর্ণ আগের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'উজ্জ্বল' বললে কম বলা হলো। মায়ের মুখ যেন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। একদিন আগে দেখা সেই মলিন বর্ণ কেমন করে এমন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল?—চোখের জলে ভাসতে ভাসতে একথাই শুধু ভাবছিলাম।

একবার জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। সেদিন বর্ধমান থেকে এক ভক্ত একটি রসগোল্লা এনেছিলেন। ওজন ১৫ সেরের মতো হবে। সকলে দেখে অবাক। ভক্তটি বলছিলেনঃ "ময়রাকে বলেছিলাম আধমণের একটি রসগোল্লা করতে, কিন্তু ময়রা এর চেয়ে বড় আর করতে পারেনি। না পারলেও তাকে দু-টাকা বকশিশ দিয়েছি। মা ঐ রসগোল্লা ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সকলকে ভেঙে ভেঙে প্রসাদ দিয়েছিলেন। এক-একজনের ভাগে এক পোয়ার মতো পড়েছিল।

১৯১০ সালে আমার বিবাহ হয়। আমার শ্বশুরমশাই গরিব ছিলেন। তাঁর বোনের বাড়ির অবস্থা ছিল মোটামুটি ভাল। সেই বোন অর্থাৎ আমার স্ত্রীর পিসিমা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলেন। তিনি এর আগে একাধিকবার মাকে দর্শন করেছেন। বিবাহের বছর দুয়েক পর একদিন তাঁকে বললাম, পরদিন ভোরে বাগবাজারে মাকে দর্শন করতে যাব। তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ে যখন বাগবাজারের উদ্দেশে রওনা হব তখন দেখলাম আমার স্ত্রীকেও (নগেনবালা) তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। আমি আপত্তি জানালে তিনি বললেনঃ "না, ও-ও সঙ্গে চলুক। মাকে দর্শন করবে।" আমি আর কিছু বললাম না। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছে নিচের ঘরে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করলাম। শরৎ মহারাজ আমার স্ত্রীর পরিচয় জেনে

বললেনঃ "বউমাকে নিয়ে ওপরে যাও।" আমার স্ত্রী আগে ছিলেন, তাঁর পিছনে ছিলেন তাঁর পিসিমা। আমি ছিলাম সকলের শেষে। ওপরে উঠতেই প্রথমে মায়ের সঙ্গে দেখা। মা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "বউমা, কার সঙ্গে এলে?" পিসিমা ও আমি তখনও সেখানে পৌঁছাইনি। মায়ের পাশেই গোলাপ-মা ছিলেন। তিনি হেসে বললেনঃ "ও কি করে বলবে কার সঙ্গে এসেছে?" এমন সময় মা বললেনঃ "ছেলের সঙ্গে বুঝি?" কিন্তু তখনো মা আমাকে দেখেননি। মায়ের কথা শেষ হওয়ার পর আমরা দুজন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমার স্ত্রীকে মা সেই প্রথম দেখলেন, কিন্তু তখনই তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যেন কতদিনের জানাশোনা। আমি মাকে প্রণাম করে নিচে চলে গেলাম। তারপরে মায়ের সঙ্গে তাঁদের কি কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি পিসিমা এবং স্ত্রীর কাছে পরে শুনেছি। তাঁদের কাছে শুনেছিলাম, কিছুক্ষণ আলাপের পর মা আমার স্ত্রীকে বললেনঃ "বউমা, আমি আজকে গঙ্গাস্নানে যাব না। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। যোগীন (যোগীন-মা) গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে, তোমরা (আমার স্ত্রী এবং তার পিসিমা) ওর সঙ্গে যাও।" যোগীন-মার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পিসিমা গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গাস্নানের পর পিসিমা আমার স্ত্রীকে বললেন যোগীন-মাকে প্রণাম করতে। তাতে যোগীন-মা অসন্তুষ্ট হয়ে পিসিমাকে বলেনঃ "সামনে গঙ্গা; ও ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমার তো বয়স হয়েছে! তুমি কি করে একথা বললে?" তখন পিসিমা আগে গঙ্গাকে প্রণাম করে পরে যোগীন-মাকে প্রণাম করলেন এবং আমার স্ত্রীকেও তাই করতে বললেন।

গঙ্গাস্নান সেরে 'মায়ের বাড়ী' ফিরলে গোলাপ-মা আমার স্ত্রীকে বললেনঃ "মা ঠাকুরঘরে আছেন, তোমাকে ভিতরে যেতে বলেছেন। যাও।" আমার স্ত্রী দেখলেন ঠাকুরঘরের দরজা ভেজানো। দরজাটি একটু খুলতেই দেখলেন মা পুজো করছেন। আমার স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে মায়ের পুজো দেখতে থাকলেন। তাঁর কাছে পরে শুনেছিলাম, মায়ের পূজারতা মূর্তি অপূর্ব। কিছুক্ষণ পর মায়ের দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে। মা ইঙ্গিতে আমার

স্ত্রীকে ডাকলেন এবং মায়ের পাশে রাখা একটি আসনে বসতে বললেন। পুজো শেষ করে মা আমার স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। আমার স্ত্রী দীক্ষার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বস্তুত, দীক্ষা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু মা এমন সহজভাবে সবকিছু করলেন যে, আমার স্ত্রীর কোন অসুবিধেই হলো না। দীক্ষার পর ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে মা বলেছিলেনঃ "উনিই গুরু, উনিই ইষ্ট। আমি গুরু নই, আমি শুধু তোমাদের মা।" তারপর তিনি যেমন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেভাবে কিছুক্ষণ আসনে বসেই জপ করতে বললেন। সেই সঙ্গে বললেন, জপের সময় হাতের আঙুলগুলি যেন পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, একটুও যেন ফাঁক না থাকে। জপ শেষ হলে নিজের আঁচলে-বাঁধা একটি রুপোর টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে বলেন। দীক্ষাপর্ব শেষ হলে মা ঠাকুরের প্রসাদ পাতার ঠোঙায় নিজেই ভাগ করে রাখছিলেন এবং আমার স্ত্রীকে সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে বললেন। দুপুরে যোগীন-মা, গোলাপ-মা ছাড়া মায়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী ও তাঁর পিসিমা। আমার স্ত্রীকে মা তাঁর নিজের পাশে বসিয়েছিলেন এবং একটু প্রসাদ নিজের মুখে স্পর্শ করে আমার স্ত্রীর পাতে দিয়েছিলেন। খাওয়ার পর মুখ-হাত ধুয়ে মা একটু বসেছেন, এমন সময় বাড়ির পাশ দিয়ে চুড়িওয়ালা 'রেশমী চুড়ি নেবে গো' বলে হাঁক দিলে মা রাধুদিকে চুড়িওয়ালাকে ডাকতে বললেন। চুড়িওয়ালা এলে মা রাধুদি এবং আমার স্ত্রী—দুজনের দুই হাতে চারগাছা চারগাছা করে আটগাছা করে চুড়ি পরিয়ে দিতে বললেন। চুড়ির রঙ মা নিজেই পছন্দ করে দিয়েছিলেন। চুড়ি পরানো হলে পিসিমা দুজনের চুড়ির দাম দিতে গেলে মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেনঃ "না, রাধু আর বউমা পরেছে, চুড়ির দাম আমিই দেব।" মা-ই চুড়ির দাম মিটিয়ে দিলেন। রাধুদির তখন বিবাহ হয়েছে। আমার স্ত্রীর চুড়িপরা হাত দেখে মা খুব খুশি হলেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করতে বললেন। আমার স্ত্রী ঠাকুরকে প্রণাম করে মা, গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং তাঁর পিসিমাকে

প্রণাম করলেন। ঘটনাটি ১৯১২ সালের। আমার স্ত্রীর বয়স তখন বারো বছর।

সেদিন বিশ্রামের পর মা ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। মাথার চুলগুলি খুলে শুকোচ্ছিলেন। আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন তাঁর চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে দিতে। মাকে দেখার প্রথম দিনেই দীক্ষা পাওয়ার এবং মাকে সেবা করার পরম সৌভাগ্যলাভ তাঁর হয়েছিল। সেদিন বিকেলে যখন আমরা ফিরে আসছি, মা সিঁড়ি পর্যন্ত আমার স্ত্রী এবং তাঁর পিসিমার সঙ্গে এসেছিলেন। আমরা সবাই শরৎ মহারাজকে প্রণাম করে যখন রাস্তায় নেমেছি, তখন দেখি মা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

বেশ কিছুদিন পর আমি জয়রামবাটী গেছি। মাকে প্রণাম করা মাত্র মা বললেনঃ "বাবা, কোনদিন যদি মন্ত্র ভুলে যাও, বউমাকে জিজ্ঞেস কোরো।" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলামঃ "মা, মন্ত্র ভুলে যাব, এমন হবে নাকি?" মা বললেনঃ "না, ভুলবে না। তবু যদি মনে কোন সংশয় আসে তাহলে বউমাকে জিজ্ঞেস করে নিও।" মায়ের দেহরক্ষার প্রায় দুবছর পর হঠাৎ আমার মনে মন্ত্র নিয়ে একটি সংশয় আসে। তখন মায়ের কথা মনে পড়ল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র সংশয়ের সমাধানও হয়ে গেল। তখন বুঝলাম, মা জানতেন ভবিষ্যতে আমার মনে মন্ত্র সম্পর্কে একটি সংশয় আসবে, কিন্তু তখন মা পৃথিবীতে থাকবেন না। কিন্তু সংশয়ের সমাধানের জন্য আমাকে বাইরে কোথাও যেতে হবে না—তার ব্যবস্থাও অন্তর্যামিণী মা স্বয়ং করে রেখেছিলেন।

উদ্বোধনে মাকে দর্শন করতে গেলে তাঁর জন্য শুশনি শাক, গিমা শাক এবং আমরুল শাক যোগাড় করে কলাপাতায় বেঁধে নিয়ে যেতাম। সঙ্গে বাড়িতে তৈরি বড়ি এবং আচারও নিয়ে যেতাম। মায়ের সেবিকাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ বড়ি দেখে 'বেশি সাদা নয়' বলায় মা বলেছিলেনঃ "তা না হোক, এসব গাঁয়ের বাড়িতে তৈরি জিনিস। এর স্বাদই আলাদা। এমন বড়িই ঠাকুর পছন্দ করতেন। এগুলি ঠাকুরের ভোগে সুক্তোয় দিতে

বলব।" শুনে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ল। যখন বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, তিনি তো কেঁদেই আকুল। তাঁর হাতে তৈরি জিনিস শুধু মা পছন্দ-ই করেননি, মা বলেছেন তা ঠাকুরেরও পছন্দের জিনিস। যখন পরে এ-কথা ভেবেছি অথবা আমরা দুজনে আলোচনা করেছি তখন মায়ের কৃপার কথা ভেবে দুজনেই চোখের জলে ভেসেছি। যখনই মাকে প্রণাম করতে গিয়েছি, মা জিজ্ঞেস করতেনঃ "বউমা কেমন আছে? তাকে কেন সঙ্গে আননি।" বাড়িতে গিয়ে যখন স্ত্রীকে বলতাম, তিনি শুনে কাঁদতেন আর বলতেনঃ "দেখেছ, মা আমায় ভোলেননি!" এর পরে দু-একবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারে মাকে দর্শন করেছিলাম।

মায়ের দেহরক্ষার পর যখনই উদ্বোধনে গেছি, শরৎ মহারাজকে প্রণাম করা মাত্র সেই আগের মতোই বলতেনঃ "যাও, ওপরে যাও, মাকে প্রণাম করে এস!" প্রণাম করতে যেতাম, বুকটা কেমন হু হু করত। কিন্তু যখন মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে মায়ের ছবিকে প্রণাম করতাম, তখন পুরনো দিনের কথা মনে পড়ত, আর সত্যি সত্যি মনে হতো মা যেন আগের মতোই ওখানে বসে আছেন। আমাদের ছেড়ে কোথাও যাননি। এখনো যখন যাই, সেই একই অনুভূতি হয়। মা আছেন, মা ছিলেন এবং মা থাকবেন চিরকাল!* ❑

* এই স্মৃতিকথাটি লেখকের পুত্র জহরলাল সিংহের (প্রযত্নে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড) সৌজন্যে পাওয়া গেছে।—সম্পাদক

'পিসিমা'র স্মৃতি

লালমোহন দাস (লালু জেলে)

সাতবেড়িয়া বা সাতবেড়ের লালমোহন দাস বা 'লালু জেলে'-র প্রসঙ্গ 'শ্রীমা সারদা দেবী' (স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৬) এবং 'মাতৃসান্নিধ্যে' (স্বামী ঈশানানন্দ প্রণীত, ১৩৯৮, পৃঃ ৫২-৫৩) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জয়রামবাটী থেকে সাতবেড়ের দূরত্ব ৪ কিলোমিটারের মতো। শ্রীশ্রীমার স্নেহধন্য 'লালু' প্রয়াত হন ১৯৪০ সালে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। লালমোহন দাসের স্ত্রী ও চার পুত্র (অতুল, গোকুল, পঞ্চানন ও সুবল) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহভাজন। লালুর তৃতীয় পুত্র পঞ্চানন দাস (জন্ম : ১৯০৪ সাল; ২০০০ সালের জুলাই মাসে ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যু) তাঁর পিতার মাতৃস্মৃতি বিবৃত করেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮.১২.১৯৯৭ এবং ৩০.১২.১৯৯৮ তারিখে পঞ্চানন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ ও অনুলিখন করেন।—**সম্পাদক**

আমাদের 'পিসিমা' সাধারণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ দেবী। প্রথমটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। তাঁকে মানুষ ভেবেই আবদার করেছি। তাঁর কাছ থেকে মুড়ি-মুড়কি চেয়ে খেয়েছি। তাঁকে আলাদা করে না বুঝলেও তিনি আমাদের বড় আপনজন ছিলেন। সে-টান আমরা সবসময় অনুভব করি। দু-একটা ঘটনা মনে নাড়া দিয়েছিল। সেগুলো তখন অত তলিয়ে দেখিনি; তবে পরে পরে বুঝেছি, তিনি মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সাক্ষাৎ দেবী।

সাতবেড়ের জেলেপাড়ায় আমার জন্ম। মাছ ধরা আমাদের জাতব্যবসা; বাপ-ঠাকুরদারা তাই করতেন। আমরাও তাই করি। তবে আমাদের সময় মাছ ধরতে হতো, আবার বর্ষাকালে চাষবাসও করতে হতো। আমি তখন ছোট। আমাদের গ্রামে দুর্লভ বড়াল বাউলগান শিখে

এসে সবাইকে বাউলগান শেখাতে লাগলেন। ছোটবেলা থেকেই আমার খুব গানের সখ। বড়ালমশাই ছিলেন গুনিন ও কালীসাধক। তিনি আমার গানের গলার প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেনঃ "লালু, তোর গলা আছে—তোর হবে; ধরে রাখিস। রোজ একটু করে গানের রেওয়াজ করবি।" আমারও ঝোঁক লেগে গেল। এইভাবে গান শিখতে কয়েক বছর লাগল। তারপর ইচ্ছা হলো কোথাও গিয়ে গান করি। মাছ বিক্রি করে যে-পয়সা জমিয়েছিলাম তা দিয়েই বাউলের পোশাক, ঘুঙুর, ডুগডুগি সব কিনে এনেছিলাম।

তখন জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজার খুব ধূমধাম। জয়রামবাটীতে আমাদের যাতায়াত খুবই। কারণ মাছ ধরতে, মাছ বিক্রি করতে আমাদের প্রায়ই জয়রামবাটী ও কাছাকাছি গ্রামে যেতে হতো। আমার ইচ্ছা হলো, এই জগদ্ধাত্রীপূজাতেই জয়রামবাটীতে বাউলগান করি। ব্রহ্মচারী মহারাজদের একথা বলাতে তাঁরা বললেন, পিসিমাকে জানাতে। আমি ভিতর বাড়িতে গিয়ে পিসিমাকে জানালাম যে, আমি জগদ্ধাত্রীপূজায় বাউলগান গাইব। পিসিমা হাসতে হাসতে বললেনঃ 'তুই আবার কি গান করবি? মাছ ধরতে ধরতে আবার গান গাইতে শিখলি কবে?" আমি বলিঃ "না গো পিসিমা, দুর্লভ বড়ালের কাছে বছরভোর গান শিখেছি। আমার খুব সখ একরাত্রি অন্তত গাইব। তোমায় চিন্তা করতে হবেনি, আমি সামিয়ানা যোগাড় করব। লণ্ঠনও ব্যবস্থা করব। দেখো, খারাপ হবেনি।"

পিসিমাও রাজি হলেন, আমিও গাইলাম। গান খুব সুন্দর হয়েছিল। বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ), কেদার মাস্টার (স্বামী কেশবানন্দ), কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ), বিভূতিবাবু—আরো কতজন ছিলেন। কেবল একবার নয়, বহুবার জয়রামবাটীতে গান করেছি।

জয়রামবাটী ছিল আমাদের নিজেদের গ্রামের মতো। ওখানকার পুকুরে মাছ ধরতে, বাড়িতে বাড়িতে মাছ বিক্রি করতে হামেশাই আমাদের যাতায়াত ছিল সেখানে। আমাদের মাছ ধরার দল ছিল বলে পিসিমার বাড়ির নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে আমাদের মাছ দিয়ে আসতে

হতো। মহারাজরা নির্দেশ দিতেন—সেইমতো সাতসকালে আমরা মাছ পৌঁছে দিয়ে আসতাম। অন্য কোন গ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে বড় মাপের মাছ পেলে আগে আমরা পিসিমার কাছে পাঠাতাম, ঠাকুরের ভোগে যাতে ঐ মাছ দেওয়া যায়। এমনই একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল পিসিমার সঙ্গে আমাদের। আমার স্ত্রী কিশোরী ও চার ছেলে (অতুল, গোকুল, পঞ্চানন ও সুবল)—সবাই পিসিমার খুব স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছে। কাজের ফাঁকে ও নানা উৎসবে তারা সবাই জয়রামবাটীতে হাজির হতো।

প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি যে, আমাদের পিসিমা সাক্ষাৎ দেবী! একদিনের একটি ঘটনা জীবনে ভুলতে পারব না। পিসিমার বাড়ির সামনের পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরার খবর দিলেন মহারাজরা। আমি দলবল নিয়ে সকাল করেই হাজির হলাম। সম্ভবত রাসপূর্ণিমার দিন ছিল। পাড়াগাঁয়ে পুকুরে জাল নামালে প্রতিবেশীরা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে মাছধরা দেখে। সেদিন দেখি, পিসিমাও তাঁর দুই ভাইঝিকে নিয়ে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো ভাইঝিরা মাছধরা দেখার বায়না ধরেছিল, তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে পুকুরপাড়ে আসতে হয়েছিল। পিসিমাকে পুকুরপাড়ে দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আজ যখন পিসিমা স্বয়ং পুকুরপাড়ে এসেছেন, তখন তাঁর হাতে একটা বড় মাছ দেব ঠাকুরের ভোগের জন্য। ঐ পুকুরে দু-একটা বড় মাছ থাকতই। সেগুলো পুরনো মাছ—খুব বড়। তারা সহজে জালে পড়ত না। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেত। ঐসমস্ত মাছ আটকাতে খুব পরিশ্রম হতো; মাঝে মাঝেই জলে ডুব দিয়ে জালের তলা ঠিক করে দিতে হতো। ঐসমস্ত মাছ জাল উলটে বেরিয়ে যায়। সেদিনও মাঝে মাঝে জলে ডুবে জাল ঠিক করতে ব্যস্ত আছি, কিন্তু মন পড়ে আছে পিসিমার কাছে। সবসময় তাঁকে লক্ষ্য করছি। ভাবছি, হয়তো এক্ষুণি তিনি ঘরে চলে যাবেন। এইরকম ভাবতে ভাবতে পিসিমার দিকে চোখ রাখতেই দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য! দেখি, পিসিমা তাঁর ভাইঝিদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে পুকুরপাড় ধরে পূর্বদিকে কোথায় যেন যাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি তাঁর সঙ্গে আরও দুজন মহিলা—একই

কাপড়, একই পাড়, একইরকম মাথায় ঘোমটা। যদিও তাঁদের সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু দেখে মনে হলো বাকি দুজনের মুখের আদলও যেন পিসিমার মতো। এই দৃশ্য দেখে আমি তো চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি জল থেকে ডাঙায় উঠে দেখতে ইচ্ছা হলো। হলে কি হবে, সবই বিধাতার ইচ্ছা! যেই না আমি পুকুরপাড়ের কাছাকাছি এসেছি, একটা বড় মাছ গায়ে লেজের ঝাপটা দিয়ে চলে গেল। আমিও তখন পাড়ে ওঠার কথা ভুলে গিয়ে জাল ঠিক করতে লেগে গেলাম। পরে যখন পাড়ে এলাম, পিসিমা বললেনঃ "হ্যাঁরে লালু, তুই যে অত খাটছিস, পুকুরে আর বড় মাছ নেই রে; যা দু-একটা আছে তাও জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে।" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম—আমার মনের কথা পিসিমা জানতে পারলেন কি করে? তখন পিসিমাকে বললামঃ "সত্যি পিসিমা, আজ ভেবেছিলাম একটা বড় মাছ ধরে আপনাকে দেখাব; তা আর হলো না।"

সেদিন পুকুরপাড়ে যা দেখেছিলাম সেকথা তাঁকে কিছু বলিনি। পরে পিসিমাকে একদিন ফাঁকা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ "আচ্ছা পিসিমা, ঐ মাছ ধরার দিনে আপনি যখন ভাইঝিদের নিয়ে পুকুরপাড়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে আর দুজন বউ কে ছিল—ঠিক আপনার বয়সী, আপনার মতো দেখতে, আপনার মতো কাপড় পরে ছিল তারা?" পিসিমা আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেনঃ "কে আবার থাকবে? আমি ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে বেলতলার দিকে গিয়েছিলাম—গিমেশাক হয়েছে কিনা দেখতে। রাধু-মাকু তো এধারে দাঁড়িয়েই ছিল।" আমি আবার বললামঃ "না গো পিসিমা, আপনি যখন বেলতলা যাচ্ছিলেন, তখনি আপনার আগে-পিছে দুজন মেয়েলোককে আমি দেখেছি। আপনি যে মাঝে রয়েছেন তাও বুঝতে পেরেছি।" পিসিমা হেসে বললেনঃ "তোর পেট গরম হয়েছে —মিছরি ভিজিয়ে খা।" এই বলেই পিসিমা ঘরে ঢুকে গেলেন। তখনো চমকে উঠলাম—দেখি, আবার সেই দৃশ্য—পিসিমা মাঝে, তাঁর আগে ও পিছে দুজন মেয়ে। আমি আবার চিৎকার করে বললামঃ "পিসিমা!" তখন পিসিমা ঘরের ভিতর

থেকে সাড়া দিয়ে বললেনঃ "লালু, একটু বোস, প্রসাদ নিয়ে যাবি।" পরে তিনি এসে মুড়কি ও ফলপ্রসাদ দিলেন। পিসিমা সেদিন কিছুতেই স্বীকার করেননি, কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি সে-দৃশ্য। দু-দুবার দেখেছি—একইরকম চেহারা নিয়ে দুজন মেয়েলোক পিসিমার আগে ও পিছনে।

পিসিমার বাড়ির ওপর আমাদের সকলেরই বড় টান ছিল। আমাদের চাষের যে ফসলই উঠুক না কেন তা পিসিমার বাড়ি পাঠানো হতো। তিল, সরষে, কলাইয়ের চাষ ছিল আমাদের। পিসিমা তিলবাটা ভাজা খেতে ভালবাসতেন। তিলের নাড়ু বানাতেন ভাল। আমার স্ত্রী কিশোরী থলেতে তিল ঘষে তার খোসা ছাড়িয়ে পিসিমাকে দিয়ে আসত। পিসিমা তাকে নতুন শাড়ি দিতেন। পিসিমার ওখানে উৎসব হলে আমি পুকুরে, জিবটে, দেশড়া, হরিশোভার পুকুর খুঁজে পদ্মফুল এনে দিতাম। পিসিমার আমলে জগদ্ধাত্রীপূজায় পদ্মফুল এনে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার। পদ্মফুল, পদ্মপাতা বহু বছর ধরে আমরা পিসিমার ওখানে দিয়ে আসতাম।

আমাদের বাড়ির কারো অসুখ-বিসুখ হলে আমরা সিংহবাহিনীর মাটি এনে দিতাম। তারও একটা ঘটনা আছে। একবার আমার বড়ছেলের ভারী অসুখ করে। আমি পিসিমাকে বললাম সব। পিসিমা সিংহবাহিনীর ফুল আর মাটি এনে হাতে দিয়ে বললেনঃ "এগুলো ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিস, আর পারিস তো আরামবাগের প্রভাকরের (ডাক্তার) কাছ থেকে ওষুধ এনে ছেলেকে খাওয়াস।" পিসিমার কথামতো তাই করেছিলাম। ছেলেটা তাতে সেরে গিয়েছিল। একবার দুর্গাপূজার সময় বাড়িসুদ্ধ সবার বসন্ত হয়। আমি তখন কোতুলপুরে ভদ্রদের বাড়িতে গানের বায়না ধরেছি। সেখানে গান গাইতে গেছি—তিনদিন ধরে গান হওয়ার কথা ছিল। আরও গানের দল এসেছিল। আমার পালা ছিল নবমীর দিন থেকে। অষ্টমী শেষ হতে না হতেই গ্রাম থেকে অসুস্থতার খবর এল। আমি সেকথা বাবুদের বললাম। তাঁরা বললেনঃ "লালু, তোর বাড়িতে বিপদ, তুই বাড়ি চলে যা। সামনের বছর এসে গান করবি।" মনের দুঃখে সেবার ফিরে এসেছিলাম। এসে বাড়ির অবস্থা দেখে মন

খুব খারাপ। ছেলেদুটোর ও তাদের মায়ের বসন্ত হয়েছে। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই!

তখন মাথায় কিছুই আসছিল না। হাবা-গোবার মতো জয়রামবাটীতে ছুটলাম পিসিমার কাছে। গিয়ে শুনি, পিসিমা কলকাতায়। সিংহবাহিনীর ফুল-মাটি নিলাম বটে, কিন্তু মনে বড় অভিমান হলো। মনে মনে পিসিমাকে বললামঃ "এই বিপদের সময় তুমিও বাইরে থাকলে!" তারপর ফিরে এসেছি। রাত্রে স্বপ্ন দেখছি—ঘরের দরজা খোলা; ছেলে-বউ সবাই ঘরে শুয়ে আছে। দেখি কিনা, পিসিমা হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। তারপর হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও ঘুমিয়ে গেছি। ভোরের দিকেও ঐ একই স্বপ্ন দেখি। তখন দেখলাম, পিসিমা বলছেনঃ "লালু তুই না বলছিলি—আমি ভুলে গেছি; এই তো আমি এখানেই রয়েছি।" ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কেউ কোথাও নেই। তারপরই ছেলে-বউরা তাড়াতাড়ি সেরে উঠল।

দেখতে দেখতে সেবছরটা গড়িয়ে গিয়ে নতুন বছর এল। ইচ্ছা ছিল, পরের বছর সপ্তমীর আগে থেকেই কোতুলপুরে ভদ্রবাড়িতে গান গাইতে যাব। সেইরকম গানের আসবাব সব গোছগাছ করছি। আশ্বিন মাস এসে গেল। হঠাৎ মনে কি খেয়াল হলো—এবছর আর কোতুলপুর নয়, ঘরেই মায়ের পুজো করব। আমার কথা শুনে গাঁয়ের লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল। তারা বললঃ "লালু, তুই ক্ষেপে গেছিস। পুজো আনা কি চাট্টিখানি কথা?" কাকা-জেঠারা বললঃ "তোর যখন সাধ হয়েছে তুই নবমীর দিন ঘটে মায়ের পুজো কর। তাতেও খরচ হবে, তবে অনেক কম।" সেইমতো নবমীর দিন ঘটে দেবীপূজার ব্যবস্থা করি।

নবমীর দিন সন্ধ্যার সময় উঠোনে সামিয়ানা খাটিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে বাউলগানের আসর বসানো হলো। আমিই প্রথমে গান ধরলাম। দু-তিনটে গান সবে হয়েছে, এমন সময় এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলাম। দুয়ারে যেখানে ঘটে দেবীর পূজা হয়েছিল সেইদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। উঠোনে লোক ভর্তি। গান ভালই জমেছিল। হঠাৎ দেখি, ঘটের কাছে পিসিমার মতো কে যেন দাঁড়িয়ে

আছে! আমি ভাবলাম, খাটাখাটুনিতে সব ভুল দেখছি। অন্যদিকে চোখ সরিয়ে আবার তাকালাম সেই ঘটের দিকে। দেখি, দুয়ারে আলো-আধাঁরির মাঝে সরু লালপেড়ে ধপধপে সাদা শাড়ি পরে পিসিমাই দাঁড়িয়ে। তিনবার ঘুরেফিরে দেখি একই দৃশ্য! আর স্থির থাকতে না পেরে দুয়ারে ছুটে গিয়ে মাথা ঠুকে বললামঃ "পিসিমা! তোমার এত দয়া!" তারপর আমার আর কোন হুঁশ ছিল না।

এরপর থেকে আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে, পিসিমা মানুষ নন, সত্যসত্যই দেবী। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, এসব যখন ঘটল তারপরই পিসিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তবে একটা কথা হলফ করেই বলি—পিসিমার দয়াতেই আমাদের মতো মূর্খ মানুষ বাউল হতে পেরেছে। লেখাপড়া কিছুই জানি না, কেবল মাস্টারের শেখানো গান শুনে শুনে বলে বলে রপ্ত করে প্রথম প্রথম গান গাইতাম। শেষে নিজেই গান বাঁধতে পারতাম। মাঝে সংসারের খুব টানাটানি হওয়ায় একবার বাউলগান ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম। বাউলের আলখাল্লাটা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। সেকথা ছেলেগুলো গিয়ে পিসিমার কানে তুলে দিয়েছিল। পরে পিসিমা ডেকে বলেছিলেনঃ "ওরে, গান ছাড়িস না লালু; এতে যে ঠাকুরের কথা আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবি।" তারপর থেকে মন দিয়ে বাউলের দল গড়েছি। অনেক জায়গা থেকে ডাকও পেয়েছি। বেজো সন্তোষপুর, সালঝাড়, রামজীবনপুর, কোতুলপুর, শিহড়, কোয়ালপাড়া, শ্যামবাজার, আনুড়—আরও কত জায়গায় গান করেছি! সবই পিসিমার কৃপা!

শেষের দিকে সাতবেড়ের জেলেপাড়ার সবাই পিসিমার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারও বাড়িতে কাঁঠাল পাকলে সে আগে পিসিমার বাড়িতে দিয়ে আসত। যার কলাগাছে কলা পাকত, সে আগে দিয়ে আসত পিসিমাকে। শুশনিশাক পিসিমা বড় ভালবাসতেন। আমাদের এখানে ঐ শাক খুব হতো। আমরা দু-চারদিন অন্তরই শুশনিশাক দিয়ে আসতাম পিসিমাকে। এখানকার সতীশ পণ্ডিত, নিতাই পণ্ডিত, প্রহ্লাদ বিশ্বাস, বরদা বিশ্বাস, নিতা দাস, রাম কুণ্ডু বাউল দলে আমার সঙ্গে থাকত।

তারাও পিসিমার খুব ভক্ত হয়েছিল। গাছের লাউ, তেঁতুল, কলা, পেঁপে, কলাই—যার যেমন সাধ্য সে তেমনই কিছু না কিছু নিয়ে পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। পিসিমা সবাইকেই খুশি করতেন।

একবার জিবটের বাবুদের পুকুরে (রায়দের পুকুর) মাছচাষ জমা নিয়ে সাতবেড়ের জেলেদের বচসা হয়। বাবুরা রেগে পুকুর ছাড়িয়ে নিল। তারা শাসাল যে, অন্য গাঁয়ের জেলেদের চাষ করতে দেবে। পুকুরটা ছিল সাতবেড়েতে। নিজেদের গাঁয়ে পাড়ার ভিতরে পুকুরে ভিন্ন গাঁয়ের জেলেরা এসে চাষ করবে, আর আমাদের ছেলেপুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে, তা কেমন করে হয়? অথচ বাবুরা তো একবগ্গা। যা বলেছে তাই-ই করবে। জেলেদের সবারই মাথায় হাত পড়ল। এখনেই শেষ নয়, বাবুরা পেয়াদা দিয়ে খবর পাঠাল যে, জেলেপাড়ার কাউকে আর জমি চাষ করতে দেবে না। সবারই মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। আমরা সবাই জড়ো হয়ে একদিন বিকালে জয়রামবাটীতে এসে পিসিমাকে সব জানালাম। পিসিমা সব শুনে বললেনঃ "সে কেমন কথা! তোমাদের পাড়ার পুকুরে অন্য গাঁয়ের জেলেরা এসে মাছচাষ করবে? তাছাড়া তোমাদের বাপ-ঠাকুরদা ঐ পুকুরে মাছ চাষ করেছে; এ ভারী অন্যায়। তোমরা মাছচাষ করবে বইকি; জমিজমা ওরা কাকে দেবে সে ওরা বুঝুক! তবে কোন অশান্তিতে যেও না। ওদের কাছে গিয়ে বলো। ওরা ঠিক ওদের ভুল বুঝতে পারবে।" পিসিমার নির্দেশমতো আমরা সবাই একবার রায়বাবুদের কাছে মিনতি করে আবেদন জানালাম। কি জানি, কি করে অমন ডাকসাইটে জমিদার জল হয়ে গেল। আমাদেরই আবার পুকুরে মাছচাষ করতে দিয়েছিল—জমি চাষ করতেও দিয়েছিল।

পিসিমা যেদিন শেষবারের মতো জয়রামবাটী ছেড়ে চলে যান, আমরা সাতবেড়ের অনেকেই সেদিন সেখানে হাজির ছিলাম। আমার বউ, ছেলেপিলে সবাই ছিল। সেবার সবাই খুব কেঁদেছিল। তখন একটুও বুঝতে পারিনি যে, পিসিমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। জাতে জেলে হয়েও তাঁর চরণ ছুঁয়েছি। পিসিমা একবারের জন্যও কখনও বারণ করেননি; বরং বলতেনঃ "ওরে লালু, নতুন গান কি বাঁধলি—শুনিয়ে

যাস।" তাঁর এই কথার জন্যই তো গান বাঁধতে শিখলাম। নতুন গান বাঁধলে আগে শুনিয়ে যেতাম পিসিমাকে।[১] তাঁর কাছে কত আবদার করেছি! কত সমস্যায় পড়ে ছুটে গেছি তাঁর কাছে। তাঁর আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন ভাবি, আমার জন্ম সার্থক! মানুষের দেহে দেবীর চরণ ছোঁয়ার সুযোগ পেয়েছি। সে কি কম সৌভাগ্যের কথা! * ❑

১ লালু যেসমস্ত গান তাঁর 'পিসিমা'কে (শ্রীশ্রীমাকে) শুনিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে ছটি গান সাতবেড়িয়া নিবাসী ফণীন্দ্র কুণ্ডু ও লালুর পুত্র পঞ্চানন দাসের সাহায্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।—**সম্পাদক**

।।১।।

সংসারকে সার ভাবে যে সেই তো মূঢ়
এই ভবের মাঝে ভেবে দেখো কে কার বাবা
কে কার খুড়ো।।
এখন আলবোলাতে টানছ তামাক,
শব্দ হচ্ছে গুড়ুর গুড়ুর।
যখন বৃদ্ধকালে দন্ত যাবে তখন খেতে হবে
মুড়ির গুঁড়ো।।

।।২।।

আমি জানব কেমন দয়াময়ী পতিতপাবনী।
হায় দিবে কি না দিবে মাগো অভয়চরণ দুখানি।।
বড় বৃষ্টি হলে পরে, ডাকি তোমায় মা মা বলে
তুমি থাক ব্রহ্মার কমণ্ডলে ওগো জগৎজননী।।

।।৩।।

ওরে মন জেলে, মিছাই মরিস জাল ফেলে
হাতের দড়ি রইল হাতে জাল গেল অগাধ জলে।
(তুই) জাল ফেলতে শিখলি না
তোর ঘটবে যন্ত্রণা।
তুই (জাল) ফেললে ছুঁড়ে জড়িয়ে পড়ে
ছড়িয়ে পড়ে না।

তোর নাড়াচাড়া গুগলি ঝাড়া সার হবে তোর কপালে
অনুরাগের মায়া সুতো টানতে গেলে যায় ছিঁড়ে।।
তোর জালের চৌষট্টি ঘাই, তার একটিও ভাল নাই
লালুদাস বলে—
তুই কিসের জোরে তরিয়ে যাবি পারের ডাক এলে।।

।।৪।।

দেশ ছেড়ে পালাতে হলো মশার কামড়ে
মশা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে গানের আখড়ে।।
মশার এমনি মধুর গান শুনে চমকে ওঠে প্রাণ
জ্ঞান চাপড়ে মারব বলে (মশা) করেছি সন্ধান।
মশা মলো না সুখ হলো না বেহুসারি চাপড়ে
দেশ ছেড়ে পালাতে হলো মশার কামড়ে।।

।।৫।।

সুখের ধান ভানা (ধান) এমন মন
ব্যবসা ছাড়িস না।
তোর দেহ ঢেঁকশালে
অনুরাগের ঢেঁকি বসালে
ভজন-সাধন দুটি পাড়ুই দুদিকে মেলে
ঢেঁকি নড়েচড়ে মাথা নাড়ে
গড়ে পড়ে না।।
আমি রাখব দুটি ভাঙ্গুনী
একটি হচ্ছে জেলের মেয়ে একটি তেলেনী
তারা ধান ভাঙে ভাল, জানে ভাল
তাদের গায়ে সোনার গহনা।।
অনন্ত তুই ধান ভাঙতে পারলি না
তোর ঘটবে যন্ত্রণা,
পাপ ঢেঁকি তোর—মাথা নাড়ে গড়ে পড়ে না।
চাল উঠবে সেঁটে বিকার কেটে
ঠিক যেন মিছরির দানা।।
শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান তাতে হবি রে সাবধান
ষোলো আনা বজায় রেখে করবি সমাধান
তুই লাভে লাভে দিন কাটাবি
মহাজনের ধান ভাঙিস না।।

॥৬॥

(ওগো) সাধ করে কি বাউল হয় ও রসের সন্ধানী
মনের টানে ব্যাকুল হলে তবেই পাবে দর্শনী ॥
বাউল যে গো গোপাল-পারা রসের লাগি অঝোর ধারা
কাঁদতে কাঁদতে গাইতে হবে জানপরানের আলাপনী ॥
নামযশেতে কি সুখ আছে, পুড়লে দেহ কয়লা হবে
সুদের টাকা লুঠে যাবে, রোগভোগেতে হয়রানি ॥
এদিক ওদিক যেদিক খোঁজো সবই ফাঁকা সবই ফুটো
কষ্ট কিছু না করে কি কেষ্ট মেলে সোজাসুজি
লালদাস বলে—
মনই জেনো আসল জিনিস, সেথায় আছে সুখের খনি ॥

• উদ্বোধন, ১০২তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৭, পৃঃ ৩২৯-৩৩২

মাতৃসন্দর্শন ও কৃপালাভ

শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু

বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে) গিরিশচন্দ্র বসু ও ব্রহ্মময়ী বসুর পুত্র শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্ম। ১৯১৮ সালে ২১ বছর বয়সে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি ময়মনসিংহ শহরে কাটিয়েছেন। সেখানেও তিনি মঠ ও মিশনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। অকৃতদার শৈলেন্দ্রবাবু ৮৪ বছর বয়সে ২২ নভেম্বর ১৯৮১ রাত্রি ৯.৩৫ মিনিটে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে পরলোকগমন করেন।—**সম্পাদক**

বিধাতার অসীম কৃপায় ও অভাবনীয় উপায়ে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার আট-দশ দিন পূর্বে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দর্শন ও কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছি। অযাচিত ও দৈবকৃপার আকর্ষণেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, নচেৎ আমি তো তাঁহাকে কখনো দর্শন বা তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা করি নাই বা ভাবিও নাই। দৈবই প্রবল ও সর্বশক্তিসম্পন্ন—যাঁহার ইচ্ছায় সকল কার্য সাধিত ও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমি প্রায়ই বাগবাজারে পূজনীয় বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে যাইতাম। কারণ, সেখানে তখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) রোগশয্যায় এবং রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কতিপয় শিষ্য ও সেবক-সহ তাঁহার তত্ত্বাবধান ও শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকিতেন।

একদিন দুপুরবেলায় সেখানে গিয়াছি ও রাখাল মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ উদ্বোধনে থাকিতেন এবং বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে আসিতেন। আমাকে দয়া করিয়া বলিলেনঃ "দেখ, আজ কয়েকজন ভক্ত

জয়রামবাটীতে মা-ঠাকরুনকে দর্শনে গেলেন। রাস্তাঘাট খারাপ ও ভয়সংকুল বলে দু-একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন, এমনকি পথখরচ দিতেও রাজি ছিলেন।" আমি দুঃখ করিয়া বলিলামঃ "হায়! এমন সুবিধা পেয়েও হারালাম!"

দৈবানুগ্রহে কয়েকদিন পরে সেই সুবিধা পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েকদিন পরে বলরামবাবুর বাড়ি গিয়াছি। তথায় কৃষ্ণলাল মহারাজের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি সোল্লাসে বলিলেনঃ "তোদের ময়মনসিংহের ভক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও মঠের সাধু নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ) আগামীকাল সকালের ট্রেনে জয়রামবাটী যাচ্ছেন। তুই ইচ্ছা করলে ওঁদের সঙ্গে যেতে পারিস।" আমি জিতেন্দ্রবাবুর বাসার ঠিকানা লইয়া তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরের দিন ভোরে হাওড়া স্টেশন হইতে দশটার মাদ্রাজ মেল ধরিলাম ও খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন বদল করিয়া গোমো এক্সপ্রেসে বিষ্ণুপুর পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় দুইটা হইবে।

রাত্রে কুড়ি-পঁচিশখানা গোরু কিংবা মহিষের গাড়ি একত্রে চলাচল করে। কারণ, রাস্তা বিপদসংকুল, দস্যু বা ডাকাতরা বাস করে। তাই একত্রিত হইয়া রওনা হইতে হয়। গাড়ির গাড়োয়ানেরা রাত্রিকালে জ্বলন্ত মশাল-হস্তে লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্র লইয়া জাগিয়া পথ চলে। আমার ইতিপূর্বে কখনো গোরুর গাড়ি চড়ার অভ্যাস নাই। আমরা তিনজনে দুইখানা গাড়ি ঠিক করিয়া রওনা হইলাম। এরমধ্যে একখানায় নির্মল মহারাজ ও অন্য গাড়িতে আমরা দুইজন ছিলাম। গাড়ির ভিতরে খড়ের বিছানা, এপাশ-ওপাশ হইতে কষ্ট বোধ হয়। আমি রাত তিনটায় গৈলাগ্রামে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া হাঁটাপথে চলিতে লাগিলাম। এইখানে বিশাল অরণ্য। হিংস্র জন্তু আছে। কাঁচা মেঠো রাস্তা ও ভয়সংকুল পথ দিয়া যাইতে হয়। এই রাস্তা প্রায় ঊনত্রিশ মাইল। ইহাকে 'বনবিষ্ণুপুর' বলে। ইহাই পুরাকালে 'গুপ্তবৃন্দাবন' বলিয়া অভিহিত। বিষ্ণুপুরে অনেক পুরনো দেবদেবীর মন্দির আছে। আমাদের গাড়ি হইতে কোতুলপুরে (বর্ধিষ্ণু ও মহকুমা শহর) অবতরণ করিতে হইল। ইহার পর

কোন যানবাহন যাইতে পারে না। কারণ রাস্তা কর্দমাক্ত ও জলমগ্ন। এখন হাঁটা পথে আইল অথবা সংকীর্ণ রাস্তা দিয়া অর্থাৎ দুর্গম রাস্তা দিয়া চলিতে হইবে। মাল বহন করিবার জন্য লোক ও পথপ্রদর্শকও দরকার।

বিষ্ণুপুর হইতে কোতুলপুর বারো মাইল পথ। কোতুলপুরের বাজার হইতে লোক সংগ্রহ করিতে হয়। এখানে সস্তা বলিয়া জলযোগের জন্য এক সের করিয়া আমরা দুইজন প্রত্যেকেই রসগোল্লা খাইলাম ও গন্তব্যস্থানের দিকে সকাল সাতটায় রওনা হইলাম। এইকালে রসগোল্লার সের পাঁচ আনা মাত্র। অতি সস্তা ছিল। রাস্তায় কোন কোন স্থানে পা কাদায় আটকাইয়া ডুবিয়া যাইতেছিল এবং সময় সময় পায়ে কাঁটা বিঁধিতেছিল। তাই অতি কষ্টে সাবধানে চলিয়া কোয়ালপাড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সময় সময় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলামঃ "এপথে মানুষ চলে?" কিন্তু প্রবীণ ভক্ত জিতেনবাবু রাগ করিয়া বলিলেনঃ "কিরে ছোকরা, মানুষ কত কষ্টে কেদার-বদ্রী যায়, আর তুই এতটুকুতেই কষ্ট বোধ করিস?" যখন কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। তখন স্বামী কেশবানন্দ, যিনি কোয়ালপাড়া মঠের অধ্যক্ষ, মাঠে বীজ রোপন করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেনঃ "আর অগ্রসর হবেন না। এখানে বিশ্রাম ও আহার করে বেলা তিনটায় জয়রামবাটীর দিকে রওনা হবেন। কারণ, দুপুর রৌদ্রে যাওয়া মা-র নিষেধ, এইরকম রৌদ্রে পুড়ে কষ্ট করে গেলে মা-র কষ্ট হয়।" সেইজন্য আমরা এখানে যাত্রাভঙ্গ করিয়া স্নানাহার করিলাম। এইখানে তৎকালে একটি বয়ন-বিদ্যালয় ও শিক্ষালয় ছিল। এখানে সাধুরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন, এদের অনেকেরই বাড়ি সেইস্থানে। কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী ছয় মাইল পথ। মা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় যাওয়া-আসার পথে এখানে বিশ্রাম নিতেন। সেজন্য এখানে একটি বড় ইন্দারা ও বসার স্থান (ইন্দারার পাড়ে) করা হইয়াছে। বেলা তিনটার সময় স্বামী কেশবানন্দ আমাদের মাল বহন করিবার জন্য কুলি ও রাস্তাঘাট দেখাইবার জন্য স্বামী ঈশানানন্দকে (বরদা মহারাজ) আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম, রাস্তাঘাট সমস্তই একই প্রকার কর্দমাক্ত। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে যাইতে আমরা জয়রামবাটী অদূরে দেখিতে পাইলাম। ঘন ঘন বাড়ি-ঘর ও গাছ-গাছড়ায় পূর্ণ এই গ্রামটি বেষ্টন করিয়া আমোদর নদ (মা যাহাকে 'গঙ্গা' প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া অভিহিত করিতেন) প্রবাহিত হইতেছে। ইহার অল্পদূরেই ছোট্ট গ্রামখানি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমোদর নদ সময় সময় শুকাইয়া যায় এবং সময়ে অনেক জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও স্রোত বহিতে থাকে। সেইস্থানে একটি দীর্ঘ দড়ি সহ একখানি ছোট্ট পোড়ো নৌকা পারাপার করিত। নদীর পাড়ে একটি ঘাট ছিল, সেখানে মা স্নান করিতেন ও 'গঙ্গা' বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, তখন আমরা মা-র বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে দরজার ওপর হাত রাখিয়া মা তখন দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমত অবস্থায় আমরা কর্দমাক্ত পায়ে মাকে প্রণাম করিলাম। মা মস্তকে হাত রাখিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া চুমা খাইলেন। তৎপর বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন। ঐখানে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল যে. কেহ আসিলে সেই অবস্থায়ই (অর্থাৎ হাত-পা না ধুইয়া) মা-র আশীর্বাদ ও চুম্বন ভিক্ষা করিতেন। আমরা বসিলে পর উদ্বোধন হইতে মা-র নিকট লিখিত চিঠি ও ললিতবাবু[১] প্রেরিত ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য এক বাক্স ঔষধ (হোমিওপ্যাথিক) মা-র পায়ের নিকট রাখিলে তিনি নির্মল মহারাজকে সকলের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাকে দেখাইয়া নির্মল মহারাজ বলিলেনঃ "এই ছেলেটি আপনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য এসেছে।" মা বলিলেনঃ "কাল সকালবেলা হবে।" কথাপ্রসঙ্গে নির্মল মহারাজ বোম্বাইতে বাইশ টাকা চাউলের দর হওয়ার ও অন্যান্য দিকে দুর্ভিক্ষের লক্ষণের কথা বলায় মা বলিলেনঃ "হা ঠাকুর! তুমি এলে কিন্তু লোকের দুঃখ-দুর্দশা কমল না।" এই বলিয়া প্রায় পনের মিনিট কাল পরেও—আমরা নবনির্মিত গৃহে যেখানে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) থাকিতেন সেখানে চলিয়া

১ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং ঠাকুরের ভক্ত। ভক্তমহলে 'কাইজার' নামে সুপরিচিত ছিলেন।—সম্পাদক

গেলেও—মাকে আপশোস করিতে শোনা গেল। এতে সকলেই খুব দুঃখিত হইল। বিশেষত নির্মল মহারাজ বলিলেনঃ "অন্যের দুঃখের কথা না উল্লেখ করলেই ভাল ছিল। কারণ, মানুষের দুঃখের কথাবার্তা এঁদের প্রাণে বিশেষভাবে আঘাত করে থাকে।"

মা স্বহস্তে ভক্তদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার ঘরের বারান্দায় পাকের ব্যবস্থা ছিল। তিনি স্বহস্তেই ভক্তের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। এমনকি তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন। কেহ নিতে চাহিলে তিনি আপত্তি করিতেন। তিনি বলিতেনঃ "আমি তোমাদের জন্য কী করেছি?" মা-র হাত হইতে কাজ টানিয়া নিলে দুঃখিত হইতেন ও বলিতেনঃ "আমি তোমাদের জন্য এমন কী করেছি?"

তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া আমাদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াইলেন। তাঁহার পাকপ্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত, সুচারু ও মুখরোচক। মনে হইল যেন অমৃত খাইতেছি। মা-র হস্তে অমৃতসদৃশ সুস্বাদু অন্ন আহারের পর মনে হইল যেন বৈকুণ্ঠে অন্নপূর্ণার হস্তে প্রসাদ পাইয়া জীবন ধন্য হইল। আমরা রাত্রে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শয়ন করিলাম। আমরা অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইলেই মাকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। বোধ হইল যেন মা সারা রাত্রি জাগিয়াই ছিলেন। তাহার পূর্বে কেহই ঘর হইতে বাহির হয় নাই। আমরাও সর্বপ্রথমে মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে বলিলেনঃ "যাও বাবা, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে পুকুর থেকে স্নান করে এস।" স্নানাদি সেরে এসে দেখিলাম, মা পূজার ঘর হইতে আমাকে আহ্বান করিলেন ও বামপার্শ্বে একটি ভিন্ন আসনে আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। তিনি আমার মস্তক হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া বীজমন্ত্র প্রদান করিলেন ও একটি প্রশ্ন করিলেনঃ "তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি তাহা সঠিক না জানাতে উত্তর করিলামঃ "আমি ঠিক বলতে পারি না।" আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, মা-ই তো সমস্ত জানেন, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? তিনি নিজ হইতেই মন্ত্র দিয়া করপুটে মন্ত্রগণনা পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন। তাঁহাকে প্রণামান্তে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এটিই মা-র নবনির্মিত বাড়ি। অন্যান্য সকলে পরে মাকে

প্রণাম করিলেন। মা পূজা হইতে উঠিলে আমাদের প্রাতের জলখাবারের জন্য বাটিতে করিয়া মুড়ি ও গুড় পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দে আমরা গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তাঁহাকে বাড়ির শেষ সীমানায় পুণ্য পুকুরের পাড়ে জিগা গাছের নিচে আলপথে হাতে একটি ঘটি ও মাছ আনিবার জন্য একটি ডোল লইয়া যাইতে দেখিলাম। কিন্তু সেই স্থানে কোন হাটবাজার না থাকায় প্রতিবেশীর নিকট হইতে কিছু মৌরালা মাছ ও সামান্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে দেখিলাম। তখন জয়রামবাটীতে কোন হাটবাজার ছিল না, প্রতিবেশীর নিকট হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত।

ভিতর বাড়ির আঙিনায় রাশিকৃত কাদা জমিয়া আছে বলিয়া তিনি নিজ হস্তে একটি বাঁশ দিয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছেন দেখিলাম। কিন্তু তাঁহার সাহায্যের জন্য শক্তি থাকিলেও কোনপ্রকার সাহায্য করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র দর্শক হিসাবেই স্থির হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলাম, কারণ মা-র হস্ত হইতে কোন কাজ টানিয়া নিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন।

সেদিনই আমাদের দুপুরের দিকে ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তাই মা আমাদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল। পাঁচ মাইল রাস্তা আমোদর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। আমরা সেখান হইতে চতুর্দিকের গ্রাম ও বৃক্ষপত্রাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়িতে উপস্থিত হইলে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবু-দার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আদর করিয়া তাঁহাদের বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন ও সময় না থাকায় লণ্ঠন-হস্তে চিনু শাঁখারীর তুলসীমঞ্চে লইয়া গেলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় কীর্তন ও পূজা হইত। এখন সেই স্থানটিতে বসতবাটী না থাকায় সন্ধ্যার সময় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেওয়া হয়। সময়াভাবে আর বিশেষ কিছু দেখা হইল না। রাত্রে তাঁহাদের বাড়িতেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শিবু-দার ছোট ছেলের অতি সুকণ্ঠ। ঘরের দেওয়ালে

ঠাকুরের প্রতিকৃতি উচ্চে টাঙানো আছে। তাই অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইলঃ "এটি দাদুর ছবি।" আমরা যেমন ঠাকুরের পরিবারের রামলাল-দা ও শিবরাম-দাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম, তাঁহাদের ছেলেরাও সেইপ্রকার আমাদের 'কাকা' বলিয়া সম্বোধন করিত। রাত্রের অধিকাংশ সময়েই আহারের পর ঠাকুরের গান গাহিয়া আমাদের শুনাইত। কণ্ঠ অতি সুমধুর, বিশেষত এই পরিবারের। পরদিন অতি প্রত্যূষেই আমরা জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর নিকটেই ভানুপিসি থাকিতেন। সংবাদ পাইয়া তিনি আমাদের দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেনঃ "এখন বাবার ছেলে খুব কম, অধিকাংশই মা-র ছেলে দেখি।" তিনি ঠাকুরের সময় যেসকল গান গাহিয়া ঠাকুরকে শুনাইতেন তাহা গাহিলেন। এই গান শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। আমরা আহার করিয়া বিদায়গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। মা-র আহার শেষ হইলে তিনি বাটিতে করিয়া দুধভাত প্রসাদ আমাদের জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করিলাম। মনে হইল যে, তিনি দুধের সঙ্গে অধিক মিষ্ট খাইতেন। এবার বিদায়ের পালা! অল্প পরেই মা-র নিজের বাড়িতে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আমরা রওনা হইলাম।

মা-ও আমাদের সঙ্গে পিছু পিছু বহির্বাটীতে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত সাশ্রু নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এ কী অদ্ভুত আকর্ষণ! জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসা—এই ভালবাসার শেষ নাই। ইয়ত্তা নাই। বুকভরা ভালবাসা ও প্রাণভরা আশীর্বাদই আমার চিরজন্মের পাথেয় হইয়া রহিল।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বে জয়রামবাটী হইতে চির বিদায় নিয়া রোগাক্রান্ত দেহে মা যেন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিজস্ব বাড়ি বাগবাজারের উদ্বোধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় 'মায়ের বাড়ী'র দ্বারী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) গর্ব অনুভব করিতেন। তিনি স্বহস্তে মায়ের সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সর্বপ্রকার লৌকিক চেষ্টা ও সেবাশুশ্রূষা দ্বারা মাকে মর্ত্যধামে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস

করিলেন, কিন্তু সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া নিত্যস্বরূপিণী মা তাঁহার স্ব-স্বরূপ সংবরণ করিলেন। সন্তান ও ভক্তদিগের চির আশ্রয়স্থল শ্রীশ্রীমার পরম পদযুগল স্থূলদৃষ্টিতে চিরদিনের জন্য মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহার স্থূলমূর্তির সম্মুখে 'মা' 'মা' ডাক শুনা চিরতরে শেষ হইয়া গেল; ধরায় রহিয়া গেল অবিস্মরণীয় অক্ষয় মধুময় স্মৃতিনির্ঝর—যাহা কোনকালেও লুপ্ত হইবার নহে, যাহা চিরকালই ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও রহিবে। তাই তো মায়ের আরেক নাম 'মহাকালী'—কাল যাহাকে নাশ করিতে পারেন না। তাই তো মা নরদেহ ছাড়িবার পূর্বক্ষণে উপস্থিত, অনুপস্থিত, এমনকি অনাগত ভবিষ্যতে যাহারা ধরাধামে আসিবে—তাহাদিগেরও সকলকেই হৃদয় ঢালিয়া আশীর্বাদ করিয়া ইহধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। মাতৃহারা হইয়া শরৎ মহারাজই বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক মর্মব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার সর্ব ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুই ছিলেন মা। পর দিবস প্রাতে বেলুড় মঠে মা-র শবদেহ লইয়া যাওয়া হইল। সেসময় শরৎ মহারাজের রুক্ষ কেশ ও গম্ভীর মূর্তি দেখিলে ভয় হইত। কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া তিনি শবদাহ করিবার প্রাক্কালে সমস্ত আচারবিধি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ দিতেছিলেন। মাকে স্নান করাইয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করাইয়া শ্বেতচন্দন লেপনপূর্বক এবং পত্রপুষ্প ও মাল্যে অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করাইয়া ভক্তিভরে আরতি করা হইল। ভক্তগণ দলে দলে মা-র শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছিলেন। দাহের পর একসময় মাত্রা ছাড়াইয়া ভক্তগণের মধ্যে হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইয়া গেল যখন স্ত্রীভক্তেরা... মা-র পূতাস্থি বা ভস্ম সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ও ঠেলাঠেলি করিতেছিলেন। এসব বাড়াবাড়ি দেখিয়া শরৎ মহারাজ রাগতস্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ "এত যে সব ঘটা করে নিচ্ছ—যত্ন করে রাখতে পারবে তো?" সেকথা শুনিবামাত্র অনেকেই ব্যস্ত হইয়া অস্থি, ভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন।... মাতৃগতপ্রাণ শরৎ মহারাজের সে রুদ্রমূর্তি তখন যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমার লীলা সংবরণের এগারো দিন পরে বেলুড় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত মহামিলন উৎসব প্রতিপালিত হয় এবং সেসময় বোধ হইতেছিল, মা যেন সর্বভক্তহৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছেন। আকণ্ঠ প্রসাদ গ্রহণ, ভজন, পাঠ ও আলোচনায় ভক্তহৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং মা-র সান্নিধ্য সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন।[২] * ❑

২ **সুধীররঞ্জন গুহ** তাঁর আত্মীয় শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসুর লেখা 'মাতৃসন্দর্শন ও কৃপালাভ' শিরোনামযুক্ত একটি পুস্তিকা 'উদ্বোধন'-এ পুনর্মুদ্রণের জন্য আমাদের কাছে পাঠান। পুস্তিকাটির টাইটেল পেজ' ও 'ভারসো পেজ' ছিল না। ফলে প্রকাশক ও প্রকাশন-বর্ষ জানা যায়নি। স্মৃতিকথাটি শ্রীগুহের সৌজন্যেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।—**সম্পাদক**

*** উদ্বোধন, ১০০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৫, পৃঃ ৮১২-৮১৪**

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবিন্দু

সরযূবালা সেন

আমার স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপাধন্য, কিন্তু আমি পেয়েছি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাশ্রয়। আমার বাবা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত রায়বাহাদুর চুনিলাল বসু। আমি ছিলাম তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। এগার বছর বয়সে রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূরূপে আমার শ্বশুরালয়ে আগমন। শ্বশুরমশাই তখন মুঙ্গেরে সিভিল সার্জন রূপে কর্মরত। সেসময় মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট স্ত্রী-ভক্ত গৌরী-মা। আমার স্বামী তখন গৌরী-মায়ের ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সান্নিধ্যে আসেন এবং তখন থেকেই গৌরী-মা আমৃত্যু তাঁকে পুত্ররূপে দেখতেন। বস্তুত, গৌরী-মার সান্নিধ্যে এসে আমার স্বামী বৈরাগ্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। তারপর কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের সংস্পর্শে আসেন। আমার বাবা চুনিলাল বসু ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে স্বামীজীর সহপাঠী। কলকাতায় স্বামীজীদের বাড়ির কাছেই ছিল আমার শ্বশুরবাড়ি— কাঁসারিপাড়ায়। বিয়ের পর আমার স্বামী স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণে সঙ্গী হন। সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আমার স্বামীর ছিল প্রবল অনুরাগ। আমার বাবার অনুরোধেই স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে সংসারে ফেরত পাঠান। পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতার স্নেহভাজন হওয়ার সৌভাগ্যও তাঁর ঘটে এবং বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরে তিনি তার দ্বিতীয় সম্পাদক হন ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছায়। স্বামীজী ভিন্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দেরও তিনি অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

আমার স্বামী আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গৌরী-মা। দীক্ষান্তে মা স্বয়ং খিচুড়ি রান্না করে আমাদের খাইয়েছিলেন। সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের স্মৃতি এবং সেই

পরমাশ্রয়লাভই আমার সারা জীবনের পরম পাথেয়। আমার দীক্ষা হয়েছিল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেতাম ছুটে ছুটে যেতাম উদ্বোধন-এ মায়ের কাছে। মায়ের ভালবাসা কাউকে মুখে বলে বোঝানো যাবে না। কী যত্নই যে করতেন! সব সময় খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হতেন। উদ্বোধন-এ গেলে মায়ের সঙ্গেই থাকতাম। গৌরী-মা, গোলাপ-মা, যোগীন-মাও খুব ভালবাসতেন আমাকে। মায়ের সান্নিধ্যে ছিল শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। আমার সঙ্গে থাকত আমার তিন পুত্র। তারা ছিল বড় দুষ্টু। সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াত। দুপুরে ছাদে ঘুড়ি ওড়াত। শরৎ মহারাজ সেবকদের বলতেন যাতে দুপুরে ছাদের ওপরে ওরা দাপাদাপি না করে। কারণ, তাতে মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। দুপুরে ছাদে দাপাদাপির শব্দ না হওয়াতে মা সেবকদের ডেকে জিজ্ঞেস করতেনঃ "বাচ্চারা কি করছে?" সেবকরা বলতেনঃ "ওদেরকে আমাদের কাছে রেখেছি। শরৎ মহারাজ বলেছেন ওরা যেন এখন ছাদে লাফালাফি না করে।" মা বললেনঃ "কেন?" সেবকরা বললেনঃ "ছাদে দাপাদাপি করলে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে।" মা বললেনঃ "শরৎকে বোলো, ওরা ছাদে ছুটোছুটি করলে, খেলাধুলো করলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। ওদের কিছু বোলো না তোমরা। শুধু দেখো, যেন পড়েটড়ে না যায়। দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে হাতে পায়ে না লাগে।" সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরার সময় মা নিজে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসতেন। বাচ্চাদের হাত ভরে সন্দেশ, মিষ্টি দিতেন। ওরা মনের আনন্দে খেতে খেতে বাড়ি ফিরত।

একবার মায়ের চরণপুজোর জন্য কিছু পদ্মফুল নিয়ে গেছি উদ্বোধন-এ। হাঁটু গেড়ে বসে যখন মায়ের পায়ে ফুল দিতে গেছি তখন হঠাৎ পড়ে গেলাম। লাগেনি তেমন কিছু, কিন্তু লজ্জা পেয়েছিলাম খুব। মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেনঃ "ছেলেমানুষ, পড়ে গেছে। আহা, লাগেনি তো?" তাঁর ঐ স্নেহমাখা কথাগুলিতে ব্যথা যেটুকু ছিল তা তো তখনই চলে গেল, আর লজ্জার ভাবটিও চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মায়ের শেষ অসুখের সময় আমার স্বামী নিত্য যেতেন উদ্বোধন-এ মায়ের খবর নিতে। একদিন মাকে তিনি বললেনঃ "আমায় কিছু দেবেন না, মা?" মা শরৎ মহারাজকে ডাকতে বললেন। শরৎ মহারাজ এলে মা তাঁকে একটা কাঁচি আনতে বললেন। শরৎ মহারাজ কাঁচি আনলে মা নিজের হাতে কাঁচি দিয়ে তাঁর মাথা থেকে কয়েকটা চুল কেটে নিয়ে মহারাজকে বললেনঃ "সামনের কুলুঙ্গিতে একটা ছোট কৌটো আছে, ওটা আনো।" মহারাজ কৌটোটি আনলে মা নিজে তার মধ্যে চুল'কটি রেখে আমার স্বামীর হাতে দিয়ে বললেনঃ "এটি হলো সিদ্ধযন্ত্র। এর ওপর সব দেবদেবীর পুজো হবে। পুজোয় কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। পুজো হবে সাত্ত্বিক। ইষ্টমন্ত্র জপ করে যন্ত্রস্নান করাবে। গঙ্গাজল থাকলে গঙ্গাজলে, গঙ্গাজল না থাকলে কলের জলেও হবে। আর পুজো হবে মানসপুজো।" সেদিন আমার স্বামী খালি গায়ে মাথায় করে ঐ সিদ্ধযন্ত্র বাড়িতে নিয়ে আসেন। আজীবন মায়ের নির্দেশমতো তিনি যন্ত্রের সাত্ত্বিক পুজো করে গেছেন। মায়ের দেহরক্ষার পর ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে শরৎ মহারাজ ঐ যন্ত্রের ওপর কালীপুজো করেন। সেদিন মহারাজ আমাকে এবং আমার স্বামীকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন। পুজো শেষে গেরুয়া বসন, দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়েছিলেন। কমণ্ডলু ও দণ্ড তিনি তাঁর কাছেই রাখেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ "গেরুয়া পরতে হবে না, অন্তিমযাত্রায় গেরুয়া সঙ্গে যাবে।" শ্রীশ্রীমা আমার স্বামীকে এবং আমাকে নিজমুখে বলেছিলেনঃ "যারা ঠাকুরের শরণ নেবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।" মায়ের দেওয়া সিদ্ধযন্ত্র যেমন আমাদের মায়ের আশ্রয় দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে ঠাকুরেরও আশ্রয়। ঐ সিদ্ধযন্ত্রই আমাদের পরিবারের মোটা ভাত-কাপড়ের আজও সংস্থান করে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও করবে। শুধু মোটা 'ভাত-কাপড়'-এর ভারই নয়, আমাদের পরিবারের আধ্যাত্মিক জীবনের ভারও তাঁরা নিয়েছেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে আছি।* ❑

* এই মধুস্মৃতিটি লেখিকার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ গৌরী সেনের (কেষ্টপুর, কলকাতা-৭০০ ০৫৯) সৌজন্যে পাওয়া গেছে। —সম্পাদক

মাতৃদর্শন

সারদা দাসন

মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়ম্' নামক তামিল মাসিক পত্রিকায় ১৯২৫ সালে প্রকাশিত স্মৃতিকথার বঙ্গানুবাদ। বঙ্গানুবাদ করেছেন **স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ—সম্পাদক**

প্রায় ষোলো বছর আগে মাদ্রাজের 'হিন্দু' নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় শ্রীসারদাদেবীর শুভাগমনের সংবাদ জেনে আমার মা-বাবা তাঁর দর্শনের জন্য আমাকে যেদিন নিয়ে গেলেন, সেই পুণ্যদিনের স্মৃতি আমার মনে এখনো জাগরূক। সেই সময় আমি ঠাকুর ও মা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ—এই নামগুলি শুধু শুনেছি মাত্র, কিন্তু তাঁদের মহিমা বা শ্রীশ্রীমায়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলাম না। আমার বাবার মুখে আমি মাঝেসাঝে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতাম—তিনি বেদান্তের বিরাট পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতামালা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমাদের বিরূপ ধারণা দূর করে হিন্দুধর্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করেছিল এবং আমাদের দেশপ্রেম জাগ্রত করেছিল।

আমি এবং আমার মা-বাবা কৌতূহলবশতই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়েছিলাম—ভক্ত হিসাবে তাঁর কাছে আমরা যাইনি। তা সত্ত্বেও মায়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কাছে এক বাড়িতে মাকে দর্শন করা মাত্রই আমাদের মন তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হলো। তারপর থেকে বারবার তাঁর সান্নিধ্যলাভের প্রবল ইচ্ছা মনে উদিত হতো। সেই সময়, পাগলের মতো কেন তাঁর কাছে ছুটছি—এই চিন্তা মনে আসত না। এখনো চিন্তা করে খুঁজে পাই না যে, আমাদের ও মায়ের মধ্যে কী মিল

ছিল। ইংরেজী, তামিল বা সংস্কৃত কোন ভাষাই মায়ের জানা ছিল না, আবার বাঙলা ভাষা বিন্দুমাত্রও আমাদের জানা ছিল না। তিনি দেবত্বসম্পন্না, পবিত্রতাস্বরূপিণী এবং সদাহাস্যবদনা; কিন্তু আমি দোষত্রুটি যুক্ত অতি সাধারণ মানুষ—ধর্মের প্রতি সামান্যতম অনুরাগশূন্য একটি দীন বালক। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যেকোনো একটি বিশেষ সাদৃশ্য হয়তো ছিল। কবি বলেছেনঃ "অতি হীন পাপীদেরও বিধির বিশেষ বিধানে সৌভাগ্যলাভ করতে দেখা যায়।" আমার মাতৃদর্শনও বিধির বিধানই বলতে হয়।

শ্রীশ্রীমা যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখন প্রতিদিন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতাম এবং তাঁর স্নেহলাভ করতাম। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বিদায়লগ্ন উপস্থিত হলো। কিন্তু সেই কয়েকদিনের মধ্যে মায়লাপুর রামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর স্নেহসান্নিধ্যে আসার ফলে মায়ের অদর্শন আমার কাছে ততটা পীড়াদায়ক হয়নি। আমার বাবা-মা শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা ও বহু অমূল্য উপদেশ পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা আমাদের বাড়িতে শুভপদার্পণ করে আমাদের নৈবেদ্য যেদিন গ্রহণ করেছিলেন, সেই পুণ্যদিন আমার স্মৃতিপটে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারপর কয়েক বছর অতিবাহিত হলো। শ্রীশ্রীমায়ের মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে না পারার ফলে তাঁর সান্নিধ্য ও দর্শনের অভাব আমার পক্ষে খুব বেশি পীড়াদায়ক হলো না ঠিকই, কিন্তু আমার মা-বাবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের ইচ্ছা ক্রমশ বাড়তে লাগল। তাঁরা ঠাকুর ও মায়ের জীবনকথার সঙ্গে যত পরিচিত হতে লাগলেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করতে লাগলেন ততই তাঁদের ইচ্ছা আরও তীব্র হতে লাগল। আমার বাবা কর্মস্থল থেকে ছুটি না পাওয়ায় মাকে সঙ্গে করে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য তিনি আমাকে কলকাতায় পাঠালেন। আমি এবং আমার মা কলকাতায় এসে রামকৃষ্ণ মঠের সাহায্যে একজন সঙ্গী নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-স্থান জয়রামবাটী গেলাম। জয়রামবাটী বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

জয়রামবাটী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইদানীং সেই গ্রাম একটি পুণ্যক্ষেত্র বলে পরিগণিত। সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তিনি বহুদিন বাস করেছিলেন। পরবর্তী কালে সেখানে মায়ের একটি মন্দিরও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আমার গর্ভধারিণীর কাছে সেই সময়েই জয়রামবাটী এক পবিত্র দেবালয়রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। কারণ, তাঁর গুরু শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব ও অবস্থানে সেই গ্রাম ধন্য ও পবিত্র।

গ্রামটি ক্ষুদ্র হলেও অতি সুন্দর ও মনোহর। আমাদের সঙ্গী ব্রহ্মচারী বিরূপাক্ষ পরম ভক্তিমান। সেখানকার একটি পুকুরকে দেখিয়ে তিনি বললেনঃ "এখানেই শ্রীশ্রীমা স্নান করেন। এটা অতি শুদ্ধ ও পবিত্র।" এই বলে পুকুরটিকে তিনি প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা পূজিতা সিংহবাহিনী মন্দিরে গিয়েও তিনি প্রণাম করলেন। যখন তিনি মায়ের সামনে থাকতেন তখন ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে করজোড়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি আমার মায়ের যে-ভক্তি ছিল সেটা খানিকটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, কিন্তু এই ব্রহ্মচারী মহারাজের ভক্তি-বিহ্বলতা আমার অত্যন্ত বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। কারণ, ভক্তি কি বস্তু সেই সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারী বিরূপাক্ষের ভক্তি আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি আমারও শ্রদ্ধা-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল।

জয়রামবাটীর অনেকে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে বারংবার আসতেন। মা-ও তাঁদের সঙ্গে সানন্দে অক্লান্তভাবে আলাপাদি করতেন। কিন্তু বাঙলা ভাষা না জানায় তাঁর কথোপকথনের মর্মোপলব্ধি থেকে আমি বঞ্চিত হতাম। শ্রীশ্রীমায়ের এক ভাইয়ের সঙ্গে আমি প্রায়ই আলাদাভাবে আলাপ করতাম। তিনিও কিন্তু বাঙলা ভাষা ছাড়া কিছু জানতেন না। ব্রহ্মচারী বিরূপাক্ষ দোভাষী হয়ে সাহায্য করায় আমাদের এই আলাপ সহজ হয়েছিল।

আমরা তিন রাত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে ছিলাম। তার মধ্যে একদিন পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে গিয়েছিলাম। কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

বাল্যলীলাস্থানসমূহ দর্শন করতে করতে গেলাম—যে-আমবাগানে তিনি কীর্তনাদি করতেন এবং বহুবার সমাধিলাভ করেছিলেন (ইদানীং যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা কলেজ অবস্থিত), তাঁর পুণ্যদেহের স্পর্শে পবিত্রীকৃত হালদারপুকুর যেখানে তিনি স্নান করতেন, তাঁর বাড়ির পাশের ['যুগীদের'] শিবমন্দির ইত্যাদি। তাঁর জন্মস্থান এখনো ঠিক একইভাবে রক্ষিত আছে। সেখানে তখন একটি তুলসীগাছ রোপিত ছিল (ইদানীং সেইস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মিত হয়েছে)। সেই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দাদার ছেলে ছিলেন। তাঁকে দেখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে কী ধরনের প্রশান্তি থাকত, তার খানিকটা আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। তিনি বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা পূজিত রঘুবীরের বিগ্রহ আমাদের দেখালেন। তখন আমার মনে হলো ঃ আমি কি রঘুবীর-বিগ্রহের পূজা করতে পারব না? তখন শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটি বাণী আমার মনে পড়ল। এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন ঃ "তুমি সংসারে থেকে আমার পূজা করতে পার।"

পরের দিন সকালে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ভাই মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন ব্রহ্মচারী বিরূপাক্ষ এসে বললেন ঃ "শ্রীশ্রীমা তোমাকে ডাকছেন।" আমি ভিতরে গেলাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে একটি কুশাসনে বসতে বললেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ছবি দেখিয়ে ইশারায় বললেন ঃ "এইরকম ভাবে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর ধ্যান কর।" তখন তাঁর পাশে বসে তাঁর করুণাবিগলিত মুখমণ্ডল দর্শন করলাম। তিনি আমার দক্ষিণ কর্ণে দুটি মন্ত্র দিলেন। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না, কামারপুকুরে আমার মনে যে-ইচ্ছা উদিত হয়েছিল কি করে সেটা তিনি জানতে পেরেছিলেন। মন্ত্রদান অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ হলো। অঙ্গন্যাস-করন্যাসাদি কিছুই ছিল না। ব্রহ্মচারী বিরূপাক্ষকে ডেকে তিনি তাঁর মাধ্যমে আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ "এই মন্ত্র জপ করতে করতে ধ্যান করবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়কাল নেই, শুচি-অশুচি বাছ-বিচার নেই। অন্য কোন মন্ত্রের তোমার প্রয়োজন নেই। এতেই তোমার সমস্ত কল্যাণ সাধিত হবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশানুসারে সেই দিব্য মন্ত্রদ্বয় যথাযথ জপ করতে অসমর্থ হয়েছি। জীবনে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীনও হয়েছি। জপে আমার খুব বেশি আগ্রহও ছিল না। কেবল একটি জিনিস আমার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। আজও সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলিতে আমার চোখের সামনে বারংবার শ্রীশ্রীমায়ের সেই প্রেমঘনমূর্তি উদ্ভাসিত হয়। তাঁর নির্বাক মুখমণ্ডল থেকে উৎসারিত করুণাপ্রবাহকে আমি কি করে ভুলতে পারি! শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে মন্ত্র লাভ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার একসময় ছিল, কিন্তু কিভাবে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে তা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল। তাঁর কাছে গিয়ে তা বলার সাহসও আমার ছিল না। সেদিন আমি মায়ের বাড়ির সামনে বসেছিলাম। মা অকস্মাৎ আমাকে নিজের কাছে ডেকে অতি আদরের সঙ্গে মহামন্ত্র প্রদান করে গভীর স্নেহে আমাকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন সেকথা এবং তাঁর সেই দিব্য মুখমণ্ডল আজও আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে আমায় আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দেয়। এই জগতে আমার আর কী চাই? * ❑

* উদ্বোধন, ৯৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৪, পৃঃ ৬৮০-৬৮১

আমার জীবনে মায়ের কৃপাকণা

হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমার জন্ম ফরিদপুর জেলার কাশাতলী গ্রামে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মার্চ। আমার বাবা ফরিদপুর কোর্টের উকিল ছিলেন, কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে হয় বলে ওকালতি ছেড়ে দেন। জমিজমা থেকে যা আয় হতো তাতেই আমাদের সংসার ভালভাবে চলে যেত। যৌথ পরিবারে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোল এবং গৃহদেবতা লক্ষ্মী-গোবিন্দের নিত্যসেবা ছিল। স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতা আসি কলেজে পড়ার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময় কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে একটি মেসে থাকতাম। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বামীজীর আদর্শে সমাজসেবা করতাম। সেসময় যক্ষ্মারোগী বা কলেরারোগী মারা গেলে দাহ করার জন্য লোক পাওয়া যেত না। এইসব কাজে আমরা সর্বদাই এগিয়ে যেতাম। একদিন নিমতলা ঘাটে এক যক্ষ্মারোগীর মৃতদেহ সৎকার করে গঙ্গাস্নানের পর ভিজা কাপড়ে রাত দুটো নাগাদ মেসে ফিরছি। কলকাতায় তখন সব রাস্তায় গ্যাসের আলো ছিল না। অন্ধকার রাস্তায় কোন লোকজন নেই। স্বামীজীর আদর্শে নির্ভীক হতে শিখেছি, নির্ভয়ে যক্ষ্মারোগী, কলেরারোগীর মৃতদেহ সৎকার করেছি। কিন্তু সেদিন ঐ অন্ধকার রাস্তায় একা আসার সময় মনে একটা কেমন যেন ভয় হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন আমার পিছনে আসছে। পিছন ফিরে দেখি, অন্ধকারে যতটুকু বোঝা গেল, সাদা কাপড় পরা একটি মহিলা পিছনে আসছেন। মাথায় ঘোমটা দেওয়া। এত রাত্রে, এই নির্জন রাস্তায় এই মহিলা একা কোথায় যাচ্ছেন? মনের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক হলো। দ্রুত পা চালালাম। স্বামীজীর বই পড়ে ঠাকুরের প্রতি আকর্ষণ হয়েছিল। তাঁকে ভগবান বলে বিশ্বাস এবং ভক্তি করতাম। মাকে তখনো দেখিনি,

কিন্তু তাঁর কথা জানতাম। বেলুড় মঠে যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রে জানতাম মা সাক্ষাৎ জগজ্জননী। রাস্তায় একজন মহিলাকে ঐভাবে পিছনে আসতে দেখে ভয়ে মনে মনে ঠাকুর ও মাকে স্মরণ করতে লাগলাম। একটু পরে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, মহিলাটি তখনো পিছনে পিছনে আসছেন। মৃতদেহ দাহ করে ফিরছি, নির্জন রাস্তা, অন্ধকার, পিছনে শুভ্রবস্ত্রে একাকিনী এক মহিলা! এ কি কোন অশরীরী আত্মা? আরো বেশি করে ভয় যেন আমাকে গ্রাস করল। জোরে জোরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চারণ করে চলেছি—'জয় ঠাকুর, জয় মা'! শেষের দিকে প্রায় দৌড়েই চলেছি। শেষ পর্যন্ত মেসবাড়ির সামনে এসে সভয়ে পিছনে ফিরে তাকালাম। মহিলাটিকে আর দেখতে পেলাম না। অথচ তিন-চার মিনিট আগেও দেখেছি তিনি আমার পিছনে ছিলেন। ভাবলাম, কোথায় গেলেন তিনি? কে-ই বা তিনি? কেন তিনি আমার পিছন পিছন আসছিলেন শ্মশান থেকে সারাটি পথ? মেসবাড়িতে ঢুকে বন্ধুদের ঘটনাটি বললাম। বন্ধুরা শুনে হেসে বলল: "কলকাতায় অনেক রকম মহিলা আছে। তুই দেখতে সুন্দর বলে তোর পিছু নিয়েছিল।" আমার তা বিশ্বাস হলো না। যাই হোক, ভিজা জামাকাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। পথের ঘটনা মনে পড়ছিল, ঘুম আসছিল না। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি আমাকে বললেন: "দেখ হরেন, শ্মশান থেকে ফিরবার সময় তোর খুব ভয় করছিল। সেজন্য আমি তোর পিছনে থেকে তোকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিলাম। আমি জয়রামবাটীতে আছি। তোর সময় হয়েছে। তোকে আমি দীক্ষা দেব। তুই আয় আমার কাছে।" স্বপ্ন ভাঙলে ধড়মড় করে উঠে বন্ধুদের কাছে স্বপ্নের কথা বললাম। সকলেই বেলুড় মঠের ভক্ত, ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত। স্বপ্নের কথা শুনে সকলের খুব আনন্দ হলো। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল: "চল, আমরা সবাই জয়রামবাটী যাব। মাকে দর্শন করব।" আমি বললাম: "আমি আগে যাই। ব্যাপারটা সত্যি কিনা দেখে আসি, তোরা পরে যাবি।" দু-একদিন পর জয়রামবাটী রওনা হলাম। কিছুদূর ট্রেনে, পরে হেঁটে দুদিন

পর জয়রামবাটী পৌঁছলাম। রাস্তায় ঠাকুরের জন্য কিছু জিলিপি কিনেছিলাম। সেটি নিয়ে জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির সন্ধানে চলেছি। আমি বরাবরই একটু মুখচোরা ছিলাম। 'মায়ের বাড়িটি কোথায়?'—কাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, এমন সময় একজন লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?" আমি "হ্যাঁ" বলায় তিনি বললেনঃ "মা আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন।" লোকটি সঙ্গে করে আমাকে মায়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মায়ের বাড়িতে যেতেই দেখি মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে আমার সেই প্রথম দর্শন। মাথায় ঘোমটা আছে, কিন্তু ঘোমটাটি কপালের ওপরে থাকায় মুখখানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অবিকল সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃমূর্তি, কিন্তু এখন আর জ্যোতির্ময়ী নন, সাধারণ মানবী মূর্তি। কিন্তু সে যে কী রূপ, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। কোন কথা বলতে পারছি না, শুধু সঙ্গে নিয়ে আসা জিলিপির চাঙারিটি মায়ের হাতে তুলে দিলাম। মা সেটি হাতে নিলে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। স্নেহমাখা কণ্ঠে মা বললেনঃ "বোসো বাছা, কতদূর থেকে হেঁটে এসেছ। একটু বিশ্রাম কর।" বলে নিজেই পাখা হাতে হাওয়া করতে শুরু করলেন। একটু পরে মা আমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন এবং বললেনঃ "পুকুর থেকে স্নান করে এস। তোমাকে আমি দীক্ষা দেব।" আমার হাতে তিনি স্নানের জন্য তেল এবং একখানা ধুতি দিলেন। বললেনঃ "স্নান করে এই ধুতিটি পরে এস।" স্নান করে আসার পর দেখি মা পূজা করছেন। একটু পরেই পূজা শেষ হলে আমাকে ডাকলেন এবং সামনে একটি আসনে বসতে বললেন। আমার দীক্ষা হয়ে গেল। দীক্ষার পর মা বললেনঃ "খাওয়ার সময় তোমাকে ডাকব।" খাওয়ার সময় মায়ের সেবকদের মধ্যে একজন বললেনঃ "ভাই, তুমি মহা ভাগ্যবান এবং পুণ্যবান, মা তোমাকে ডেকে দীক্ষা দিলেন। আমরা মায়ের সেবা করি, কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি দীক্ষা হয়নি।" কলেজের পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে পরদিনই কলকাতা ফেরার কথা মাকে

জানালাম। মা বললেনঃ "এই তো সবে এলে, এখনই চলে যাবে?" আমি বললামঃ "মা, যেতেই তো দুদিন লাগবে। আজ না গেলে কলেজে পড়াশোনার ক্ষতি হবে।" মা আর কিছু বললেন না। বিদায় নেওয়ার সময় দেখলাম মায়ের দুচোখে জল। কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "বাগবাজারে শরতের কাছে খোঁজ রেখো কখন কলকাতা আসব। তখন দেখা কোরো।"

কিছুদিন পর আমার লেখাপড়ার পাট চুকল, কারণ দেশ থেকে বাবা চিঠিতে জানালেনঃ "তোমাকে আর পড়াতে পারব না। দাদার ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। তুমি রাজেনের কাছে যাও। সে তোমাকে একটি চাকরি দেবে।" 'রাজেন' আমাদের এক নিকট আত্মীয়। তিনি জজ ছিলেন। তিনি আমার জন্য একটি থানায় দারোগার চাকরি ঠিক করেছিলেন। চাকরির কথা জানিয়ে মাকে পত্র দিলাম। উত্তরে মা লিখলেনঃ

জয়রামবাটী

দীর্ঘজীবেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার বাবা তোমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহাই শুনিবে। তুমি এখন যেমন দেশের কাজ করিতেছ, থানায় দারোগার চাকুরি লইলে দেশের কাজ আরো ভালভাবে করিতে পারিবে।

তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করিবেন।

ইতি
আশীর্বাদিকা
তোমাদের
মা

মায়ের আদেশ অনুযায়ী আমি দারোগার চাকরিতে যোগ দিলাম। সেসময় দেশ জুড়ে যুবকরা স্বদেশী কাজকর্ম চালাত। তারা সকলেই ছিল

ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত। তারা দেশকে স্বাধীন করার কাজে ব্রতী ছিল। মা আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "থানায় দারোগার চাকুরি লইলে দেশের কাজ আরো ভালভাবে করিতে পারিবে।" মা কি বলতে চেয়েছিলেন আমি জানি না, তবে দেশসেবী ভাইদের কাজে আমি গোপনে সহযোগিতা করতাম এবং পলাতক ভাইদের নিজগৃহে রাখতাম। কাউকে চাকর, কাউকে রাখাল, কাউকে ঘোড়ার সহিস, কাউকে নৌকার মাঝি বানিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতাম। থানার হাজতে কিছু যুবককে আটকে রাখা হতো। তাদের ওপর যাতে কোন নির্যাতন না হয় সেটি আমি নিজে দেখতাম। অবশ্য এসমস্ত কিছুই খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হতো। মা কি তাঁর পত্রে এই অর্থেই "দেশের কাজ আরো ভালভাবে" করার কথা বলতে চেয়েছিলেন? আমার ধারণা, তা-ই হবে।

দারোগার কাজে আমার জীবন নতুন খাতে চলতে লাগল। থানায় থানায় বদলি হতে হতো। যখন যেখানে বদলি হতাম সেখানকার বিশিষ্ট ও শিক্ষিত লোকদের আমার কোয়ার্টারে এনে 'কথামৃত', স্বামীজীর বই একসঙ্গে পড়তাম, আলোচনা করতাম। বেলুড় মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঐ এলাকায় এলে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে কোয়ার্টারে নিয়ে আসতাম। মহারাজরা এলে কী আনন্দে যে দিনগুলি কাটত, কি বলব! ইতিমধ্যে আমার বিবাহ হয়েছে। আমার স্ত্রীও (ইন্দুবালা) এইসব কর্মে আমাকে খুব সহযোগিতা করতেন। পরবর্তী সময়ে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদের বাসায় অতিথি মহারাজদের কাছে ঠাকুরের আরাত্রিক ভজন, স্তব এবং গান শিখেছিল। আমার স্ত্রী স্বপ্নে স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

মা যতদিন দেহে ছিলেন ততদিন যখনই আমার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা চাকরি জীবনে কোন সঙ্কট আসত, আমি মাকে পত্রে জানাতাম। উত্তরে মা সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে তার নির্দেশ দিতেন এবং সেই অনুসারে আমার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মা কলকাতায় এলে আমি উদ্বোধনে মায়ের সঙ্গে দেখা করতাম। সাধ্যমতো মায়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতাম। একদিন উদ্বোধনে গিয়েছি, মাকে প্রণাম করছি,

মা বললেনঃ "তোমার কথাই বলছিলাম, আর তুমি এসে গেলে!" শুনে অভিভূত হয়ে আমি বললামঃ "মা, আপনার এত ভাল ভাল সন্তান থাকতে, আমার কথা আপনার মনে পড়ে?" মা বললেন (পাশে গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাকে দেখিয়ে)ঃ "ওদের জিজ্ঞাসা কর!" তাঁরা বললেনঃ "হ্যাঁ গো, মা তো এইমাত্র তোমার কথা বলছিলেন।" মা বললেনঃ "হ্যাঁ বাবা, মনে পড়ে। আমার সব সন্তানের কথাই আমার মনে পড়ে। আচ্ছা বাছা, তোমার মাকে আমাকে একবার দেখাবে?" একদিন আমার গর্ভধারিণী মাকে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। মা খুব খুশি হয়েছিলেন, গর্ভধারিণীও কৃতার্থ হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমার সহধর্মিণীকে মায়ের কাছে কখনো নিয়ে যাওয়া হয়নি। মায়ের ইচ্ছে ছাড়া তো কিছুই হয় না, নিশ্চয়ই সেটিও তাঁর ইচ্ছে ছিল। আমার সব কাজ যেন তাঁর ইচ্ছাতেই হয়, তাঁর ইচ্ছাতেই যেন আমি সারাজীবন চলি, এটিই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।* ❑

* বর্তমান স্মৃতিকথাটি লেখকের কনিষ্ঠা কন্যা **মীনা (শঙ্করী) সেনগুপ্তের** (বি. এম. রায় রোড, শীলপাড়া, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০০৮) সৌজন্যে পাওয়া গেছে। শ্রীমতী সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, তাঁর বাবার মৃত্যু হয় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কালীপূজার পরদিন। কালীপূজার দিন তাঁর সামান্য জ্বর হয়। পরদিন তিনি বলেনঃ "ঠাকুর-মার ফটো আমার মাথার পাশে রাখো। আমি শুয়ে শুয়ে তাঁদের দেখব।" মা কালীর একটি ফটো ছিল তাঁর খুব প্রিয়, সেটিও রাখতে বললেন। বললেনঃ "আমি আজ মায়ের সঙ্গেই চলে যাব।" সত্যিই মা কালীর বিসর্জনের দিন সজ্ঞানে ঠাকুর, মা এবং মা কালীর ফটো দেখতে দেখতে এবং মায়ের কাছে পাওয়া মহামন্ত্র জপ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত আরো জানিয়েছেন, তাঁর বাবার মৃত্যুর পর স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে তাঁর মার (হরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ইন্দুবালার) দীক্ষা হয়। তাঁর বাবাকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের বেশ কিছু চিঠি ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেগুলির একটিও সংরক্ষিত হয়নি।—**সম্পাদক**

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীমায়ের অন্ত্যলীলা-পর্বের দিনলিপি

উদ্বোধনে শেষ কয়েকদিনের কথা

স্বামী নির্লেপানন্দ

১৯২০ সাল

২৬ ফেব্রুয়ারি (স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মায়ের জীবনী অনুসারে ২৭ ফেব্রুয়ারি)—জয়রামবাটী থেকে রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ শ্রীমায়ের উদ্বোধনে আগমন।

২৯ ফেব্রুয়ারি—ঠাকুরের মহোৎসবে মায়ের বেলুড়ে যাওয়া, শ্যামাসঙ্গীত শোনা।

৩ মার্চ—শ্রীমার রোজ জ্বর।...

৪ মার্চ—দোলপূর্ণিমা, মার জ্বর চলছে। মায়ের পীড়ার জন্য থমথমে ভাব। সকলেরই প্রাণে আনন্দের অভাব।

৮ মার্চ—মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বেলুড় মঠ থেকে সকালে মাকে দেখতে এলেন। মা একটু ভাল। সাধের মানসপুত্রের সঙ্গে এই শেষ দেখা। মা নীরব, মহারাজ বিমর্ষ, গম্ভীর।

১৪ মার্চ—ম[illegible], কবিরাজী চিকিৎসা শুরু।

১৯ মার্চ—[illegible] শিবানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বিকেলে মাতৃদর্শনে আগমন।

২৬ মার্চ—রাত্রে মহারাজের ভুবনেশ্বর যাত্রা

২৭ মার্চ—অন্নপূর্ণা পূজা। জীবন্ত অন্নপূর্ণা শয্যাশায়িনী।

১৫ এপ্রিল—কবিরাজ শ্যামাদাস এলেন।

২৬ এপ্রিল—ডাঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (শরৎ মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর) ও ডাঃ কাঞ্জিলাল মাকে দেখলেন। মা ভালর দিকে নয়।

১ মে—বিপিন ডাক্তারের চিকিৎসা থেকে মায়ের চিকিৎসা ডাঃ প্রাণধন বসুর হাতে।

২ মে—ডাঃ নীলরতন সরকার প্রথম মাকে দেখলেন।

১২ মে—রামকৃষ্ণ বসুর সঙ্কটজনক অবস্থা। মার জ্বর চলছে।

১৪ মে—বেলা ৩-৪৫ মিঃ রামকৃষ্ণ বসুর দেহান্ত।

১৭ মে—ঠাকুরের কৃপায় মায়ের সেবার ত্রুটি নাই, অর্থের টানাটানি নাই। মাস্টার মশায়ের নোটে আছে, কাশীপুরে অন্তিম সেবায় অর্থাভাব। শশী মহারাজ একটি কমলালেবু (অসময়ের) তিনদিন ধরে খাওয়াচ্ছেন।... উদ্বোধনে বিজলী নাই, মায়ের জ্যোতির্ময়ী জীবন সব আলো করে রেখেছিল, তাও নেভার পথে। অগণন ভক্ত শোক-সাগরে।...

১ জুন—স্নানযাত্রা। শ্রীশ্রীমার অবস্থা একই। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিকী, প্রভুর ও মায়ের গঙ্গাতটস্থ লীলা-পুণ্যভূমি, সাধন সিদ্ধিস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘরখানি নিখিলের মহাতীর্থ।—অসীমের লীলাপথে নূতন তীর্থ রচিল এ জগতে।—রবি বাণী।

৫ জুন—মাকে দেখতে বহু সাধু আসছেন। ছোট বাড়ি, ভক্তে ভরা। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। ছোট উঠানে রাত্রে অনেকে শুচ্ছেন।

১৩ জুন—তিনতলার ঘরে মায়ের জন্য ১৫ দিন স্বস্ত্যয়ন—কপিল মহারাজ (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) পূজক।

১৭ জুন—দেখা যায় না এত ক্লেশ। চরম সঙ্কট চলছে। বহু ডাক্তার

কবিরাজ আসছেন। ঠাকুরের মূল পট, সিংহাসন তিন তলার ছাদের ঘরে ওঠানো হলো। মায়ের পালিশ করা বড় খাট সরানো। পুরু রোগশয্যা মেঝের ওপর। ঠাকুরের বেদীর দিকে মায়ের শ্রীমস্তক। কালাজ্বর ম্যালেরিয়ার ওপর চেপে মায়ের দেহ কঙ্কালসার।...

১৮ জুন—রথযাত্রা। মায়ের মহাযাত্রার সূচনা। রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজ এলেন। দিন দিন মা বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

১৬ জুলাই—মার অবস্থা খুব সঙ্কটজনক, অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞান নাই।

১৯ জুলাই—সারাদিন বৃষ্টি। একি প্রকৃতির কান্না!

২০ জুলাই—রাত্রি ১-১০, মহানিশায় মা ব্রহ্মলীনা। জগৎ মাতৃহীন।

২১ জুলাই—মায়ের সঙ্গে সকলে বেলুড়ের পথে। ফুলে ফুলে, মালায় মালায় ছয়লাপ। সীমন্তস্থল অপরিমেয় সিঁদুরে সিঁদুরে রঞ্জিত। সিঁদুরের খেলা। বাগবাজার থেকে বরাহনগর ভক্ত সন্তানদের স্কন্ধে সতীদেহ বাহিত। মিছিলের সঙ্গে একটানা অবিরাম রামনাম ভজন। পুরোভাগে নগ্নপদে বিশালবপু মায়ের শরৎ। ঐ সঙ্গে সঙ্ঘের অন্তিম বোল—ঘন ঘন আরাব—'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'। বরানগরের ভক্ত নারাণ দত্তের বাটীর উপরতলা হতে অবিরাম ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি। গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বেলুড় মঠে। গঙ্গার পশ্চিম কূলে নিবেদিতা স্কুলের মেয়েরা, মায়ের মেয়েরা দেবীদেহ স্নান ও নববস্ত্রে ভূষিতা করলেন। বেলা দুটোয় চন্দনচিতায় গব্য হোমাগ্নি জ্বলল, পাঁচটায় পূর্ণাহুতি—নির্বাণ। তারপর আবার লীলামুগ্ধ মহাকাশের শান্ত অশ্রু বিসর্জন! নৌকায় সবাই উদ্বোধনে ফেরা। উদ্বোধন যেন মহাশ্মশান—শূন্যপুরী।

২২ জুলাই—শরৎ মহারাজ বললেনঃ ''মা চলে গেলেন। তাঁর জীবনের আলো চিরদিন ভক্তদের পথ দেখাবে, শান্তি দেবে। * ❑

* আকর ঃ রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২১১; ২১২-২১৪।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গে স্বামী অরূপানন্দ

স্বামী সত্ত্বানন্দ

স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী) মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেই সূত্রে গোলাপ-মা ও যোগীন-মা প্রমুখ শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী-সেবিকাদের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বহু কথা তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিজের মুখ থেকে বা গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা প্রমুখের মুখ থেকে সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলেন। জয়রামবাটী, উদ্বোধন এবং বারাণসীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে অন্তরঙ্গ ও মূল্যবান প্রত্যক্ষ সংলাপ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তাঁর সুদীর্ঘ স্মৃতিনিবন্ধে বিধৃত রয়েছে। তার বাইরেও তাঁর স্মৃতিতে আরও অনেক ঘটনা ও কথা রক্ষিত ছিল। স্থানাভাবে এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের বলে সেগুলি 'মায়ের কথা'-য় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমান নিবন্ধের লেখক স্বামী সত্ত্বানন্দ স্বামী অরূপানন্দের স্নেহভাজন হওয়ার সুবাদে তাঁর মুখে শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে সেই অপ্রকাশিত ঘটনা ও কথার কিছু কিছু শুনেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধে তিনি তেমন কয়েকটি অপ্রকাশিত কথা ও ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং মঠ-মিশনের প্রবীণ ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী মুমুক্ষানন্দের সৌজন্যে আমরা বর্তমান নিবন্ধটি পেয়েছি। এ-সম্পর্কে সম্পাদককে লেখা মুমুক্ষানন্দজীর পত্রটি পাঠকদের সাহায্য করতে পারে ভেবে তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো। তাছাড়া মুমুক্ষানন্দজীর চিঠি থেকে পাঠক আলোচ্য স্মৃতিপ্রসঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত হবেন।—সম্পাদক

।। শ্রীরামকৃষ্ণঃ ।।

Tel. Office : Lohaghat

Advaita Ashrama

(A branch of the Ramakrishna Math, Belur)

P.O. MAYAVATI, VIA LOHAGHAT

DIST. PITHORAGARH, U. P., PIN 262 524

19-6-1999

প্রিয় পূর্ণাত্মানন্দ,

... পূজনীয় সত্যেন মহারাজ (স্বামী সত্ত্বানন্দজী) কয়েক সপ্তাহ এখানে ছিলেন, আলমোড়া আশ্রম থেকে এসেছিলেন। তিনি স্বামী অরূপানন্দজীর স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর কাছে সত্ত্বানন্দজী কিছু শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি ও প্রসঙ্গ শুনেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি এযাবৎ অপ্রকাশিত কথাও রয়েছে। আমার একাধিকবার পীড়াপীড়ির পর তিনি তা লিপিবদ্ধ করে দেন। তাঁর মূল লেখার একটি fair copy (আমার দ্বারা ঈষৎ সম্পাদিত) পাঠালাম। আমার মনে হয়, এটি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে ভক্তদের তথা রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের কল্যাণে আসবে।

মোটামুটি ভাল আছি। এখানে অন্যান্যদেরও মোটামুটি কুশল।

ভালবাসা শুভেচ্ছা জেনো।

প্রতি ঃ ইতি

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তোমাদের

সম্পাদক, 'উদ্বোধন', কলকাতা-৩ **মুমুক্ষানন্দ**

১৯৪৮-১৯৪৯ সালের কথা। আমি তখন কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ব্রহ্মচারী কর্মিরূপে রয়েছি। একদিন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে গিয়েছি বিকেলের পাঠের সময়। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বামী অরূপানন্দজীর (রাসবিহারী মহারাজের) স্মৃতিকথা পড়া হচ্ছিল। মাকে তিনি বলছেন ঃ "মা, এই অনন্ত সৃষ্টিতে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে? এই যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, ওতে কোন জীবের বাস আছে কিনা কে বলবে?" উত্তরে মা বললেনঃ "মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। ওসব গ্রহ-নক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।" (১৩৪৩ সং, পৃঃ ৭৮) কথাটা পড়ামাত্র আমার মনে হলো—এ তো সাংঘাতিক কথা! শ্রীশ্রীমা নিজের ঈশ্বরীয় স্বরূপকে তো প্রকাশ করেই দিলেন!

পাঠের পরে উঠান দিয়ে চলে আসছি। দেখি পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ শ্রীমন্দিরের বিপরীত দিকে, দ্বিতল বাড়ির নিচের বারান্দায় (রান্নাঘরের তরকারি কাটার জায়গায়) মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে

আছেন। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম। বললাম ঃ "মহারাজ, আপনি তো সাংঘাতিক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন আপনার লেখার মধ্যে।" তিনি জানতে চাইলেন আমি কোন অংশটার কথা বলছি। আমি তখন বললাম ঃ "মা বলছেন, 'মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে।' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার বলছেন, 'ওসব গ্রহ-নক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।' " শুনেই রাসবিহারী মহারাজ বললেন ঃ "তাহলে বোঝ, তিনি কোন Authority-তে (ক্ষমতাবলে) ওকথা বলতে পারলেন। একথার দ্বারা নিজেকেই (নিজের সর্বজ্ঞত্ব ও ঈশ্বরস্বরূপত্ব) প্রকাশ করে ফেললেন কিনা! এজন্য তোমাকে পূর্বে বলেছি, এখনো বলি, আমার diary-টি খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে, ভাসাভাসা নয়। তাহলে দেখতে পাবে, অনেক স্থলেই আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা নিজেকে অতি সহজ উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলেছেন। যেমন একস্থানে বলেছেন, 'এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ, হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।' (ঐ, পৃঃ ৪) বাস্তবিক আমি মনে মনে ঠিক ঐ ভাব নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আরেকস্থলে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'সূক্ষ্মশরীরে আবার আমাদের দেখা হবে', (ঐ, পৃঃ ৬) অর্থাৎ দেহান্তে শ্রীমা ও আমার আবার দেখা হবে।"

সেদিন রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা হয়। আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আপনি কত ভাগ্যবান! মা আপনার সঙ্গে কত সহজে আপনজনের মতো কথা বলেছেন, কাছে টেনে নিয়েছেন; আপনার প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে কত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলছেন, 'বাবা, তোমার সঙ্গে আমার যেমন খোলাখুলি কথা হয়েছে, এমন আর কারও সঙ্গে হয়নি।' (ঐ, পৃঃ ১২) ইত্যাদি। তাই আপনি অত 'মা' 'মা' করেন। আমাদের তো তেমন ভাগ্য হয়নি! কত পরে আমরা এসেছি। তাঁকে দর্শনও হয়নি, তাঁর স্নেহও পাইনি। আমাদের কেমন করে তাঁকে নিজের মা বলে মনে হবে?" উত্তরে রাসবিহারী মহারাজ বললেন ঃ "তা তুমি অভিমান করে ওরূপ যাই বলো না কেন, আমি কিন্তু কতবার মাকে বলতে শুনেছি, 'যারা পরে আসবে তারাও আমার সন্তান, দেখা না হলেও।' "

এরপর আমি বললামঃ "আচ্ছা মহারাজ, আপনাকে যখনি বলি, কিছু মায়ের কথা বলুন, আপনি কেবলই বলেন, 'আমার কাছে বলবার মতো যা কিছু ছিল আমি আমার স্মৃতিকথায় (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ) লিখে দিয়েছি। তা পড়েই দেখ না, তাহলেই জানতে পারবে।'—তা আপনি সবই কি সেখানে লিখেছেন? কিছুই কি আপনার কাছে থেকে যায়নি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "যা আছে সেসব personal (ব্যক্তিগত), তা বলা ঠিক নয়।" আমি তখন অভিমান করেই বললামঃ "বেশ, তাহলে ওসকল গোপনীয় কথা আপনার কাছেই সিন্দুকে চিরকাল বদ্ধ জিনিসের মতো থেকে যাক। আর শরীর তো একদিন যাবেই, তখন আমরা যথানিয়মে ঐ শরীর মণিকর্ণিকায় নিয়ে গিয়ে পাথরে বেঁধে মা গঙ্গার বুকে ডুবিয়ে দিয়ে আসব।[১] আর ফল হবে এই যে, ঐসকল মহামূল্য গোপনীয় তথ্যগুলিও মা গঙ্গার কোলেই চলে যাবে এবং চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। পৃথিবীর কারও আর জানবার সুযোগ থাকবে না।" আমার কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে কি জানি কি ভেবে বললেনঃ "আচ্ছা, একটা ঘটনা বলতে পারি, যদি কথা দাও কারও কাছে বলবে না।" উত্তরে বললামঃ "আচ্ছা, আপনার জীবনকালে কাউকেও বলব না।" এই শুনে তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেনঃ "জয়রামবাটীতে রয়েছি। মায়ের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মা তখন তাঁর পুরনো বাড়িতে (প্রসন্ন-মামার বাড়িতে) বাস করছেন। আমি ও ব্রহ্মচারী হেমেন্দ্র নতুন বাড়ির কাজের দেখাশোনা করছি। এমন সময়ে একদিন মামাদের মধ্যে একজন (নাম মনে নেই) এসে আমাদের সঙ্গে বৈষয়িক নানা কথা তুলে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া শুরু করে দিলেন। যতটা মনে পড়ছে, তিনি বললেন, 'দিদিকে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাকে) তোমরা সবকিছু দিচ্ছ আর আমাদের তোমরা ঠকাচ্ছ।' এজাতীয় কিছু কথা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁরা এজাতীয় কথা বলতেন। সেদিন একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমি বেশ বিরক্ত বোধ করলাম এবং একটু উত্তেজিত হয়েই সোজা মা-র কাছে চলে গেলাম। মা তখন প্রসন্ন-মামার

১ ঐভাবে কাশীধামে সাধুদের মৃতদেহের সলিল সমাধি দেওয়া হয়।

বাড়ির সামনে বারান্দায় উঠানের দিকে মুখ করে বাঁহাতে বারান্দার খুঁটিটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি উত্তেজিতভাবে গিয়েই মাকে বললাম, 'এত ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তির মধ্যে আমি কাজ করতে পারব না।' কথাটুকু বলেই আমি সামনের দিকে উঠানের পাশের ছোট চালাঘরটির দাওয়ায় বসে পড়লাম। মা কিন্তু বারান্দাতেই ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আমার কথা শুনে অতি শান্তভাবেই বললেন, 'তা না পার, না পারবে। এখানে কিন্তু এরকম।' কথাটি বলেই মা সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টির মতো তাকিয়ে রইলেন। তক্ষুণি আমি দেখলাম, মায়ের দণ্ডায়মান সম্পূর্ণ শরীর হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল এবং শরীরের চারদিকে একটা 'হ্যালো'-র (halo) মতো দেখা গেল অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা কিন্তু আর কোন কথা বললেন না। এদিকে ঐ দৃশ্য দর্শনের ফলে আমার সেই উত্তেজিত ভাব নিমেষে কোথায় চলে গেল এবং আমার ভিতরের ভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় মনে হলো—কার কাজ আমি করতে পারব না বললাম? সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ উদ্যম ও শ্রদ্ধা নিয়ে আবার কাজে যোগ দিলাম।"

এতক্ষণ আমি মহারাজের কথা ও বর্ণনাটি খুব মন দিয়ে অবাক হয়ে শুনছিলাম। কথা শেষ হতেই বললামঃ "রাসদা (আমি ঐভাবেই তাঁকে সম্বোধন করতাম), এমন একটি মূল্যবান কথা আপনি নিজের লেখায় উল্লেখ করলেন না? কারও কোনদিন এটি জানবার সুযোগ রইল না!" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুই পাগল হয়েছিস? এসব কথা কখনো লিখতে আছে? কেউ একথা বিশ্বাস করবে? অথচ আমি তো দিনের বেলাতেই এই চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখেছি। খবরদার! তুই কাউকেই এইটি বলিসনি।" আমি এটি কাউকেও বলিনি যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৯৫৭-তে তাঁর শরীর যাওয়ারও বহু পরে কথাপ্রসঙ্গে দু-তিন স্থানে মাত্র বলেছি।

রাসবিহারী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দুটি ফটো সম্বন্ধেও আমায় কিছু কথা বলেছিলেন। ইতিপূর্বেই আমি তা প্রকাশ করেছি।[২] * ❑

---

২ শ্রীশ্রীমায়ের ফটো সম্বন্ধে স্বামী অরূপানন্দের কাছে শ্রুত বক্তব্য (স্বামী সত্ত্বানন্দ কর্তৃক অনুলিখিত) 'যুগজননী সারদা' (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত) গ্রন্থে (তৃতীয় সং, ১৪০৮, পৃঃ ৪৬৯-৪৭২) প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ১০১তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ ১৪০৬, পৃঃ ৭০২-৭০৩

মাতৃসান্নিধ্যে ডাক্তার মহারাজ (স্বামী মহেশ্বরানন্দ)

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'ডাক্তার মহারাজ' বা স্বামী মহেশ্বরানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম— বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র। 'ডাক্তার মহারাজ'-এর নামের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠকগণ বিশেষ পরিচিত। শ্রীশ্রীমা পরিণত বয়সে জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ায় অবস্থানকালে ডাক্তার মহারাজের নিবিড় উপস্থিতি পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। পাঠকগণ আরও লক্ষ্য করেছেন, কী নিপুণ চিকিৎসাসেবা ডাক্তার মহারাজ নানা সময় মাতৃচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি-রূপে অর্পণ করেছেন! আরও লক্ষ্যণীয়, বৃত্তিতে অত্যন্ত সফল চিকিৎসক হয়েও, বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। সংসার-জীবনে প্রবেশ করেও, এক কন্যার জনক হয়েও বৈরাগ্যের আহ্বানে সংসারসুখ, আত্মীয়-পরিজন সঙ্গ, অর্থ-যশ সবকিছু উপেক্ষা করে নিজেকে ঠাকুর-মার চরণে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। মানসিকতায় যেমন ধর্মপ্রাণ, কর্মদক্ষতায় তেমনি উৎকৃষ্ট প্রচারক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন তিনি। সন্ন্যাসজীবনে ঠাকুরের নামাঙ্কিত একাধিক আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। সাধনভজন অব্যাহত রেখেও আজীবন বহু সংখ্যক আর্ত-পীড়িতের চিকিৎসাসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। কাশীর সেবাশ্রম নির্মাণকালেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া শহরে তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক। বহু দূর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিকাতর বহু মানুষ আসতেন তাঁর কাছে। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে তিনি হয়ে

উঠেছিলেন ধন্বন্তরী চিকিৎসক। তাঁর সাহচর্যে একাধিক ব্যক্তি প্রথানুগ পাঠক্রম অনুশীলন ব্যতীতই সুচিকিৎসক হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তী কালে।

ডাক্তার মহারাজের জীবনের চালচিত্র

ডাক্তার মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র। তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর (২৭ ভাদ্র ১২৯৭)। ১৯০৮ সালে বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার হসপিটাল) এল. এম. এফ. কোর্সে ডাক্তারি পড়েন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১২ সালে। ১৯১০ সাল থেকেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা শোনেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের প্রতি আগ্রহী হন। শ্রীশ্রীমার নানা প্রয়োজনে তাঁর আহ্বান এলে তিনি সবকিছু ছেড়ে মার কাছে হাজির হতেন। সে-আমলে ঐ অঞ্চলে চিকিৎসক পাওয়া যেত না। শ্রীশ্রীমার জীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, মায়ের প্রয়োজনে ভক্ত ও ব্রহ্মচারীগণ আরামবাগের প্রভাকর মুখোপাধ্যায় এবং বাঁকুড়ার ডাক্তার মহারাজকে ডাকতেন।

মাতৃসান্নিধ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ১৯১৩ সালে তাঁর মাতৃদর্শন ঘটে। বাঁকুড়ার বিভূতিভূষণ ঘোষের মাধ্যমেই তাঁর শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভ ঘটে। ইতিমধ্যে তিনি সংসারী হন এবং এক কন্যার (দুর্গাদেবী) জনক হন। তাঁর তীব্র বৈরাগ্যের কথা তিনি সংসারে ব্যক্ত করলে তাঁর পরিজনবর্গ প্রথমটা বিহ্বল হলেও পরবর্তী কালে তাঁরা তা কাটিয়ে ওঠেন। তিনি সংসারজীবনে প্রবেশ করেও সংসার ত্যাগে আগ্রহী হলে শ্রীশ্রীমা তাঁকে বার বার নিষেধ করেন। কারণ, তখনো তাঁর কন্যা নাবালিকা। ডাক্তার মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেই তবে সন্ন্যাসাশ্রমে যোগদান করছেন। মা সেকথা শুনে খুশি

হয়ে অনুমতি দান করেন।

১৯১৩ সালে শ্রীমা তাঁকে দীক্ষাদান করেন। দীক্ষার সময় তিনি মায়ের পায়ে একটি পদ্মফুল দিয়ে প্রণাম করেন। দীক্ষাশেষে মা সেই ফুলটি ডাক্তার মহারাজের হাতে ফেরত দেন। ডাক্তার মহারাজ সেই ফুলের একটি পাপড়ি নিয়ে একটি সোনার মাদুলির মধ্যে রেখে দেন। আমৃত্যু সেই মাদুলিটি তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রতিদিন স্নানের পর একটি বাটিতে গঙ্গাজল নিয়ে মাদুলি ধোয়া জল সেবন করে তারপর তিনি জলখাবার গ্রহণ করতেন।

১৯১৫ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে গন্ধেশ্বরী নদীর ধারে তিনি বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে সন্ন্যাস দান করেন। ১৯৩০ সালের বন্যায় মঠটি ধ্বংস হয়। তখন ডাক্তার মহারাজ ও আশু মহারাজ (স্বামী স্বস্বরূপানন্দ) ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ফটো নিয়ে এসে জনৈক ভক্তের গৃহে অবস্থান করেন। তারপর মায়ের সন্তান বিপিন দত্ত জায়গা দান করলে বর্তমানে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ সেখানে মঠ স্থাপিত হয়।

মায়ের পায়ের তলা খুব জ্বালা করত। বেশ কিছুদিন যাবৎ মা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। বরদা মহারাজকে (স্বামী ঈশানানন্দ) দিয়ে ডাক্তার মহারাজকে খবর দেওয়া হলো। মা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। মহারাজ কোয়ালপাড়ায় থেকে মায়ের চিকিৎসা করতে থাকেন। মা অচিরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ডাক্তার মহারাজ নিজে ছিলেন এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক, কিন্তু গরিব-দুঃখীর সুলভ চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতে শুরু করেন। কোয়ালপাড়ায় মায়ের চিকিৎসা প্রসঙ্গে জয়রামবাটীর এক প্রাচীন সন্ন্যাসীসূত্রে একটি ঘটনার সংবাদ জানা গিয়েছে। ঘটনাটি হলো—

কোয়ালপাড়ায় মা ডাক্তার মহারাজকে ওষুধ দিতে বলেন। ডাক্তার

মহারাজ রোগীদের প্রথমে মুখে একফোঁটা ওষুধ দিতেন, তার পর পুরিয়া করে ওষুধ দিতেন। ডাক্তার মহারাজ তাঁর বাক্স খুলে মায়ের জিবে একফোঁটা ওষুধ দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু মায়ের মুখে ওষুধের ফোঁটা ফেলতে গিয়ে ডাক্তার মহারাজ স্তব্ধ হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ মা বলে উঠলেনঃ "কি গো বৈকুণ্ঠ, ওষুধ দাও!" ডাক্তার মহারাজ চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। তিনি মায়ের মুখে ওষুধ না দিয়ে শিশিটিকে পুনরায় বাক্সে রেখে দিলেন। তারপর মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালেন। মা বললেনঃ "কি হলো বৈকুণ্ঠ, আমায় ওষুধ দিলে না?" ডাক্তার মহারাজ কম্পিত দেহে বললেনঃ "দিচ্ছি, মা। তবে মা, এ কী দেখলুম!" মা কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেনঃ "বাবা, আমাশায় খুব কষ্ট পাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ওষুধ দাও।" মহারাজ ওষুধের পুরিয়া মার হাতে দিয়ে বললেনঃ "এখনই খেয়ে নিন।" পরবর্তী কালে ডাক্তার মহারাজ বলেছিলেন যে, তিনি মায়ের মুখে জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রীর মুখ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেজন্য সরাসরি শিশি থেকে ওষুধ দিতে সাহস করেননি। পরবর্তী কালেও তিনি কখনো ঐভাবে আর মাকে ওষুধ দেননি।

মায়ের নির্দেশে ডাক্তার মহারাজ বাঁকুড়া মঠে দাতব্য চিকিৎসার কাজ শুরু করেছিলেন। মা তাঁর পায়ের বাতের জন্য ডাক্তার মহারাজেরই ওষুধ খেতেন এবং তাতে উপশম পেতেন। মায়ের আশীর্বাদে তিনি বাঁকুড়ায় ধন্বন্তরী চিকিৎসকে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি বাঁকুড়া মঠ ও মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি রামহরিপুর কেন্দ্রও পরিচালনা করতেন। অল্প কিছুকালের জন্য তিনি বৃন্দাবন সেবাশ্রমেরও অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ডাক্তার মহারাজের ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ

ডাক্তার মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য ও একসময়ের সেবক সাধন মণ্ডল ডাক্তার মহারাজের ডায়েরির কয়েকখানি পৃষ্ঠা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, যার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাবে।

১৯১৩ সাল—(বাঁকুড়ার) বিভূতি ঘোষের অনুপ্রেরণায় উদ্বোধন বাটীতে (তখন ১৩ নং গোপাল নিয়োগী লেন) শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শনলাভ করি। মা তখন খাটে পা মেলে বসেছিলেন। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালে তিনি আমার দাড়ি ধরে চুমা খেলেন। সঙ্গে ছিলেন বিভূতিবাবু ও নির্মল ব্যানার্জী (উকিল)। এর দু-তিনমাস পরে আমার দ্বিতীয় দর্শন ঘটে জয়রামবাটীতে। মা তখন সেখানে অবস্থান করছেন। জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে আমি স্বপ্নে দেখলাম মা আমায় দীক্ষা দিচ্ছেন। তার দু-তিনমাস পরে সম্ভবত জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমা কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিলেন। এই বছরই মহাষ্টমীর দিন উদ্বোধনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি একখণ্ড গেরুয়া ধুতি দেন এবং বলেনঃ "বেলুড় মঠে আমার নাম করে পরে একসময় রাখালকে বোলো, সে তোমায় সন্ন্যাস দেবে।"

১৯১৬ সাল—... বেলুড় মঠে যাই এবং উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।...

১৯১৭ সাল—এই সময় মা জয়রামবাটী থাকাকালে একাধিকবার তাঁর দর্শনলাভের সুযোগ হয়। মার অসুখের সংবাদ পেলে মধ্যে মধ্যে জয়রামবাটী গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম। সেজমামীর একবার বুকে abcess (ফোঁড়া) হয়।[১] Operation করতে হয়। প্রথমটা আমি operation করতে চাইনি। শেষে মায়ের নির্দেশ মতো আমাকেই operation করতে হয়। মা আমাকে সাহস দিয়ে বলেছিলেনঃ "আমি তোমার সঙ্গে থাকব, তুমি ছুরি ধরো।" আমি মায়ের আশীর্বাদে ছুরি

১ এবিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা গ্রন্থে (স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৫, পৃঃ ৬০) উল্লেখ আছে।

ধরেছিলাম। সেজমামী ভাল হয়ে উঠেছিলেন। সেজমামী ভাল হওয়ার পরে মা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন।

১৯১৮ সাল—সে-সময় কোয়ালপাড়ায় মার শরীর খুব খারাপ হয়। আমি সেখানে থেকে মায়ের চিকিৎসা করি। এই বছর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় জয়রামবাটীতে ছিলাম। সে-সময় গণুর (গণপতি) বোন বিমলার জ্বর খুব খারাপ অবস্থায় যায়। আমি চিকিৎসা করেছিলাম। মা তাকে দেখতে যান। মায়ের কাছে গণুর মা খুব কান্নাকাটি করেন। মা জগদ্ধাত্রীর নিকট তার আরোগ্য কামনা করলে বিমলা শীঘ্র সেরে ওঠে।[২]

১৯১৯ সাল—চৈত্র মাস, মা তখন কোয়ালপাড়ায় আছেন। শ্রীশ্রীমা ভূদেবের কাছ থেকে আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে শুনে একদিন আমায় বললেনঃ "বৈকুণ্ঠ, তোমার জন্য দুখানা কাপড় আমার কাছে আছে, নিয়ে যাবে।" এরপর রাধুর প্রসবের সময় আমি কোয়ালপাড়ায় থাকি। রাধুর প্রসবকালে একটু তাড়াতাড়িতে perenial rupture হয়ে যায়; সেরকম সূচ না থাকায় দেশী সূচকে sterilize করে তার সাহায্যে catgut দিয়ে সেলাই করতে হয়। তাতেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ভাল হয়ে যায়।[৩] ঐ সময় ভবেশানন্দ (ফণি মহারাজ) মিলিটারিতে কাজ করতেন। তিনি কোয়ালপাড়ায় একদিন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন। তিনি মাকে

---

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "জগদ্ধাত্রীপূজার আগের দিন সুবাসিনী দেবীর ছোট কন্যা বিমলার পা ফুলিয়া জ্বর হইল ও সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডাক্তার বৈকুণ্ঠ মহারাজ (সন্ন্যাস নাম মহেশ্বরানন্দ) ঔষধ দিয়া মাকে বলিলেন, 'আপনি বললেন, তাই একদাগ ওষুধ দিলাম। ধাত নেই—ওষুধ গড়িয়ে পড়ে গেল।' এই সংবাদ পাইয়া শ্রীমা তাঁহার নূতন বাড়ি হইতে সুবাসিনী দেবীর বাড়িতে আসিতেই সুবাসিনী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পদরজ লইয়া জল মিশাইয়া বিমলার মুখে দিলেন। শ্রীমা বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে বলিলেন, 'কাল তোমার পুজো হবে, মা, আর বড় বউ হাউ হাউ করে কাঁদবে?' রাত্রে বিমলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।" (৪র্থ সং, পৃঃ ৪১৯)

৩ এবিষয়ে শ্রীশ্রী সারদা দেবী গ্রন্থে (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৪০৭, পৃঃ ১৯৫) উল্লেখ আছে।

একটি শাড়ি দিয়ে প্রণাম করেন। পরে কার্যস্থানে (মেসোপটেমিয়ায়) ফিরে গিয়ে এক বিস্তারিত চিঠি লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন হয়তো আবার তাঁকে যুদ্ধের field-এ যেতে হবে; আর মাকে তাঁর দর্শন করার সুযোগ হবে না। আমি মাকে চিঠির কথা বললাম। মা আমায় বললেনঃ "কোন চিন্তা নেই। তাকে যুদ্ধে যেতে হবে না। আর যদি যেতেই হয়, যুদ্ধের স্থানে যে সব গর্ত থাকে তাতে সে লুকিয়ে থাকবে। তার কিছু হবে না।" আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের বিষয় মা সমস্ত জানলেন কি করে? বাস্তবিক মায়ের কথামতোই ঘটেছিল। যুদ্ধে ফণি মহারাজ অক্ষতই ছিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাওয়া কালে মাঝে মাঝে গগন (স্বামী ঋতানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে বকুল ফুলের মালা নিয়ে যেতাম। কী যে আনন্দ পেতাম তা বর্ণনা করা যায় না। পূজনীয় শান্তানন্দ মহারাজ, গগন, অমূল্য, দিবাকর প্রভৃতি সে-সময় কোয়ালপাড়ায় থাকত। তারা প্রত্যহ দুবেলা মাকে প্রণাম করতে যেত।

এই বছর শেষের দিকে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার দর্শনে গিয়েছিলাম। কিন্তু দর্শন হয়নি। বেলুড় মঠে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। শরৎ মহারাজের সে-সময় typhoid হয়েছিল। আমি শরৎ মহারাজকে দেখে ওষুধ দিয়েছিলাম।

১৯২০ সাল—২১ জুলাই ১৯২০ (৪ শ্রাবণ ১৩২৭) জগজ্জননী আমাদের মা লীলাসংবরণ করেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের একদিন আগে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। পরের দিন (২১ জুলাই) সাড়ে দশটার সময় সারদানন্দজীর নেতৃত্বে সাধু-ভক্তগণ গন্ধ-পুষ্প-মাল্যসহ শ্রীশ্রীমায়ের পূতদেহ যখন 'রামনাম' সংকীর্তন সহ বরানগর হয়ে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন এবং আমি মায়ের মুখের ওপর ছাতা ধরে বেলুড় মঠ অবধি গিয়েছিলাম। ❑

শ্রীশ্রীমার 'কালোমানিক' বিভূতি*

বিশ্বজিৎ ঘোষ

।।১।।

শ্রীমা সারদা দেবীর আজ অবধি প্রকাশিত বেশ কয়েকটি জীবনীগ্রন্থে এবং তাঁর পুণ্য স্মৃতিগ্রন্থ 'মায়ের কথা', 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' প্রভৃতি পুস্তকে মায়ের ভক্তসন্তান বিভূতি ঘোষের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভূতিবাবুর নামে কোথাও স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়নি। বিভূতিবাবুর নাতি শ্রীমান বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁদের সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত বিভূতিবাবুর নিজের হাতে লেখা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ স্মৃতিকথাগুলি আমাদের দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে বহু ঘটনাই উপাদানরূপে শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলিতে ইতিমধ্যেই গৃহীত। তবে সেই আংশিক ঘটনাগুলি নিম্নোক্ত স্মৃতিচারণায় স্থান-কাল ইত্যাদির যথাযথ উল্লেখে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। কিছু নতুন কথা ও ভাব তো আছেই। আবার পুরনো ঘটনাগুলিও নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত। বিশেষ করে মায়ের মুখের কিছু উক্তি, তাঁর ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি যা বিভূতিবাবু শুধু নিজের জন্যই আঞ্চলিক ভাষায় লিখেছিলেন। সেখানে ধারাবাহিকতা না থাকলেও এবং ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও স্মৃতিকথার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। ভক্তদের পক্ষে এটি এক অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি বলা যায়। আশা করি পাঠকবর্গ এই স্মৃতিকথা পড়ে আনন্দিত হবেন।—**সম্পাদিকা, 'নিবোধত'**

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বর্ধমান থেকে ৮-১০ মাইল দূরে বাঁকুড়া জেলার সীমানায় খণ্ডঘোষ গ্রাম। এখানে বিভূতিবাবুর পূর্বপুরুষ পীতাম্বর ঘোষ বাস করতেন। গ্রামগুলি প্রায়ই দামোদর নদের বন্যায় প্লাবিত হতো। সেখানকার বাসিন্দাদের দুঃখ-কষ্টের তাই সীমা ছিল না।

* এই নিবন্ধটি দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র 'নিবোধত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সংশ্লিষ্ট তথ্যসূচী নিবন্ধের শেষে দেওয়া হয়েছে।—**সম্পাদক**

শ্রীশ্রীমা একসময়ে বিভূতিবাবুর মুখে এই দুঃখের কথা শুনে বলেছিলেনঃ "বিভূতি, তুমি বেনো দেশে থেকো না।" বিভূতিবাবু তখন মাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "কোথায় থাকব মা?" মা উত্তরে বলেছিলেনঃ "বাঁকড়ো-ফাঁকড়োতে একটা জায়গা জুটে যাবে।" সুতরাং বিভূতিবাবু মায়ের নির্দেশে বা ইচ্ছায় বাঁকুড়া জেলারই অন্য জায়গায় গৃহনির্মাণ করেন।

বিভূতিবাবুর জন্ম তাঁদের আদি বাসস্থান খণ্ডঘোষ গ্রামে। পিতা বিনোদবিহারী ঘোষ ছিলেন আইনজীবী, মা রোহিণীবালা আদ্যাশক্তির উপাসনা করতেন, খুবই ধর্মপ্রাণা ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনিও শ্রীসারদা দেবীর কৃপালাভ করেন এবং মায়ের বাড়িতে থাকাকালীন মায়ের চুল বাঁধা ইত্যাদি ছোটোখাটো ব্যক্তিগত সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বিভূতিবাবু খণ্ডঘোষ গ্রামে থেকেই স্কুলের পড়া শেষ করেন। বাঁকুড়ার ওয়েশলিয়ন কলেজের (বর্তমানে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের) তিনি প্রথম ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কলা বিভাগে স্নাতক হন। পরে কলকাতা ল' কলেজে ভর্তি হন। ভগিনী নিবেদিতাও একসময় তাঁকে বাগবাজারের বোসপাড়ায় রেখে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি ওকালতি পরীক্ষা দেননি।

ছাত্রজীবনে বিভূতিবাবু জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে তদানীন্তন বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা—অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। রাজনীতির কারণে একসময়ে তাঁকে বারাণসীতে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। ১৯০৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বিভূতিবাবু ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের সঙ্গে প্রথম বেলুড় মঠে যান। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। সেই সূত্রে ধীরে ধীরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, ঠাকুরের ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং স্বামীজীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) প্রভৃতি অনেকেরই সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের পুণ্য সান্নিধ্য লাভ করেন।

১৯০৯ সালের ১৫ নভেম্বর জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীমা সারদা দেবীকে প্রথম দর্শন করেন। ১৯১২ সালে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন শ্রীশ্রীমার কাছে তাঁর দীক্ষালাভ হয়। বাঁকুড়ায় থাকার জন্য গ্রামেগঞ্জে তাঁর চেনা-জানা অনেক মানুষ ছিল, যোগাযোগও ছিল প্রচুর। তাই অনেক ব্যাপারেই শ্রীশ্রীমা তাঁর এই উচ্চশিক্ষিত সন্তানের ওপর নির্ভর করতেন। পরবর্তী কালে তিনি বাঁকুড়া জেলার বহু সেবামূলক ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ জেলার পৌরসভার সহ-পৌরপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বহু বিশিষ্ট মানুষ বিভূতিবাবুর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাঁকুড়ার শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।

মায়ের স্নেহধন্য সন্তান বিভূতিবাবুর পরিচয় ছিল 'শ্রীশ্রীমায়ের কালোমানিক' নামে। বাঁকুড়া থেকে মায়ের কাছে তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করতেন এবং পত্রালাপও করতেন। মা তাঁকে লিখেছেনঃ "তোমার জ্বর শুনিয়া দুঃখিত আছি। তুমি যখন আসিবে তখন আমার বাতের জন্য ঘি আনিবে।..." আবার লিখেছেনঃ "তোমার (বিভূতিবাবুর) প্রেরিত পার্সেলে দুটি পাকা আম, আমের আচার এবং সেজবধূর ঔষধ পাইলাম। পয়সা খরচ করিয়া মিছামিছি টক আম ক্রয় করবার কী প্রয়োজন ছিল?" মা ও সন্তানের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এই সমস্ত পত্রালাপে ফুটে উঠেছে। বিভূতিবাবুর বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে মঠ-মিশনের সাধু-ভক্তেরা যাতায়াত করতেন। বিভূতিবাবুর আরেকটি বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি বশীশ্বর সেন ও মতীশ্বর সেনের সঙ্গে গুপ্ত মহারাজের শেষ জীবনে খুব সেবা করেন। গুপ্ত মহারাজও এই যুবকদের খুব ভালোবাসতেন। শ্রীশ্রীমা ওঁদের সেবার কথা শুনে মন্তব্য করেছিলেনঃ "ওরা গুপ্তর সেবা করেছে, ওদের আবার তপস্যা কি?" নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিভূতিবাবুকে খুবই স্নেহ করতেন। শেষজীবনে তিনি নিজের কাছে রাখা বামাকালীর ছবিটি বিভূতিবাবুকে দেন। বিভূতিবাবু সেই ছবিটি গৃহস্থের ঘরে রাখা আদৌ উচিত কিনা সেকথা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন। মা সেটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বাড়িতে রাখার অনুমতি দেন। তাঁর বাড়িতে ইতিমধ্যে স্বপ্ন দিয়ে

আসা শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাও হয়ে আসছিল। অবশ্য তাঁদের কুলদেবী ছিলেন ত্রিপুরসুন্দরী। বিভূতিবাবুর প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-পরিজনদের প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাশ্রিত ছিলেন। মায়ের স্নেহধন্য বিভূতি ১৯৭৫ সালে প্রায় ৯২ বছর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়েরই [দেওয়া?] নাম জপ করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

বিভূতিবাবুর ডায়েরি থেকে সংগৃহীত তথ্য

বেলুড় মঠে প্রথম আগমন

সাল ১৯০৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব। আমার (বিভূতিভূষণ ঘোষের) প্রথম বেলুড় মঠে আসা ১৯০৭-এ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব দর্শনের জন্য। এরপর বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে 'বাঙ্গালের বাক্যধর' কবিতা পাঠ করতে শুনি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "রামচন্দ্রে যে শক্তির বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণে যোলো, সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ।" আমি শুনে (তখন কলেজের ছাত্র) বললুমঃ "বলেন কি মশায়? 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'।" আমার কথা শুনে রাগত হয়ে বললেনঃ "কার সাধ্য আমার সঙ্গে তর্ক করে!..." সব শুনে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল আমার পাশে এসে বসলেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন—পরে ঠাকুরের ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে নিয়ে আসেন।

ডাক্তারবাবু আমাকে বেলুড় মঠেও নিয়ে যান। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমাকে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে খানিক পরে জ্ঞান মহারাজের ঘরে নিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই জ্ঞান মহারাজ বলে উঠলেনঃ "যাও তো একবার গোয়াল ঘরে, নাগরীর ছানি ঘোল[১] খাবার ডাবাটায় খুব গন্ধ হয়েছে, পরিষ্কার করে দিয়ে এসো।" আমি গোয়ালে গিয়ে একটি বালতি করে জল নিয়ে এসে পরিষ্কার করে

---

১ খড় টুকরো টুকরো করে কেটে খোল, জল, নুন দিয়ে মেখে গোরুর যে খাদ্য প্রস্তুত হয়। এক কথায় জাবনা।

মহারাজের কাছে ফিরে এসে বললাম (নিজের হাতটা শুঁকে): "হ্যাঁ মহারাজ, খুব গন্ধ হয়েছিল।"

এরপর ল' কলেজে পড়ি (১৯০৭)। প্রায় সন্ধ্যায় কলেজের ক্লাস হওয়ার পর মঠে যাই। গুপ্ত মহারাজের কাছে থাকি, ওঁর ঘরে শুই। কিছুদিন পরে বিষ্ণুপুরের বশী সেন, গুরুদাস ও অমূল্য আমার সঙ্গে তাঁর কাছে যায়।

শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রথম দর্শন

আমার সদ্য বালবিধবা ভগিনী প্রমীলা বসু শ্বশুরবাড়ি কোয়ালপাড়া গ্রাম থেকে তার অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে আমাকে চিঠি দেয়। সেই চিঠি পেয়ে কাকভোরে তার বাড়ি পৌঁছাই। তার কুশল সংবাদ নেওয়ার পর জয়রামবাটী যাওয়ার রাস্তা জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শিরোমণিপুর, শিহড় গ্রাম হয়ে জয়রামবাটীর উদ্দেশে যাত্রা করি। শ্রীমাকে ইতিপূর্বে দর্শন করিনি। যাওয়ার পথে শিহড় গ্রামে রাস্তার ধারে এক ময়রানী তাদের ময়রার দোকানে গোবরের মাড়ুলী[২] দেওয়ার পর বিরি [বিউলী] কলাইয়ের খেমী (খামী) বাটছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম জিলিপি হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার কর্তা জিলিপি তৈরি করে একটা খাঁচি (চ্যাঙারি) করে পাঁচ টাকার জিলিপি দিল। আমি জিলিপি নিয়ে মায়ের নিকট যাই।

১৯০৯ সালের ১৫ নভেম্বর বেলা সাড়ে নটায় মাকে প্রথম দর্শন হয় জয়রামবাটীতে বড়মামার সদর দরজার সামনের উঠানে। সেই সময় দেখি চশমা চোখে এক বৃদ্ধা উঠানে পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন (তিনিই ভানুপিসি): "মা চান করতে গেছেন। একটু দাঁড়াও, মা এখনি আসবেন।" আমি পূর্বমুখে দাঁড়ালুম। একটু পরে মা সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকলেন, ডান হাতে সেই মা-র জার্মান সিলভারের (তলাটা চাপটা) জলশুদ্ধ ঘটি, বাঁ হাতে নিঙড়ানো ভিজে

---

২ গোবরের মাড়ুলী—ভোরবেলায় বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গোবর জল হাতে গোল করে ঘুরিয়ে প্রত্যেক দরজায়, সদর দরজা, উঠানের মাঝখানে তুলসীতলায়, ধানের মড়াইয়ের জায়গায় যে মঙ্গল চিহ্ন দেওয়া হয়।

কাপড়। আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে আসছেন। ভানুপিসি বললেনঃ "মা দেখুন, কেমন একটা ছেলে এসেছে।" মা বাঁদিক ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমার কি পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে?" আমি বললুমঃ "হ্যাঁ মা।" মা-র পিছনে পিছনে গিয়ে মা-র হাতে জিলিপির চ্যাঙারি দিলুম।

দুপুরবেলায় পশ্চিম দুয়ারি (গজ দুয়ারি)[৩] ঘরের পিঁড়েতে (খোলা বারান্দায়) একটা বড় শালপাতায় খুব বেশি ভাত, ওপরে একটা তুলসী পাতা—পাশে তরকারি, বাটিতে জল, খেতে দিলেন। আটটা বিড়াল আমার সামনে ও দুপাশে—অর্থাৎ তিনদিকে বসল। আমি খাই আর দুটি দুটি করে বিড়ালদের খেতে দিই। মা ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় দেখলেন। খেলুম, পুকুর ঘাটে হাত ধুতে গেলুম, পাড়ের ধারে পাতা ফেললুম। ঘাটের পশ্চিম পাশে একটা জামগাছ। ঘাটের ধার থেকে একটা লতা জামগাছে উঠেছে, পুকুরের জল কমে গেছে, একটি বড় গোছা শিকড় উঠেছে, ঝুলছে দেখলুম। শিকড়গুলি জল স্পর্শ করার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। ফিরে এসে মাকে লতার কথা বললুম। মা শুনে বললেনঃ "তুমি দেখেছ?" আমি বললুমঃ "হ্যাঁ মা।" পরে বললেনঃ "তোমাকে আর কী বলব? তুমি তো সব জানো।"

বিভূতিবাবুর পড়াশোনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের জিজ্ঞাসা

শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "পাস করার জন্য অনেক পড়েছিলে?" আমি বললুমঃ "মা কখন পড়ব? বাবা মারা গেছেন, পরীক্ষার আগে অনেক বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে যেখানটা বেরুল সেটা পড়ে পরীক্ষা দিলুম।" মাঃ "তবে ঠাকুর তোমাকে পাস করিয়ে দিয়েছেন।"

আরেকদিনের ঘটনা

আরেকদিন মধুর মা বলেনঃ "বিভূতি, তুমি ঠাকুরকে দেখেছ?"

শ্রীশ্রীমাঃ "বিভূতি আমার তখন হয়েছিল।"

---

৩ গজ দুয়ারি—সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছোটো যে দরজা।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বিভূতির দীক্ষা—১৯১২, অক্ষয় তৃতীয়া

খোকা মহারাজঃ "মা, ছেলেটিকে কিছু দিন।"

মাঃ "তোমরা দাও।"

—"আপনি থাকতে আমরা?"

—"আচ্ছা ওকে ডেকে দাও।"

১৯১২, তিথি অক্ষয় তৃতীয়। সকালে নদীতে স্নান করে এসে মার ঘরের পিঁড়েতে (খোলা বারান্দায়) দাঁড়াতেই মা বললেনঃ "বোসো তোমাকে মন্ত্র দেব।" (আসন পাতা ছিল) বসলুম, মা আমার ডানহাতের আঙুলের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আরম্ভ করে নিজের আঙুল দিয়ে দুইবার জপ করে দিলেন। আমিও করলুম। আমাকে বললেনঃ "ঠাকুর (ঠাকুরের ফটোর দিকে দেখিয়ে) তোমার গুরু। ওঁর ধ্যান করবে।" আমি অনুরূপ করছি। কখন তিনি উঠে ভাঁড়ার ঘরের দিকে গিয়েছেন, তা দেখিনি। মা সামনের ঘরের ভিতর থেকে এসে বললেনঃ "তোমাকে আবার মন্ত্র দেব।" পূর্বের মতো অনুরূপ জপ করে দিলেন। আমি বললুমঃ "মা, অতসব করতে পারব না।" মা বললেনঃ "যতদূর পারবে করবে। আমি ঠাকুরকে বলে দেব। তোমাকে আর কী বলব? তুমি তো বাবা সব জানো। তুমি বাবুরামকে বোলো। আমি কি কিছু করি? ঠাকুরই সব করেন।"[৪]

তিনিই সীতা

জয়রামবাটীর পুরনো বাড়িতে পিঁড়ের দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকালে আমি মাকে বললুমঃ "মা, কাল কী সুন্দর রামের গান শুনলুম (সিংহবাহিনীর মন্দিরের সামনে)। মা, রাম কেমন ছিলেন?" মা 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' উচ্চারণ করে বললেনঃ "এবার অনেক বড়।"—মা স্থির, নিস্পন্দ।

---

৪ বিভূতিবাবু তাঁর বড় মেয়ে দুর্গারানী মজুমদারের মেয়ের বিয়েতে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটির পুরোপুরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাগবাজারের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সরস্বতী পুজো

১৯১১ সাল। কাশীধাম থেকে মা কলকাতায় ফিরেছেন। রাধু, ভূদেব প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে। নলিনী, ছোটোমামী সবাই কলকাতায় আছেন। সরস্বতী পুজো। ভূদেবের আগ্রহে কুমোরটুলী থেকে একটি ছোটো সরস্বতী মূর্তি আনা হয়েছে। শ্রীমা-ই পুজো করছেন। পুজোর পর আমি মা সরস্বতীকে প্রণাম করতে গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ানো মাকে প্রণাম করে সরস্বতীকে প্রণাম করলুম। মা বললেনঃ "তোমার সুবুদ্ধি হোক।" বাগবাজারের শ্রীশ্রীমার বাড়িতে ঠাকুরঘরে ঐ পুজো হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের গীতাপাঠ শ্রবণ ও ব্যাখ্যা

আরেকদিনের ঘটনা। ১৯১১ সাল, ২১ নভেম্বর কাশীধামে কালীপুজোর পর, লক্ষ্মীনিবাসে বেলা দশটা নাগাদ বললেনঃ "বিভূতি, তুমি আমাকে দশম অধ্যায় 'বিভূতিযোগ' শ্রবণ করাও।" আমি পড়ে যাচ্ছি। "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" পড়ার পর মাকে জিজ্ঞাসা করলুমঃ "মা, মার্গশীর্ষ মানে কি?" মা উত্তর করলেনঃ "অগ্রহায়ণ মাস।" (বিভূতি মনে মনে মাকে পরীক্ষা করছিলেন)। পড়ার সময় বললেনঃ "ছোট বউ কাল সারা রাত্রি গাল দিয়েছে—'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক'। বিভূতি, ছোট বউ জানে না, আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি।"

মনে পড়ে, জয়রামবাটীতে মা স্মিতমুখে অপর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "বাবা, ছয় গণ্ডায় কত হয়?" "ছয় গণ্ডায় চব্বিশ হয় মা!"—এই উত্তর শুনে তিনি ছোট মেয়ের মতো হাসতে থাকেন।[৫]

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুর যাত্রা

লালবাঁধের ঘাটে শ্রীশ্রীমা ঘোড়ার গাড়ি করে চলেছেন (আমি কোচ বাক্সে)। [পথে] গাড়ির ঘোড়া দুটোর সামনে মোটা পৈতা পরা খালি গা ব্রাহ্মণ শুয়ে আছেন। দেখে আমাকে বললেনঃ "বিভূতি, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ!" আমি বললুমঃ "হ্যাঁ মা। উনি রূপ ভট্টাচার্যি মশাই। ঠাকুর

৫ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ১১ এবং বিভূতিবাবুর গীতার ১ম পৃষ্ঠা থেকে এবং ডায়েরি থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি সংগৃহীত।

যখন শিহড়ের রাজারামদের ফৌজদারি মকদ্দমার সাক্ষী দিতে পালকি করে বনমধ্যে লাল বাঁধের ঘাটে আসেন, বেহারারা পালকি নামিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, ঠাকুর চটি পায়ে দিয়ে এ-ধার ও-ধার ঘুরছেন, আবাঠার গন্ধ পেয়ে ভাবছেন, 'জলমধ্যে বাঁধের ঘাটে আবাটার গন্ধ পাচ্ছি! একি!'—এমন সময় মা মৃন্ময়ী কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে দেখা দিলেন। সেখানেই ইনি সর্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠা করলেন।''[৬]

শ্রীশ্রীমা দিনক্ষণ খুব মানতেন

আরেকদিনের কথা—''বিভূতি, তুমি আমায় বারণ করলে না? তুমি বারণ করলে আমি যেতুম না। আমজাদ বলছিল—বিভূতিদা শুনলেন যে, টিকটিকি টকটক করল।''

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বিভূতির কাশীযাত্রা

খোকা মহারাজ বললেন, সবাই কাশী যাচ্ছে, বিভূতি যাবে না? গণেনকে বলেছিলেন—বিভূতি কাশী যাবে। ১৭ কার্তিক কাশীযাত্রা। বর্ধমান স্টেশনে মা জেগে আছেন। প্রণাম করে বললুমঃ ''মা, কাশী যাওয়া হলো।'' ''বাবা বিশ্বনাথ তোমায় টেনেছেন।''

পাটনা স্টেশনে সকালে মাকে বললুমঃ ''এই বুদ্ধের পাটলীপুত্র।'' ভানুপিসি জপই করছে। মা ভানুপিসির অনবরত জপ ভাবটা পছন্দ করলেন না বলে বোধ হলো। বললেনঃ ''কাশীতে কত ঠাকুরকে প্রণাম করে বেড়াবে! ঠাকুর বলেছিলেন, 'কত সব ঠাকুরকে প্রণাম করবে! সব ঠাকুরকে একটা কলসির ভেতর পুরে সেই কলসিটা পেন্নাম করলেই সব ঠাকুরকে পেন্নাম করা হলো।' ''

মা আমাকে কাশীর বাড়িতে (কিরণ দত্তের বাড়ি) রেখে দুর্গাবাড়ি, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করতে যেতেন। বলতেনঃ ''তুমি বিভূতি আমার ঘর আগলাও।'' বাবুর ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন। একদিন দেবব্রতবাবু (প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ) আশ্রম থেকে আসছেন। মা স্নান করতে যাবেন—তাঁর মুখ শুকনো দেখে, গলির মুখ থেকে ফিরে এসে প্রসাদ

৬ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ২৪১ ও ডায়েরি থেকে প্রদত্ত।

দেবব্রতবাবুকে দিলেন।

বিভূতিকে মায়ের আশীর্বাদ

একদিনের ঘটনা। রাধুর অসুখের জন্য মার কথামতো চণ্ড নামানোর পর চণ্ডের কথামতো চণ্ডের ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে পাওয়া তেলের বোতলটি তাঁর হাতে দিতে গেলে বললেনঃ "রাধু ভালো হয়ে গেছে। তুমি নির্ব্যাধি হও।"

মা একদিন বললেনঃ "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, টাকায় ডালভাত হয়, আর বিভূতি তুমি টাকা নিয়ে কী করবে? সাঁকোর তলা দিয়ে যেমন জল চলে যায়, সুখ দুঃখ তেমনি তোমার পায়ের তলা দিয়ে চলে যাবে, তবে সাধুবাক্য সত্য হবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ

মা-র জন্মতিথি। মা নতুন বাড়ির তক্তপোশে বসে। কিশোর ফুল দিয়ে মাকে প্রণাম করছে আর বলছেঃ "মা, এই কাশীর সাধুদের প্রণাম নিন, এই মঠের সাধুদের প্রণাম নিন, এই উদ্বোধনের—।" আমি তখনও প্রণাম করিনি। আমি যেই প্রণাম করতে যাব, তখনই মা বললেনঃ "যত বউ, ঝি, ছেলে, মেয়ে আছে—তোমার পেন্নামের সঙ্গে সকলের পেন্নাম হউক"—বলে টিয়াপাখি গঙ্গারামকে আদর করে মা উঠলেন।

অপর একদিন সন্ধ্যাবেলা উদ্বোধনে আমি মা-র কাছে গেছি। মতি (মাতঙ্গিনী) মাকে বললেনঃ "মা, ওরা গুপ্তর [স্বামী সদানন্দ] কী সেবাই না করেছে!" মা শুনে বললেনঃ "ওরা গুপ্তর সেবা করেছে, ওদের আবার তপস্যা কী?"

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ গর্ভধারিণীকে হার মানায়

একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় (পুরনো বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম খুঁটির কাছে) আমার গর্ভধারিণী রোহিণীবালা ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমা আমাকে পিঁড়ের ডানধারে খেতে দিয়েছেন। আসছেন, যাচ্ছেন রান্নাঘরে, কিছু না কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছি, মা সব দেখছেন।

শ্রীমাকে বললেনঃ "মা, বিভূতি এইখানেই থাকুক। আমার কাছে (হাত দেখিয়ে বললেন) এত কটি খায়।" শ্রীমা শুনে বললেনঃ "বিভূতির মা, আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো (নজর দিয়ো) না। আমি ভিখারী রমণী, আমার ছেলেদেরকে যা দিই ছেলেরা তা আদর করে খায়।" একদিন ভোরে কলুপুকুরের ঘাটে মাকে বললেনঃ "তোমার ছেলেকে (বিভূতি) কাউকে খুঁড়তে দিও না। ভালো জামাকাপড় পরে যখন বাইরে যাবে— তখনও ছেলেকে খুঁড়তে দিও না।"

আজ আমার গর্ভধারিণী নেই। আমি পঁচাশি বৎসরে পড়েছি। শ্রীশ্রীমা-ই সর্বকালে, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর স্নেহদৃষ্টি দিয়ে আমার জীবনের গতিপথ দেখতে থাকবেন।

অপর একদিন আমার গর্ভধারিণী জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে বললেনঃ "মা, বিভূতি এখানেই থাকে, আমার কাছে যায় না, আপনি একটা কাজ করুন। আপনার তিনভাগ থাক, আমাকে একভাগ দিন।"

শ্রীশ্রীমা কখনও কারও দোষ দেখেননি

একদিন বললেনঃ "দেখ বিভূতি, আমি কারুরই দোষ দেখতে পাই না। এই দেখ না গোলাপ—ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কেমন থাপটি গেড়ে বসে...।' ঠাকুর রক্ষা করলেন—আমি বললুম, 'আমি তো ওর কোনও দোষ দেখিনি।' সত্যিই তো বিভূতি, আজ বাইশ বৎসর হলো গোলাপের কোনও দোষ দেখলুম না।"

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিতে ঠাকুরের কথা

একদিন মা আমাকে বলেছিলেনঃ "দুপুরবেলায় (দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে) যেমন যাই তেমনি গেছি, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে, আর আমি ঘরের মেঝেতে বসে বসে ঝাঁট দিচ্ছি। কেউ কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমি তোমার কে?' তিনি অমনি উত্তর দিলেন, 'তুমি আমার মা আনন্দময়ী।' "

॥২॥

বিভূতি ঘোষ ১২৯১-এর ১৩ আষাঢ় (ইং ২৬.৬.১৮৮৪) বর্ধমানের খণ্ডঘোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি বন্যাপীড়িত খণ্ডঘোষ ত্যাগ করে বাঁকুড়ায় বাস করতেন। প্রথম জীবনে বর্ধমান জেলার রোল শাঁকারী গ্রামে এবং পরে সাময়িকভাবে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে তিনি শিক্ষক হন। এরপর তিনি বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হন।

বিভূতিবাবুর পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান। মা রোহিণীবালা ঘোষ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আদ্যাশক্তির উপাসনা করতেন। সরল স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতার জন্য শ্রীশ্রীমা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি অনেকসময় জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের চুল বেঁধে দিতেন। বিভূতিবাবু ডায়েরিতে লিখেছেন, তাঁর গর্ভধারিণী একবার শ্রীশ্রীমাকে সরলভাবে বলেনঃ ''মা, বিভূতি এখানেই থাকে, আমার কাছে যায় না। আপনি একটা কাজ করুন। আপনার তিনভাগ থাক, আমাকে একভাগ দিন।''

শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা কন্যা, বিভূতিবাবুর প্রথম পক্ষের ভক্তিমতী সহধর্মিণী অমিয়বালা ঘোষের কোনও সন্তান ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কমলা ঘোষও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। মা তাঁকে পরম স্নেহে 'বউমা' বলে ডাকতেন। কমলাদেবীকে মা একদিন বলেনঃ ''বউমা, ওর কি (আবার) বিয়ে দিতুম! ওর শুকনো মুখ দেখতে পারব না বলে তোমাকে এনেছি।'' বিভূতি ও কমলার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথ। শ্রীশ্রীমা তার নাম রেখেছিলেন। ডাকতেন 'বোদে-ফোদে' বলে। বিভূতি ঘোষ ডায়েরিতে লেখেনঃ ''একবার বউমা (কমলা ঘোষ) খোকাকে দেখিয়ে বলেন, 'মা, একে সাধু করে দিন।' শ্রীশ্রীমা উত্তর দেন, 'ও তো সাধু, ওকে কী সাধু করব!' আমি বললাম, 'মা, ওর লখনৌ-এ মাঘী পূর্ণিমায় জন্ম হয়েছে।' ছোট মামী (রাধুর মা) বললেন, 'ওর নাম পূর্ণচন্দ্র রাখো।' মা শুনে বললেন, 'ও নামে ওকে ডাকতে পারব না। ও আমার গুরুর নাম। ওকে আমি বোদে-ফোদে বলে ডাকব।' তাই ওর নাম বৈদ্যনাথ।'' শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের কাছে বৈদ্যনাথের দীক্ষা হয়।

বিভূতিবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা দুগু, দুর্গারানী মজুমদার। শ্রীশ্রীমা তারও নামকরণ করেন। ডাকতেন, 'খুকি' বলে। ইনিও মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্তা। এই ভক্ত পরিবার শ্রীশ্রীমায়ের কত আপন ছিল, তা নানা ঘটনা ও মন্তব্যে প্রকাশ পায়। বিভূতিবাবু ডায়েরিতে লিখেছেনঃ ''শ্রীশ্রীমা একবার বলেন, 'আমি ভাবলুম, বিভূতি বুঝি এবার পূজায় আসতে পারল না।' মহাষ্টমীর সকাল (বৈদ্যনাথের তখন তিন বছর, দুগুর আট মাস), বাঁকুড়ার লালবাজার অহল্যাবাঈ রাস্তার ডানদিকে জায়গা

কেনার কথা শুনে মা বলেন, 'নলিনী, বিভূতি বাঁকড়োয় জায়গা কিনেছে। ঘর করবে। সেখানে গিয়ে কী খাব বল দিকিনি? বউমা লুচি তরকারি করে দেবে, বেশ খাব।' "

বিভূতিবাবু বাঁকুড়ায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকার সময় প্রতি শনিবার পায়ে হেঁটে জয়রামবাটী যেতেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁর সরল ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত ছেলেটির অপেক্ষায় থাকতেন। জয়রামবাটী থেকে নির্বিঘ্নে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত তাঁর স্নেহভাজন বিভূতির জন্য চিন্তা করতেন। একবার উপস্থিত ভক্তদের কাছে বলেই ফেলেন: "বিভূতি আমার এতক্ষণে বড় নদী (অর্থাৎ চার মাইল দূরের দ্বারকেশ্বর নদ) পেরুল।" স্বজন-কথা এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহু অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা বিভূতিবাবু নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। সেইসব ঘটনার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আকারে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থেও [এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতেও] প্রকাশিত হয়েছে।... —**সম্পাদিকা, 'নিবোধত'**

শ্রীশ্রীমায়ের নতুন বাড়ি। স্থান—জয়রামবাটী

একদিন সকাল নটা-দশটার সময় আমি মায়ের বাড়ি পৌঁছে দেখি, মা ভাঁড়ার ঘরে দাঁড়িয়ে, ঘরটা ইঁদুরে চেলে দিয়েছে। একটা নেংটি ইঁদুর মেঝের একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে যেন তাকিয়ে (রইল)। আমি মাকে বললাম: "মা, ইঁদুরটা কি বলছে মা? ইঁদুর যেন বলছে, 'আমরা এ-ঘর থেকে চলে যাই?' " মা আমার কথা শুনে বললেন: "(কামারদের ভিটেতে) একটা বেশ ঘর করো, তোমাদের থাকার কষ্ট হচ্ছে।" আমি শুনেই ছুটে গিয়ে ঐখান থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি ভেঙে নিয়ে এসে মাকে বললাম: "মা, এইটি মাপুন।" মা নিজের হাত দিয়ে কঞ্চিটি মাপলেন। আমি মায়ের হাতের মাপটি নিয়ে মেজমামাকে বললাম: "মা কামারদের ভিটেতে ঘর করতে বললেন।" শুনে মামা আমার সঙ্গে এলেন। মার জন্য একটি ৬' × ১৩' শোয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, নলিনীর ঘর উত্তরে দুয়ারী এবং পশ্চিম দুয়ারী মা জগদ্ধাত্রীর ঘর করার ব্যবস্থা হলো। বাঁকুড়ার কামারের কারখানা থেকে দরজা-জানালা, খুঁটির কাঠ এবং বিপিন দত্তর বাবার দোকান থেকে জানালার গরাদ নিয়ে গেলাম। রাসবিহারী মহারাজ কোঠার ও ছাদনের ব্যবস্থা করেন। মার কাছ থেকে সাড়ে চৌত্রিশ টাকা নিয়ে ঘর আরম্ভ হয়, উপেন ডাক্তার দেন একশো পঞ্চাশ টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী মাংস রন্ধন

"আমি একদিন সিংহবাহিনীর পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেদিন অনেক পাঁঠা বলি হইয়াছিল। আমাকে পাঁঠার একখানি পা পাঠাইয়া দেয়। তাহা দেখিয়া নলিনী (শ্রীশ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী) 'ছি ছি মাগো—মাংস গো—এসব করবে কে?' ইত্যাদি কথা বলিতে থাকে। শুনিয়া মা বলিলেন, 'না নলিনী, ওরকম করতে নাই। সাক্ষাৎ মহামায়া খেয়েছেন—মহাপ্রসাদ। তোরা না রাঁধতে পারিস, আমি রাঁধব।' খাওয়ার পর মা বিশ্রাম না করিয়া সেই মাংস রান্না করিলেন। সোনার মতো ঝোলের রঙ। বিকেলে নতুন বাড়িতে আমাকে একবাটি মাংস ধরিয়া দিয়া বলিলেন, 'খাও বিভূতি, মার প্রসাদ—খেলে শক্তি হবে।' "

সন্তানের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের ব্যাকুলতা

আর একদিন (মা বললেন)—"হ্যাঁ গোলাপ, তোমাকে বিভূতি 'মা' বলে ডাকল, তুমি সাড়া দিলে না। (মা তখন জপ করছিলেন) আমি কিন্তু পারি না।"

অন্য একদিন মা বললেনঃ "বরদা, কটা বেজেছে?" আমি উত্তর দিলামঃ "বোধ হয় সাড়ে ন-টা।" "বিভূতি তুমি কী করে এলে? আমি যে আজ দুপুরে ঘুমুচ্ছিলুম, স্বপ্ন দেখলুম, বিভূতি আমাকে 'মা মা' বলে ডাকছে। ঘুম ভেঙে গেল। কেদারের মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বিভূতি আমাকে 'মা, মা' বলে ডাকছে, তবে কি বিভূতির কোনও বিপদ হয়েছে?' কেদারের মা বললে, 'মা, বিভূতির কি কোনও বিপদ হতে পারে?' "

"মা, আপনাকে কবার ডেকেছি?"

মা বললেনঃ "একবার।" (মঠে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে)

"মা, আপনাকে আমি কবার ডেকেছি?"

"একবার।"

পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পিঠা-পরব

"একবার কোনও পর্বোপলক্ষে (পৌষসংক্রান্তির পিঠা পরব) পুলি পিঠা হইয়াছিল। বিভূতিবাবু ছুটি পাইলেই জয়রামবাটী আসেন জানিয়া

মা তাঁহার জন্য পিঠা তুলিয়া রাখিলেন, কিন্তু বিভূতিবাবুর সেবার আসিতে বেজায় দেরি হইল। তথাপি মা তাঁহার আশায় প্রতিদিন পিঠাগুলি আবার ভাজিয়া তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন—যদি আসে মনে হবে আহা, খেতে পেল না! এইরূপে চারদিন পরে বিভূতিবাবু মায়ের বাড়িতে গিয়া নিজের ভাগ পাইলেন।" (শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ৩৭৯)

জয়রামবাটীর মানুষের জন্য মায়ের নির্দেশ

রামদাস বিশ্বাসঃ "দিদিঠাকরুন, বিভূতিবাবুকে বলে দিন তিনি যেন আমাদের কিছু করেন।

মাঃ "বিভূতি হয় আহের কাটিয়ে দাও, না লদী (নদী) বেঁধে দাও।

[শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে বিভূতিবাবু সন্তানদের অন্নসংস্থানের জন্য বর্ধমান মহারাজার কাছ থেকে জমির ব্যবস্থা করেন এবং পরবর্তী কালে এম. এ. টি. আয়েঙ্গার, আর. ঘোষ প্রমুখ জেলাশাসকদের সহায়তায় ক্রমে আহের (দীঘি) কাটানো ও নদী বাঁধার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকীর সময় জেলাশাসক এম. এ. টি. আয়েঙ্গারের ব্যবস্থাপনায় উৎসব উপলক্ষ্যে আগত বাসযাত্রীমাত্রেই বাঁকুড়া থেকে জয়রামবাটী মাতৃমন্দির পর্যন্ত বিনা পয়সায় বাসযাত্রার সুযোগ পান। ইনি ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের দীক্ষিত এবং এঁর পিতা শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত। বাঁকুড়া জেলার রাস্তাঘাট, ক্যানেল, কূপখনন, কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের যাবতীয় পরিকল্পনা তাঁর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাঁকুড়ার গঠনমূলক কাজে তিনি বিভূতিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁরা ভূদান-যজ্ঞ বিষয়ে বিনোবা ভাবেজীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।]

"আমি যদি সরি রাধু তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?"

প্রথমেই সকলকে জানাই—এই উক্তিটি কোতুলপুর গ্রামে প্রবেশের মুখে (বর্তমানে যেখানে সিনেমা হয়েছে রাস্তার ডানদিকে এবং কো-অপারেটিভ স্টোর-এর বাঁদিকে রাস্তার ধারে পুকুরঘাটের সামনে) শ্রীশ্রীমা করেছিলেন। রাধু তখন অন্তঃসত্ত্বা। মা আমাকে বললেনঃ "রাধু

প্রায়ই নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ও কী যেন বিড়বিড় করে।" সুরেশ দাদার বিষ্ণুপুর গড়দরজা বাড়ি থেকে যাত্রা করে মা কোয়ালপাড়ায় আসছেন, তিনখানি গোরুর গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। সামনের গাড়িতে মা ও রাধু, মাঝের গাড়িতে নবাসনের বউ ও ছোটমামী (রাধুর মা) ও পিছনের গাড়িতে আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি। আমরা জয়পুরে দুপুরে খেয়ে বিকেল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ এখানে এসেছি। মা বললেনঃ "বিভূতি, নবাসনের বৌমার কাছ থেকে আমার লেপটা এনে দাও—রাধুর শীত করছে।" আমি বরাবর হেঁটে মার গাড়ির পিছনের ওদল[৭] দুটি দুই হাতে ধরে চলেছি (যাতে উঁচু-নিচু রাস্তায় বেশি নড়বড় না করে)। গাড়ির পিছনের দিকে একটি চাঁচমাত্র[৮] ব্যবধান। আমি মার কথা শুনেই রাস্তার পাশের ঘাটে হাত দুটি ধুয়ে নিজের কাপড়ে হাত মুছে নবাসনের বউকে বললামঃ "মার লেপটি দাও।" আমার হাতে উনি দিলেন। আমি দুই হাত দিয়ে লেপটা ধরে মার হাতে তাঁর গাড়িতে দিলাম।... মা বললেনঃ "বড় ঠাণ্ডা, তুমি আমার চাদরটা এনে দাও।" আমি চাদরটা হাতে দিলাম। মা গাড়োয়ানের দিকে মাথা করে গাড়িতে শুয়েছিলেন। চাদরটা মা রাধুর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন। রাধু লম্বা করে পা ছড়িয়ে শুয়ে দেখল যে মার গায়ে পা লাগছে। বললঃ "মা, তুই সর, মা, তুই সর।" মা উত্তর করলেনঃ "আমি যদি সরি তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?"

কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে মা আতুর রাধুকে নিয়ে তপস্যা করেছেন। "সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।" মহামায়া স্বয়ং আর্তিহারিণী হয়ে অনাথ-আতুরের আর্তি হরণ করেন—এই কি তাঁর লীলা?

---

৭ গোরুর গাড়ির যে দুটি বাঁশ চাকার ওপর দিয়ে সমান্তরালভাবে চলে গিয়ে পিছনের দিকে একটু বের হয়ে থাকে তাদের ওদল বলে।

৮ গোরুর গাড়ির মাথার ওপর বেতের ছাউনিকে চাঁচ বলে।

শ্রীশ্রীমায়ের বিস্ময় প্রকাশ

"বিভূতি, জয়রামবাটীতে কী ধান হয়েছে! আমি বরদাকে এগিয়ে দিতে গেছি। সামুইদের (বাড়ির) পিছনে দেখি খুব বড় বড় ধান হয়েছে— হাতি বাঁধা যাবে!"

রাধারানীর বিবাহ

বিবাহের (১০ জুন ১৯১১) পরদিন রাধু (রাধারানী) শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় একহাজার টাকাসমেত শ্রীশ্রীমা তাকে একটা বড় কালো ট্রাঙ্ক দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যে টাকা আছে, তা তিনি খেয়াল করেননি। বর-বউ চলে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে রাত্রে দেখা দিয়ে বললেন: "কিগো, এক হাজার টাকা রাধুর বাক্সে দিয়ে দিলে?" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় মায়ের হুঁশ হলো। পরদিন মায়ের আদেশে আমি জনৈক সাধুর সঙ্গে তাজপুর গিয়ে সব ঘটনা জানিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে আনি। ঐ বিবাহের সুব্যবস্থা করতে মাকে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফলে বিবাহের পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

মায়ের কাছে স্মৃতিরই দাম

মায়ের কাছে স্মৃতিরই দাম। "সেই যে 'লড়াইয়ের ফণি' (স্বামী ভবেশানন্দ) যুদ্ধের মধ্যে মনে করে এই (তুর্কি) গিনিটা কিনে এনেছে— সেই স্মৃতিরই দাম"—এই কথা বলে মা আমার হাত থেকে ফণি মহারাজের গিনিটা নিলেন।

ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের (রামকান্ত বোস লেন, কলকাতা) ছেলে ডাক্তারি পড়ার সময় দশ টাকা প্রাইজ পেয়েছিল। সে ঐ টাকা আমায় দিয়েছিল শ্রীশ্রীমাকে প্রণামী হিসেবে দিতে। আমি বলেছিলাম: 'টাকা নেব না, তুই যদি একটা গিনি (দাম ১৩ টাকা) দিতে পারিস সেটা মাকে দিতে পারি।"

মা ঐ দুটি গিনি বাক্সে রেখেছিলেন। (শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর) বাক্স খোলা হলে সেই গিনি দুটি পাওয়া যায়।

প্রথমা পত্নী অমিয়বালার প্রসঙ্গ

অমিয়বালা মজঃফরপুরের উকিল রমানাথ বসুর কন্যা। ডাক নাম মুন্না। কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের পাশের বড় হলঘরে গোলাপ-মার কাছে শুয়ে থাকার সময় বউ (অমিয়বালা) স্বপ্ন দেখে এবং শ্রীশ্রীমাকে বলেঃ "মা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখলুম, আপনি আমায় বলছেন, 'বউমা তসরের চেলিটা পরো। আমি তোমায় মন্ত্র দেব।' " মা শুনে বললেনঃ "না বউমা, কাশীতে মন্ত্র দিলে তুমি সদ্যমুক্ত হয়ে যাবে। তোমাকে কলকাতায় বা জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব।"

অমিয়বালা সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "বউমাকে তো আলমারিতে রাখতে হবে না। বেশ বউ।" নববধূ শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাজা মহারাজের কাছে যাবে কিনা সেই কথায় শ্রীশ্রীমা বলেনঃ "রাখালকে দেখবে না? রাখালকে দেখে মানবজন্ম সার্থক করুক।" (দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ২৬৮)

মৃত্যুর সময় অমিয়বালা বলেছিল (বিহারে মানুষ হওয়ায় হিন্দি ভাষায় কথা বলা তার পক্ষে সহজ ছিল): "যদুয়া, এক টোকরী আম ঔর এক টোকরী লিচু বাজারসে লাকে আও, আম ঠো 'মা'জী কো কলকত্তামে ঔর লিচু কো কাশী মে মহারাজজীকো ভেজো।"

মজঃফরপুরে অমিয়বালার দেহ দাহ করে বাঁকুড়ায় ফিরে আসি। পরদিন সকালে নটা সাড়ে নটা নাগাদ আট নং বোসপাড়া লেনে মার কাছে যাই। দেখি মা পূজা করছেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ "বউমা কেমন আছে?" আমি উত্তর দিলামঃ "মা সে চলে গেছে।"

শ্রীশ্রীমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখে বললামঃ "মা আপনি কাঁদছেন?" যোগীন-মা সেসময় গঙ্গাস্নান করে এসে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছেন। মা বললেনঃ "দেখ যোগেন, বউমা চলে গেছে। সিঙ্গি মাছে কাঁটা মারলে যেমন কষ্ট হয়, বউমা চলে যাওয়ায় সেরকম কষ্ট হচ্ছে।"

আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধকর্ম যেদিন শেষ হলো, সেদিন মা স্বয়ং উপস্থিত হলেন, গৌরী-মাও। পরদিন সকালে পূজা করার সময় আমাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে

বলেছিলেনঃ "ঠাকুর এই করো, যেন বউমাকে আর জন্ম নিতে না হয়, তোমার পাদপদ্মে তার স্থান হয়।" জয় মা! জয় মা! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের বামাকালী প্রসঙ্গ

স্থান—বাগবাজার, কলকাতা

আমি মাঝে মাঝেই বাগবাজারে নাট্যকার গিরিশবাবুর বাড়িতে রাত্রিযাপন করতাম। একদিন রাত্রে আমি একটি খাটে ও আমার পাশে অপর খাটটিতে তিনি শুয়েছিলেন। হঠাৎ গভীর রাত্রে (আমি তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম) তিনি "বিভূতি ওঠো, বিভূতি ওঠো" বলে আমাকে ডাকতে লাগলেন। আমি উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "আপনার কি শরীর খারাপ?" তিনি বললেনঃ "না।"

তিনি আমাকে দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো কোট দিতে বললেন। আমি কোটটি দেওয়ার পর তিনি তাঁর কোটের ভিতরের বুক পকেট থেকে একটি মা কালীর ফোটো বার করলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে আমাকে দিয়ে বললেনঃ "আমি শ্রীধরের (তাঁর কুলদেবতার) ব্যবস্থা করেছি। মাকে তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই।"

আমি সেই ফোটো হাতে নিয়ে দেখলাম সেটি বামাকালীর। আমি নিতে অনীহা প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি জোর করে আমাকে মায়ের ফোটোটি দিলেন।

পরদিন খুব ভোরে উদ্বোধনে মায়ের কাছে যাই। মা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "বিভূতি, তুমি এত ভোরে?" আমি পূর্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা মাকে জানাই।

শুনে মা ফোটোটি চেয়ে নিয়ে নিজের কপালে তিনবার ঠেকিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেনঃ "তুমি মায়ের কাছে জোড় হাত করে দাঁড়ালেই মা সন্তুষ্ট হবেন।"[১]

---

১ বিভূতিবাবু তাঁর ছেলে ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও সুরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দের কাছে গল্প করতেন। উক্ত ঘটনাটি তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

ভূদেবের বিবাহ

ভূদেবের বিয়ে (২৪ বৈশাখ, ১৩২০ সাল)। সন্ধ্যার একটু আগে আমি জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। মা নিজের ঘরের দক্ষিণের পিঁড়ের ছাঁচতলায় পা নামিয়ে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই নিজের ডান পায়ের ফুলো দেখিয়ে বললেনঃ "সত্যি বিভূতি, গিরিশবাবু বলেছেন, 'এরা মাথা কাটা তপস্যা করেছে।' "

আমি বললামঃ "মা, আপনাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'হ্যাঁগা, আমি কি সব করব? তুমি কি কিছুই করবে না?' আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি মেয়েমানুষ, কী করে করব?' ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, 'নাগো, করবে করবে।' " বলে আমি বললামঃ "মা, ঠাকুর তো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে যান নাই, আপনাকে সেসব করতে হচ্ছে।" মা শুনে বললেনঃ "বিভূতি, তোমার ঠাকুরের সেই কথা 'গোপাল, গোপাল' মনে আছে তো?" আমি বললামঃ "হ্যাঁ মা, মনে আছে।" মা বললেনঃ "যাও, যারা যাচ্ছে, তারা সব গোপাল।"

তিনখানা পালকি। ভূদেবের জ্বর। বর একটা পালকিতে আর মন্মথ জামাই (রাধুর বর) একটা পালকিতে। অন্যান্য সব বরযাত্রী ও আমি হেঁটে চলেছি। সঙ্গে দিশি বাজনা। ডাঁটপুর গ্রামে বিবাহ, রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ গ্রামের মাথায় পৌঁছালাম। কনের খুড়ো মোটাসোটা। আমাদের সঙ্গে বিলেতি বাজনা নাই, তার বদলে 'ভিটে উঠুক, ভিটে উঠুক' শব্দ করছে বাদ্যি—আর সেই বাদ্যি নিয়ে আমরা বরযাত্রীরা হাজির! এমন সব ওজর-আপত্তি তুলে আমাদের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছেন না কন্যাপক্ষের লোকেরা।

আমি বললামঃ "দেখুন, সময় ছিল না কলকাতা থেকে বিলেতি বাজনা আনার। আর ভূদেবের জ্বর!" ইত্যাদি শুনে বর নিয়ে যেতে দিলেন। যথাসময় বিয়ে হয়ে গেল।

পরদিন সকালে কুসুমডিঙা হয়ে গেল, কিন্তু কোনমতে কনে পাঠাবেন না। আপত্তি করে বললেনঃ "বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার। কনে পাঠানো হবে না।" আমি বললামঃ "সত্যিই তো বৃহস্পতিবার, মেয়ে কী করে

পাঠাবেন বলুন! কিন্তু একটা কথা শুনুন। মা যে আমার সন্ধ্যায় নতুন বউ এসে রান্নার ডালের হাঁড়িতে কাঠি দেবে বলে অপেক্ষা করছেন! আমি কী করে মাকে বলব যে, লক্ষ্মীবার বলে তাঁরা মেয়ে পাঠালেন না!" এই কথা শুনে তাঁরা বউ পাঠিয়ে দিলেন।

বর-বউ নিয়ে মার কাছে হাজির। মাকে সব বললাম। বউ-ভাত হয়ে গেল। তার পরদিন সকালে ভূদেবের মাকে (মেজমামী) বউ পছন্দ না হওয়ায় বেজার হতে দেখে মা বললেনঃ "এলো [এলোকেশী] কি অমনি এসেছে, এলোর বিয়েতে কত বাদ্যি বেজেছে!"

।।৩।।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম পৌরকর্তা বিভূতি ঘোষ শিক্ষকতার কাজেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। যৌবনে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসে তিনি মায়ের ভক্তবর্গেরও আপনজন হয়ে ওঠেন। তাঁর ডায়েরির কিছু অংশ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে পূর্বেই প্রকাশিত হয়। বিভূতি ঘোষের যোগ্য পুত্র ও পৌত্রদের সহযোগিতায় তাঁর ডায়েরি থেকে পাওয়া নতুন তথ্য এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবী গ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণে মুদ্রিত কিছু তথ্য একত্রিত করে আলোচ্য প্রবন্ধের পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর ডায়েরি থেকে আরও কিছু অপ্রকাশিত তথ্যের সন্নিবেশ করা হলো।—**সম্পাদিকা, 'নিবোধত'**

ছেলের (বিভূতির) বউ কমলা ঘোষকে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ

জনৈক স্ত্রীভক্তকে (বিভূতিবাবুর স্ত্রী কমলা ঘোষকে) শ্রীশ্রীমা একদিন বুঝাইতেছিলেন যে, মানুষের দেওয়া জিনিস থাকে না, সুতরাং তাহাদের কাছে কিছু চাইতে নাই, এমনকি বাপ বা স্বামীর কাছেও নহে। পরে বলিলেনঃ "ঠাকুর যখন দেবেন, তখন রাখবার জায়গা পাবে না। ঠাকুরের দেওয়া জিনিস ফুরায় না। যে চায়, সে পায় না, যে চায় না, সে পায়।"

কমলা ঘোষ বলেনঃ "যখন আমার প্রথম ছেলে পেটে, বাপের বাড়ি যাওয়ার কথায় শ্রীশ্রীমা ওঁকে (বিভূতিবাবুকে) বলিয়াছিলেন, 'প্রথম

পোয়াতি বাপের বাড়িতেই প্রসব হওয়া ভালো। গীতা-চণ্ডী নতুন কাপড়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবে, মা চণ্ডী রক্ষে করবেন।' মেয়ে পেটে তৃতীয়বার যখন জয়রামবাটী যাই, তখন শ্রাবণের শেষ—নদী বাঁধা। নদীর ধারে শ্মশান। আমি নদীর ধারে বালির উপর শুইয়া পড়িয়াছিলাম শুনিয়া মা বলিলেন, 'করেছ কি গা!' পরদিন স্নান করিতে যাওয়ার সময় মা আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মা সিংহবাহিনী, বউমা কিছু জানে না, তোমাকে দেখতে এসেছে, ওকে রক্ষা কর।' সেই অবস্থায় মা আমাকে কাহারও ঘরে যাইতে দিতেন না। বলিতেন, 'পোয়াতি মানুষকে যার তার ঘরে যেতে নাই।' ফিরবার সময় মা শিয়াকুলের কাঁটাসুদ্ধ ডাল আমার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, 'শেঁকুলের কাঁটা ধরব তো ছাড়ব না। আমার মা পোয়াতিকে শেঁকুলের কাঁটা যাত্রাকালে দিতে বলতেন।' "

কমলা ঘোষ আরও স্মরণ করে বলেনঃ "আট মাস বয়সে লখনৌয়ে আমার ছেলের অসুখ হয়। ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিলেন ও যেন নিজে ছেলেকে কোনও ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। সে ভালো হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে সেই কথা বলিবার উপক্রম করিতেই কহিলেন, 'আমাকে শুনিয়ো না, স্বপ্নাদ্য ওষুধ বলিতে নাই।' "

শ্রীশ্রীমায়ের আম ও তালশাঁস খাওয়ানো

কমলা ঘোষ বলেনঃ "জগদম্বা আশ্রমে শ্রীশ্রীমা একঝুড়ি আম কিনিয়া ঢেঁকিশালে আমাকে ও ভূদেবের স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা দুজনে এখানে বসে আমগুলি খাও।' সেদিন বিকালে আবার কতগুলি কচি তাল আনাইলেন, ভূদেব কাটিয়া দিতে লাগিল আর আমরা খাইতে লাগিলাম। সেইদিন হইতে তালশাঁস আর আমি মুখে করি না; আম খাওয়ারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।"

আমজাদের কথা (মায়ের মুখে)

বিভূতিবাবু বলেনঃ আমজাদের বাড়ি শিরোমণিপুর। একজন ডাকাত (ডাকাত সর্দার)। মা একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'শুনেছ বিভূতি

আমজাদের বুদ্ধি? শিওড়ের একটা (নষ্ট) তেলি-মেয়ে তাকে বলেছে, তুমি রাত্রে আস্তে আস্তে ধাক্কা মারলেই আমি কপাট খুলে দেব, তুমি আমার স্বামীকে মেরে রেখে যাবে। আমজাদ করল কি, যেমনি কপাট খোলা, তার স্বামীকে না মেরে, তার কানে ছিল মাকড়ি, কান থেকে মাকড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।' আমজাদের জেল হইয়াছিল—বাড়িতে বড় কষ্ট। একদিন দেখি, তাহার স্ত্রী আর মা খুব কাতরভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। মা তাহাদিগকে একটি টাকা দিলেন। আমজাদ যখন মার বাড়িতে কাজকর্ম করিত, মা নলিনীর ঘরের বারান্দায় তাহাকে ভাত খাইতে দিতেন, মুসলমান বলিয়া দ্বিধাবোধ করিতেন না। পূর্বে শিরোমণিপুরের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ডাকাতি করিত বলিয়া জয়রামবাটীর লোক তাহাদিগকে মজুর খাটাইত না। মা-র বাড়িতেই তাহারা প্রথম কাজ পায়, আর মা-র কৃপাতেই তাহাদের অনেক মতিগতি পরিবর্তিত হয়।"

বিভূতিবাবুর কৌলসন্ন্যাস প্রসঙ্গ

একদিন কৌলসন্ন্যাস গ্রহণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বলছেনঃ "দেখ বিভূতি, রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, শ্রীশ্রীমা স্বর্ণসিংহাসনে আসীন, গেরুয়া পরিহিতা, কপিল মহারাজ পুজো করছেন, পূজনীয় শরৎ মহারাজ তন্ত্রধারক, মন্দিরের দরজায় তুমি দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছ।"

সকালে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সব কথা বললুম। তিনি আমাকে কৌলসন্ন্যাস নিতে বললেন। এর পূর্বে ডাক্তার কাঞ্জিলাল কৌলসন্ন্যাস নিয়েছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে নিবেদিত জিনিসপত্র আমাকে দিলেন জয়রামবাটীতে মাকে দিতে। একদিন সকালে উদ্বোধনে উপরে ....মহারাজ আমাকে বললেনঃ 'বিভূতিবাবু, ডাক্তার কাঞ্জিলালের কৌলসন্ন্যাস হলো, ক্ষীরোদবাবুর হলো, আর আপনার হবে না? আপনি মাকে বলুন।"

আমি মার সামনে গিয়ে বললুমঃ "মা, কপিল মহারাজ নিতে বললেন—সেই যে মা, কৌলসন্ন্যাস!" মা শুনেই পূজার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাগতভাবে এখানে একবার, ওখানে একবার পা ফেলছেন।

আমি হাঁটু গেড়ে তাঁর পা স্পর্শ করতে চেষ্টা করছি, তিনি কিছুতেই শান্ত হচ্ছেন না। তখন আমি বললুমঃ "কখনো কিছু চাবো না, কখনো কিছু চাবো না, কখনো কিছু চাবো না।" মা তিন সত্যি করিয়ে নিয়ে বললেনঃ "তোমার মতো বাপ, বৌমার মতো মা পাওয়ার জন্য কত মহাপুরুষ তপস্যা করছেন।"

একবার প্রমীলাবালা বোস (বিভূতিবাবুর বোন) সন্ধ্যামণি ফুল দিয়ে, সূতা ব্যবহার না করে, একটার মধ্যে একটা ফুল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে, মাকে পা পর্যন্ত মালা তৈরি করে পরিয়েছিলেন। মা তাতে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা ছিলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজা

স্বামী তপানন্দ বলেনঃ "একবার বাঁকুড়া হইতে বিভূতি ঘোষ মা-জগদ্ধাত্রীর জন্য ডাকের সাজ লইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সে বহির্বাটীতে আসিয়া পৌঁছিতেই শ্রীশ্রীমা ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, 'মা (জগদ্ধাত্রী) বললেন, ডাকে কালো টিকলি দেওয়া আছে—তিনি কালো ডাক পরবেন না।' "

একবার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জনের সময় শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেনঃ "কানের একটি গয়না খুলে রাখবে, মা সেইটি মনে করে আসবেন।"

বিভূতিবাবুর ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের ঘটনা

"পাঁচ-ছয়দিন আগে ভোরে স্বপ্ন দেখলুম একটা আগুন জ্বলছে, মনে হলো শ্মশান যেন, সব শেষ—ঘুম ভাঙল একটু বেলাতে। বোধহয় সোমবার, ভাত খেয়ে স্কুলে গেলুম। হেডমাস্টারকে[১০] বললুম যে, আমি কলকাতায় যাব। তিনি ছুটি দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। আমি বললুম resignation নিন। ছুটি দিলেন। সন্ধ্যার সময় মার বাড়ি গেলুম। মা শুয়ে আছেন। প্রণাম করলুম না। পরে মাঝে বশী[১১] এসেছিল।

---

১০ তখন বিভূতিবাবু বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

১১ বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন। বিভূতিবাবুর প্রিয়তম বন্ধু।

মা—তুমি কালীঘাট গেছলে? আমাকে বলে গেলে না কেন? আমি তো পুজো দিতুম।

জয়রামবাটীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কুয়ার কথা হলো। বললেন, 'তুমি কুয়ার জল খেয়েছিলে?' 'হ্যাঁ' বলায় খুশি হলেন। বললেন, 'তারকনাথকে দেবার মানসিকি দুই টাকা[১২] আছে এবং কোয়ালপাড়ার শীতলার পুজোর পয়সা বাক্সে আছে।'

মা—শরৎকে ডাকো। আমি নিচে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'মা ডাকছেন।' বললেন, 'যাচ্ছি।' আমি মাকে বললুম, 'শরৎ মহারাজ আসছেন।' মা বললেন, 'বিভূতি, তুমি আমায় জোরে পাখা করো।' শরৎ মহারাজ এলেন। (অন্য আর কেউ ছিল না) মা শুয়ে বিছানায়, গঙ্গার দিকে মাথা করে।...

শরৎ মহারাজ মায়ের পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে সামনে ঝুঁকে... মা নিজ হাতটি শরৎ মহারাজের হাতের উপর রেখে বললেন, 'শরৎ, এরা সব রইল।'

মহারাজ আস্তে আস্তে সম্মুখ দিকে তাকিয়ে পিছু হেঁটে খুব সম্ভ্রমের সহিত বেরিয়ে এলেন।...

(শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের সংবাদ বেলুড় মঠে জানিয়ে যখন উদ্বোধনে) ফিরলুম ভোর হয়েছে, দুআনা পয়সা দিয়ে দুটি বেলফুলের মালা কিনলুম। দুটোকে একটি করে মার বাড়িতে গেলুম। দেখলুম, মাকে সাদা পাটের কাপড় পরানো হয়েছে, মা লম্বা হয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চাদর, মালাটি পরিয়ে দিলুম এবং পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলুম। কী ঠাণ্ডা—বরফের মতো। মঠে যাওয়ার সময় প্রণাম করে গিয়েছিলুম। তখন পা খুব গরম ছিল।..."

স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর শ্রীশ্রীমা তাঁর স্নেহধন্য সন্তানদের নানাভাবে স্বপ্নে দেখা দেন। এইরূপ ঘটনা ঘটল বিভূতিবাবুর পত্নী কমলাবালা

---

১২ ১৯১৮ সালের দুটি রৌপ্য মুদ্রা শ্রীমা বিভূতিবাবুকে দেন। তার সাথে শীতলার পূজার পয়সাও শ্রীশ্রীমা তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে দেন।

ঘোষের জীবনে। প্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমা কমলা ঘোষকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেনঃ "বউমা, আমার কায়া গেছে, কিন্তু ছায়ার মতোই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

মায়ের বিভূতির আশা

"বোঝে প্রাণ, বোঝে যার
যার যা তার তা, যুগে যুগে অবতার।"

সেই আমি অনূন্য ১১ বৎসর ৯ মাস অল্পবিস্তর তাঁর সান্নিধ্যে থেকেও বুঝতে পারলুম না মা ও সন্তানের কী সম্বন্ধ। জীব তাঁকে নিয়ে তপস্যা করে না, মহামায়া নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে সকলের মা হয়ে সকলের সুখ দুঃখে সঙ্গে থাকেন। মা আমাকে বলেছেনঃ "বিভূতি, যাকে ভালোবাসব তার ইহকাল তো দেখবই—তার পরকাল যতক্ষণ না দেখছি, ততক্ষণ মনস্থির হয় না।" এই অনিমেষ দৃষ্টিই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর অনিমেষ আঁখি আমার জীবনের গতিপথে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ভুল হলে উদ্বিগ্ন হই; জানি, মা শেষরক্ষা করবেনই। * ❑

* নিবোধত, ১৬শ বর্ষ; ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ সংখ্যা; অক্টোবর ২০০২, জানুয়ারি ২০০৩ এবং এপ্রিল ২০০৩; পৃঃ ১৭৭-১৮২, ৩২৬-৩৩১, ৪৯৬-৪৯৮